ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া 1960

ডিস্ট্রিব্যুটার

সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমান্ট স্ট্রিট,
কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীণ পার্ক, নিউ দিল্লী-110016
দ্বারা প্রকাশিত এবং নবজীবন প্রেস, কলিকাতা-700006 দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ঋণ স্বীকার

এই পুস্তকে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য শ্রীবলবন্ত গার্গী, শ্রী কে. ডি. দেশমুখ, সাহিত্য অকাদেমী এবং ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের আলোকচিত্র বিভাগের নিকট গ্রন্থকার ঋণী।

আদি পর্ব

এক

ভারতীয় থিয়েটার বলতে সকলে এক জিনিষ বোঝে না, এমন-কি, কেউ একটা কোনো নির্দিষ্ট জিনিষও বোঝে না। যখন পশ্চিমের পণ্ডিতেরা বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হন, তখন ভারতীয় থিয়েটার বলতে বোঝাত সংস্কৃতে লেখা নাট্যসাহিত্য। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে ঐ পশ্চিমী পণ্ডিতেরা যে-অধ্যয়ন শুরু করেছিলেন, আমরা তার জের টেনে চললাম। শুধু তাই নয়, আমরা দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের এক-একজনের অভিমতকে এ বিষয়ে শেষ কথা ব'লে মেনে নিয়ে তুষ্ট থাকলাম। সুতরাং আজ পর্যন্ত ছাত্রদের কাছে ভারতীয় থিয়েটারের অর্থ সংস্কৃত নাটক। পক্ষান্তরে, নাট্যপ্রচেষ্টায় আধুনিক ভারতের আগ্রহ যখন জাগ্রত হল, তখন ভারতীয় থিয়েটার বলতে আমরা বুঝলাম বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা নাটক এবং নাট্যকর্ম। অবশ্য এর মানে এই দাঁড়ায় যে

ভারতীয় থিয়েটার ব'লে কার্যত অখণ্ড একটা কিছু নেই। কিন্তু এটা ঠিক নয়। একেবারে সেই বৈদিক যুগ থেকে এই উপমহাদেশের অধিবাসীরা আঞ্চলিক ও ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই সভ্যতার শরিক হিসেবে বেড়ে উঠেছে। তারা জীবন ও জীবনের সমস্যার প্রতি এক সাধারণ মনোভাব নিয়ে, পূজার্চনা ও কুসংস্কার, বিবাহ ও লোকাচারের মোটামুটি একটা সমতার ভিতরে এমন অবিচ্ছিন্নভাবে জীবন ধারণ ক'রে এসেছে যে আমাদের স্বীকার করতেই হবে একটা কিছু নিশ্চয় আছে যাকে আমরা বলতে পারি ভারতীয়তা। ইতিহাস এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূগোল সাধারণত ভারতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিন্তু তা জীবনযাপন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক অখণ্ড ঐক্য থেকে জনসাধারণকে বিচ্যুত করতে পারে নি। সম্ভবত এই কারণেই ভারতবর্ষ বহুবার বিদেশী আক্রমণকারীর পদানত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ কালক্রমে ঐ সব বিদেশী বিজেতাকে জয় ক'রে আত্মসাৎ করতে পেরেছে এবং যে-সব বিজেতা তা প্রতিরোধ করতে চেয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এ তথ্যটা জোর দিয়ে বলা দরকার, কারণ এক সামগ্রিক ভারতীয় থিয়েটারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্তমান লেখক নিঃসংশয়। প্রদেশ, ধর্ম ও ভাষার আপাত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক ভারতীয় থিয়েটার শুধু প্রাচীন কালেই ছিল না, আধুনিককালেও রয়েছে। এই ভারতীয় থিয়েটার ভারতীয় জনসাধারণের থিয়েটার, যার আবির্ভাব প্রাচীনতম সংস্কৃত নাটকেরও আগে। কখন কিভাবে ভারতীয় থিয়েটারের জন্ম হয় তা বলা শক্ত। বস্তুত শুধু ভারতীয় কেন, যে-কোনো থিয়েটারেরই জন্ম-নিরূপণ অসম্ভব। হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ এবং আমোদ থেকেই থিয়েটারের উৎপত্তি। এবং যেহেতু অনুকরণ ও আমোদের ইচ্ছা

মানুষের স্বভাবগত, সেই হেতু মানুষের উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারেরও উদ্ভব হয়েছে। থিয়েটার যখন যৌথ শিল্পে আত্মপ্রকাশ করল, সম্ভবত নাট্যমঞ্চের সেই প্রারম্ভকেই আমরা থিয়েটারের জন্মকাল ব'লে ধ'রে নিতে চাই। নাট্যকলা সম্বন্ধে সংস্কৃতে এক গ্রন্থ আছে যার নাম 'নাট্যশাস্ত্র'। ভরত নামক এক মুনি তার রচয়িতা বলে অনুমান করা হয়। যদিও তাঁকে মুনি বলা হয়, কিন্তু মনে হয় তিনি কোনো তপশ্চারণ করতেন না, করতেন শুধু নাট্যকর্ম। তিনি এক বা দেড় হাজার বছর আগেকার লোক ছিলেন, কিন্তু তিনিও জানতেন না কবে থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল। সেটা নির্ণয় করা যে অসম্ভব তার ইঙ্গিত তাঁর নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। কারণ তিনি সুকৌশলে ঘোষণা করেছেন যে, নাটকের সৃষ্টিকর্তা হলেন ভগবান ব্রহ্মা। যেহেতু ভগবান ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করেছেন, অতএব তাঁর ক্ষমতা বা যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা কোনো প্রশ্ন তুলতে পারি না। কিন্তু ভরত অতঃপর যা বলেছেন, তা আরও আগ্রহোদ্দীপক। তিনি বলেছেন: "ব্রহ্মারচিত নাট্যশাস্ত্র এত তত্ত্বমূলক, এত পল্লবিত এবং এত গূঢ় যে তা কাজে লাগানো সম্ভব ছিল না। তখন ভরতের কাছে গিয়ে অনুরোধ করা হল তিনি ঐ গ্রন্থকে সহজ ও ব্যবহারযোগ্য ক'রে দিন।"

প্রাচীনকালের প্রকাশপদ্ধতি কিরকম ছিল আমরা জানি। সুতরাং এই কথাগুলির মধ্যে যে একটা ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা ধরতে পারা আমাদের পক্ষে কঠিন নয়। ভগবান ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র রচনার কথা স্বয়ং ভাবেন নি। ভরতের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী সমস্ত দেবতা ব্রহ্মার কাছে গেলেন এক অভিযোগ নিয়ে। অভিযোগটা এই:

সারা পৃথিবীতে জনসাধারণ ইতর পন্থা গ্রহণ করেছে। তারা লোভী, অর্থগৃধ্নু, ঈর্ষাপরবশ ও কলহপরায়ণ হয়ে উঠেছে। তারা জানে না তারা সুখী, না দুঃখী। অনুগ্রহ ক'রে আমাদের চিত্তবিনোদনের কোনো ব্যবস্থা (আক্ষরিক ক্রীড়নক) ক'রে দিন, যা যুগপৎ শ্রুত ও দৃষ্ট হবে। শূদ্রেরা বেদ-পাঠ শ্রবণের অধিকারী নয়; অতএব এক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন, যা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিগম্য হবে। (ছত্র 9-12)

এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, একমাত্র শূদ্রেরাই ইতর ও উন্মার্গগামী হয় নি, কারণ পঞ্চম বেদ অন্যদেরও অধিগম্য করার চেষ্টা হয়। এই পঞ্চম বেদ হল নাট্যশাস্ত্র। তাকে যে বেদ বলা হবে এবং তা সত্ত্বেও শূদ্রেরাও তার অধিকারী হবে, এটাই ভরতের সবচেয়ে বড় পরিহাস। এ ছাড়াও আর এক তাৎপর্য এখানে ধরা যায়। পূর্বকালে কী ধরনের থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল তার উল্লেখ এতে রয়েছে মনে হয়। সে-থিয়েটার ভরত যাদের শূদ্র ব'লে অভিহিত করেছেন, তাদের অশিক্ষিত ও অসংযত রুচি পরিতৃপ্ত করত। এমন-কি, আমাদের কালেও সেই ধরনের এক নাট্যকলা আমরা দেখতে পাই। যদিও ভাস, কালিদাস এবং ভবভূতির মতো নাট্যকারদের নাটকই আমরা ঐতিহ্যের ধারায় পেয়েছি এবং অন্যসূত্রে কোনো নিদর্শনও আমাদের চোখে পড়ে না, তবু ঐ ধরনের একটা থিয়েটার থাকা খুবই সম্ভব ছিল। নাট্যকলা-সম্পর্কিত গ্রন্থে একটা উল্লেখ আছে যা এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে, যদিও কেউ তাকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। ঐ উল্লেখের বিষয় হল উপরূপক (আক্ষরিক অর্থে গৌণ নাটক)। এগুলির অধিকাংশই নৃত্য-নাট্য; এদের বেশীর ভাগের চরিত্রগুলি 'নিম্ন' শ্রেণীর এবং রঙ্গরসিকতা নিম্নশ্রেণীর।

এদের কয়েকটির বিষয় হল প্রেমকাহিনী এবং অধিকাংশের ভাষা হল উপভাষা। 'সাহিত্যদর্পণ' নামক অলংকার ও নাট্যশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থে (চতুর্দশ শতাব্দী) এই জাতীয় আঠারোটি নাটকের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয় নাটকে যে-সূত্রধারের আবির্ভাব সর্বত্র, কয়েকটি উপরূপকে সেই সূত্রধারও অনুপস্থিত। এ কথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে, উপরূপকই ভারতীয় থিয়েটারের প্রাচীনতম রূপ। 'দ্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটার'-এ (1912) ই. পি. হরউইট্জ্ লেখেন যে, সংস্কৃত নাটকের আগে "নিঃসন্দেহে প্রাকৃত নাটকের খ্যাতনামা লেখকেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন" (পৃ. 26)। ঐ লেখকেরা বাস্তবিক হয়তো খ্যাতনামা ছিলেন না এবং প্রাকৃত ব'লে আমরা যা জানি, ভাষাও হয়তো তা ছিল না; কিন্তু এটা নিশ্চিত মনে হয় যে, ভরত এবং সংস্কৃত নাটকের বহুপূর্বে উপভাষায় নাট্যাভিনয় হত এবং সেইগুলির বিরুদ্ধেই ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দেবতারা ভগবান ব্রহ্মার কাছে নালিশ করতে গিয়েছিলেন।

দুই

আগেই বলেছি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে আমরা বিপুলভাবে ঋণী। তাঁরা পথিকৃৎরূপে কাজ করেছেন ব'লেই শুধু নয়, আমরা ঋণী তাঁদের গভীর অধ্যয়ন এবং গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্যও। কিন্তু তাঁরা যত নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজ ক'রে থাকুন-না কেন, তাঁরা

গ্রীক। সভ্যতার প্রতি তাঁদের অধমর্ণ মনোভাব পরিহার করতে পারেন নি। এর ফলে কোনো কোনো পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গ্রীক নাটকের মতো ভারতীয় থিয়েটারও (অর্থাৎ সংস্কৃত নাটক) বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত হয়। ভারতীয় নাটকের জন্মকাহিনী সম্বন্ধে ভরত-কথিত যে বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি, তার দ্বারাই এই মত খণ্ডিত হয়। বৈদিক আর্যদের ধর্মীয় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি ছিল বৈদিক সূক্ত। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর প্রায় সব বর্ণের কাছে ঐগুলির পঠনপাঠন নিষিদ্ধ ছিল। এমন-কি, ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এইরকম একটি কাহিনী আছে যে, ভরতের পুত্রেরা ব্রাহ্মণ ঋষিদের সম্মুখে এক নাটক অভিনয় করে যাতে তারা ঐ ঋষিদের ব্যঙ্গ করে; তখন ব্রাহ্মণ ঋষিরা তাদের অভিশাপ দেন যে, তারা শাশ্বতকাল শূদ্ররূপে বারংবার জন্মগ্রহণ করবে। এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না, কারণ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক সম্মিলিত হত না। প্রাচীন কালে যে-ধরনের থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল (যথা উপরূপক), তার কথা বিবেচনা করলে ভারতীয় নাটককে ধর্ম বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে ভাবা যায় না। জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নাটকের স্থান কী ছিল তার ইঙ্গিত আমরা পাই পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে। ভাসের একটি নাটকে আছে যে, রাম (রামায়ণ কাহিনীর) যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবেন ব'লে একটি নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। রাজা হর্ষের নাটকে সূত্রধারের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঋতু-উৎসবের (বসন্ত) অঙ্গ হিসেবে একটি নাট্যাভিনয় হবে। অর্থাৎ রাজ্যাভিষেক, যুবরাজের জন্ম, শত্রুজয় অথবা ঋতু-উৎসব ইত্যাদি আনন্দের উপলক্ষ্যেই নাট্যাভিনয়ের

ব্যবস্থা হত। জনসাধারণের নিজেদেরও নানা উপলক্ষ্য ছিল এবং নানা নাটক ছিল। আমরা ভবভূতির নাটক থেকেই তা জানতে পাই। তাঁর সমস্ত নাটকই ভগবান কলাপ্রিয়নাথের উৎসব (যাত্রা) কালে অভিনীত হত। প্রাচীন যুগে ফসলকাটা শেষ হলে এই রকম মন্দির-উৎসব উপলক্ষ্য ক'রে পণ্যদ্রব্যের লেনদেন হত এবং পারিবারিক প্রয়োজনের জিনিষপত্র ক্রয় করা হত। ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এই সব উৎসব সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত চ'লে আসছিল এবং কোনো কোনো ভারতীয় ভাষায় এইগুলিকে এখনও পর্যন্ত বলা হয় 'যাত্রা'। চারপাশের গ্রামের অধিবাসীরা এই সব সমাবেশে মিলিত হত। সাধারণত কোনো মন্দিরই ছিল মিলনস্থল। মন্দির-প্রাঙ্গণে নাটকের অভিনয় হত, সেই মুক্ত বিস্তীর্ণ স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীবর্ণের সমস্ত লোক সমবেত হত। এ থেকে বোঝা যায় জনসাধারণের আচরিত ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় নাটকের কোনো সম্পর্ক আদিকালে ছিল না। ভারতীয় নাটক ছিল জনসাধারণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

সংস্কৃত নাটকও গ্রীক নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। 'পর্দা' অর্থে সংস্কৃতে 'যবনিকা' শব্দটির প্রয়োগ থেকে কোনো কোনো পণ্ডিত এই প্রভাব অনুমান করেছেন। 'গ্রীক'-এর (ভারতীয় শাখার গ্রীক, যারা ভারতবর্ষের নিকটতম) প্রাচীন ভারতীয় প্রতিশব্দ ছিল 'যবন' এবং 'যবনিকা' শব্দটি যবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব'লে মনে করা হত। এটা মেনে নিলেও গ্রীক প্রভাব সমর্থিত হয় না। বড় জোর আমরা বলতে পারি গ্রীকদের সঙ্গে সংস্পর্শের পর এমন একটা সময় এসেছিল যখন নাট্যমঞ্চের পর্দা তৈরি করার জন্য গ্রীক বস্ত্র ব্যবহার করা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, পর্দার একটি আরও ভালো

ও আরও উপযোগী সংস্কৃত শব্দ আছে। কালিদাসের নাটকে আমরা তার সাক্ষাৎ পাই। বিক্রমোর্বশীতে (দ্বিতীয় অঙ্ক) উর্বশী একটি 'তিরস্করণী' ব্যবহার করে, যা রাজার দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল ক'রে রাখে। একবার সে বলে 'তিরস্করণীর পিছনে লুকিয়ে থেকে (প্রতিচ্ছন্ন)' সে নিকটে গিয়ে শুনবে তিনি কী বলেন। পরে এক মঞ্চ-নির্দেশনায় সে তা সরিয়ে দেয়।' দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় সকলেই ঐ শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'যাদুমন্ত্র বা ঐন্দ্রজালিক মণি' ব'লে। তাঁর অপর নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-এ কালিদাস ঐ শব্দটি 'অদৃশ্য বা লুক্কায়িত হওয়া'র অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাব্য 'কুমারসম্ভবম্'-এ (চতুর্দশ ছত্র) ঐ শব্দটি স্পষ্টতই ব্যবহৃত হয়েছে 'লুকোনোর পর্দা' অর্থে। সেখানে তিনি বলছেন, পরিধেয় বস্ত্র টানলে কিম্পুরুষ নারীরা লজ্জিত হয় এবং মেঘসমূহ সঙ্গে সঙ্গে তিরস্করণী হ'য়ে সেই দৃশ্যকে অন্যের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে। যেহেতু যবনিকা শব্দটি পর্দা অর্থে ব্যবহৃত, সেই হেতু ভারতীয় নাটক গ্রীক নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, এরকম মনে করা যে কত ভুল সেটাই দেখানো এই দৃষ্টান্তগুলির উদ্দেশ্য।

বস্তুত সংস্কৃত নাটক এবং গ্রীক নাটকের মধ্যে পার্থক্য মূলগত। গ্রীক ধাঁচের ট্র্যাজিডি এবং কমিডি সংস্কৃতে নেই এবং সংস্কৃতে স্বীকৃতও নয়। সংস্কৃত নাটকে ও নাট্যকলায় 'তিন ঐক্যের' সন্ধান মেলে না। আরিস্টটেলীয় আবেগ-স্ফুরণ থেকে রসতত্ত্ব পৃথক। নীতিকথা বলবার জন্যে কোনো 'কোরাস'ও নেই। ভারতীয় থিয়েটার ভারতীয় জীবনধারারই খাঁটি ফসল।

তিন

অন্য এক মত হল এই যে ভারতীয় নাট্য বৈদিক সূক্ত থেকে উদ্ভূত। এই কাব্যিক রচনাগুলি ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এগুলির রচনাকাল খ্রীস্টজন্মের এক হাজার বছরেরও বেশী আগে। সাধারণত এগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা অথবা দেবত্ব-আরোপিত প্রাকৃতিক শক্তির আবাহন। কিন্তু কয়েকটি সূক্ত আছে যাদের নাটকীয় রূপদান সম্ভব ; তাই মনে করা হয় ঐ গুলিই ভারতীয় থিয়েটারের বীজকেন্দ্র। তু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের (গ্রন্থ) ৩৩ সূক্তটি বিবেচনা করা যাক।

বিশ্বামিত্র মুনি তাঁর রথে চ'ড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁর মালপত্র নিয়ে একটি শকট পিছনে পিছনে আসছে। তিনি এসে পড়লেন তুই নদীর সামনে। একটি বিপাশ (আধুনিক বেয়াস), অন্যটি শতদ্রি (আধুনিক সাটলেজ)। তুই নদী জলস্রোতে পূর্ণ হ'য়ে দ্রুত ব'য়ে চলেছে, যেন তুই অশ্ব পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে সম্মুখে ধাবিত। বিশ্বামিত্র তখন তুই নদীকে এবং তাদের নিয়ামক ইন্দ্রকে বন্দনা করতে লাগলেন। অতঃপর এই কথোপকথন :

নদীদ্বয়—আমাদের এই জলে ভূমিকে উর্বর ক'রে আমরা ভগবান (ইন্দ্র) কর্তৃক নির্দেশিত পথে ব'য়ে চলেছি। আমরা

থামতে পারি না, পিছনেও ফিরে যেতে পারি না। মুনি কি অভিলাষ নিয়ে আমাদের এত বন্দনা করছেন তা আমরা জানতে পারি কি ?

বিশ্বামিত্র—আমি কুশিকের পুত্র, আমি কিছু গুল্মলতা সংগ্রহ করছি। আমি তোমাদের নিকট সাহায্য লাভের আশায় তোমাদের প্রভূত বন্দনা করছি। তোমরা কি আমার অনুরোধে এক মুহূর্ত তোমাদের জলস্রোত সংবরণ করবে ?

নদীদ্বয়— বজ্রধর ইন্দ্র আমাদের জন্য সমস্ত বাধা অপসারিত ক'রে এই পথ খনন করেছেন। তিনিই (আমাদের) আদেশ দানের প্রভু, আমরা কেবল সেই আদেশ পালন করি।

বিশ্বামিত্র—হে ভগ্নীরা, আমার অনুরোধ শ্রবণ করো। আমি বহুদূর থেকে সঙ্গে একটি শকট নিয়ে রথে ক'রে এসেছি। তোমরা একটু নত হও এবং শকটের অক্ষদণ্ডের একটু নীচুতে থাকো।

নদীদ্বয়— হে মুনি, তোমার বাক্য আমরা শ্রবণ করলাম। তুমি সঙ্গে শকট নিয়ে রথে ক'রে বহুদূর থেকে এসেছ। নাও, এই আমরা নত হলাম, জননী যেমন সন্তানকে স্তন্যদানে নত হয়, যুবতী যেমন তার প্রণয়ীর সঙ্গে আলিঙ্গনে নত হয়।

বাস্তবিকই এই সংলাপ যথেষ্ট নাটকীয় হতে পারে। কিন্তু এমন অনুমান করার কোনো কারণ নেই যে, এই সংলাপ নাটকীয় ভাবে আবৃত্তি করা হত। এ রকম সংলাপ ভবিষ্যৎ থিয়েটারের উৎস ব'লে মনে করার চেয়ে বরং এ কথা বেশী বিশ্বাস্য যে, কোনো এক ধরনের থিয়েটার তখন ছিল ব'লেই এ রকম রচনা সম্ভব হয়েছিল।

এক পৃথক জাতের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় দশম মণ্ডলের 119 সূক্তে। এখানেও ভগবান ইন্দ্র দেখা দেন। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র সূক্তটি ইন্দ্রের এক স্বগতোক্তির মতো। কাহিনীটি এই যে, ইন্দ্র লব নামক এক মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন ; সেখানে তিনি সোমরস পান করেছেন এবং স্পষ্টতই তিনি নেশাগ্রস্ত। তিনি এই কথা বলছেন :

> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমার গাভীগুলি দান ক'রে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে। নাকি, আমি অশ্বগুলি দান ক'রে দেব ?
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। তা আমাকে উত্তাল ক'রে তুলছে, ঝড় যেমন বৃক্ষরাজিকে উত্তাল ক'রে তোলে।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমি অনুভব কবছি তা আমাকে উত্তোলিত করেছে, যেমন দ্রুতগামী অশ্ব রথ উত্তোলিত করে।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। প্রবল ধাবনবেগ আমার মনে পৌঁছে গিয়েছে, যেমন গাভী তার বৎসের কাছে পৌঁছে যায়।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমার মন ক্রমাগত ঘুরছে, যেমন শকটচালকের আসন-নির্মাণরত সূত্রধর ঘোরে।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমি সকল (অনেক ?) লোককে দেখতে পাচ্ছি।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। স্বর্গমর্ত্য একত্রে আমার অর্ধেকের সমান নয়।
>
> প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। এখন পৃথিবীকে কোথায় স্থাপন করব ? এখানে ? না, ঐখানে ?

প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমি এই জ্বলন্ত গোলককে (সূর্য) উঠিয়ে যে-কোনো খানে ছুঁড়ে ফেলতে পারি।

প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমার একটি ডানা আকাশে, অন্যটি আমি নীচে ঠেলে দিয়েছি।

প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। আমি শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ, আমি অন্তরীক্ষে বহু উচ্চে উত্থিত।

প্রচুর সোমরস আমি পান করেছি। যজ্ঞানুষ্ঠানে আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে। এখন আমি হব অগ্নি এবং আমি (অন্য) দেবতাদের কাছে নৈবেদ্য নিয়ে যাব।

এটা খুবই সম্ভব যে পুরোহিতদের কেউ একজন এই হাস্যোদ্দীপক স্বগতোক্তিটি অভিনয় করতেন। কাহিনীর পূর্বাংশ থেকে আমরা জানতে পাই যে, ইন্দ্র ইন্দ্ররূপে কথা বলছেন না, তিনি লব মুনির আকৃতি (ভূমিকা) গ্রহণ করেছেন।

পরিশেষে আর-একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যেতে পারে, যা বর্তমান বিষয়ের উপর অধিকতর আলোকপাত করবে। এটি হচ্ছে যম এবং তাঁর ভগ্নী যমীর মধ্যে একটি সংলাপ। এ দুইজন প্রথম পুরুষ এবং প্রথম নারী, বৈদিক পুরাণের আদম এবং ঈভ। সংলাপটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের 10 সূক্তে আছে। যম এবং যমী, পৃথিবীর অধিবাসী মাত্র এই দু'জন ; তারা ভ্রাতা এবং ভগ্নী ; সেই সঙ্গেই তারা একজন পুরুষ এবং অন্যজন নারী। সৃজন-উত্তেজনা উদ্রিক্ত হল এবং দেখা দিল এক ঔৎসুক্যজনক জটিল সমস্যা। সম্ভবত যা প্রত্যাশিত এক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, অর্থাৎ যমীই প্রথম প্রলুব্ধ করেছিল .

যমী—আমি সমুদ্রতীরে এই নিভৃত প্রকাণ্ড স্থানে এসেছি এবং আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এসো। সৃষ্টিকর্তা যেন আমার গর্ভে পিতা হিসাবে তোমার সন্তানকে স্থাপন করেন, যে-সন্তান পিতা-মাতা উভয়েরই যোগ্য হবে।

যম—তুমি আকৃতিতে (নারী হিসাবে) পৃথক হতে পার, কিন্তু আমাদের উৎপত্তিস্থান একই, অতএব তুমি যে-রকম বন্ধুত্ব চাইছ আমি তা ইচ্ছা করি না। সৃষ্টিকর্তার যে বীর্যবান পুত্রগণ স্বর্গ বিধৃত করার জন্য বিদিত, তাঁরা এইরূপ মিলন সমর্থন করেন না।

যমী—যে মিলন নরদেহীদের পক্ষে নিষিদ্ধ তাতে তোমার সমস্ত বীর্যবান দেবতা আনন্দ লাভ করেন। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং যেমন নিজ কন্যার পতি ছিলেন, তেমন তুমি আমার দেহ উপভোগ করো।

যম—পূর্বে করা হয়েছে ব'লেই কোনো (অন্যায়) কর্ম আমরা করব না। যে সর্বদা সত্য বলে সে কি করে অসত্য বলতে পারে? সূর্য এবং আকাশ-দেবী আমাদের উভয়েরই পিতামাতা। আমাদের পক্ষে ভ্রাতা ভগ্নীর সম্পর্কই সর্বোৎকৃষ্ট (অর্থাৎ একমাত্র সম্পর্ক)।

যমী—একই গর্ভে আমাদের স্থাপন ক'রে সৃষ্টিকর্তা আমাদের পতি ও পত্নী করেছেন (আক্ষরিক, একই সংসারের অধিকারী)। কেউ যেন অন্যরকম সিদ্ধান্ত না করে। স্বর্গ ও মর্ত্য এ সম্বন্ধে (আমাদের মিলন) সব জানে। প্রথম দিন (মিলনের) সম্বন্ধে কেউ কি কিছু জানতে পারে? কে

তা দেখতে পাবে (এই নিভৃত স্থানে) ? কে অন্যদের তা বলবে ? হে যম, তোমার এখন কি বলবার আছে, যে-তুমি এই বিরাট পৃথিবীতে মানুষদের নরকে পাঠাও ? হে যম, আমার সঙ্গে এক শয্যায় শয়নের ইচ্ছা তোমার মনে জাগ্রত হোক। পত্নীর ন্যায় আমি তোমাকে আমার দেহ উৎসর্গ করব। এসো, আমরা রথের দুই চাকার মতো একযোগে কাজ করি।

যম—ঈশ্বরের গুপ্তচরগণ অপলকনেত্রে এই পৃথিবীতে ভ্রাম্যমাণ। শীঘ্র তুমি অন্য এক পুরুষকে গ্রহণ করো এবং তার সঙ্গে তোমার ঐ রথের চাকার মতো কাজ করো। পৃথিবী এই যমকে অহোরাত্র পূজা করুক। সূর্য এই যমের জন্য দীপ্যমান থাকুক। স্বর্গ ও মর্ত্যের ন্যায় দিবস ও রাত্রি এই যমের আত্মীয় হোক। এবং যমী এই যমের ভগ্নীরূপে বাস করুক। একটা সময় আসবে যখন ভগ্নীরা ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। অতএব আর কাউকে তোমার পতিরূপে নির্বাচন করো এবং তোমার বাহুকে তার উপাধান করো।

এখানে এই নাটকীয় সংলাপ ছাড়াও যেন রঙ্গমঞ্চের উপর এক দৃশ্য রচনা করা হয়েছে, সমুদ্রতীরে বিরাট পরিসরে এক নির্জন স্থানের দৃশ্য। উপরন্তু, এক আবেগের আবহাওয়াও সৃষ্টি করা হয়েছে। এমন রচনা নাটকের উৎপত্তির মূল হতে পারে কিনা সন্দেহ। বরং এ থেকে থিয়েটারের পূর্ব অস্তিত্বই অনুমিত হয়। অতএব এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, বৈদিক সূক্তে ভারতীয় থিয়েটারের প্রারম্ভ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রারম্ভ নিশ্চয়ই আরও

প্রাচীন কালে নিহিত। যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে আমাদের এই তথ্যই স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে, উপরূপক ধাঁচের থিয়েটার পূর্বেকার যুগ থেকেই ছিল এবং একটা বিশেষ অধ্যায়ে এই থিয়েটারের অবনতি হয়েছিল, যে-অবনতিকে ভরত "হীন, ইতর ও অশিক্ষিত" অবস্থা বলে নির্দেশ করেছেন। শুধু তখনই দেবতারা বা ব্রাহ্মণেরা হস্তক্ষেপ করে থিয়েটারকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে রুচিসম্মত-ভাবে সংগঠনের সিদ্ধান্ত করেন।

চার

এরকম সংগঠনের প্রথম যে-প্রচেষ্টা আমরা জানি তা হল "নাট্যশাস্ত্র", ভরত মুনি যার রচয়িতা ব'লে কথিত। "প্রথম" মানে এ নয় যে, সেটাই প্রাচীনতম। পক্ষান্তরে, গ্রন্থের মধ্যে একাধিক বিষয়ে অন্য অনেকের মতামতের উল্লেখ আছে, যা থেকে মনে হয় এটা পরে লেখা হয়েছে। কাহিনীতে আছে যে, ভগবান ব্রহ্মা-রচিত বিরাট মূল গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ভরতকে বলা হয়। গ্রন্থের মধ্যে যে-সব পুনরাবৃত্তি এবং পরস্পর-বিরোধী উক্তি আছে তা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বহু ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এতে সংযোজন করেন, যেন সেই আদি বিরাটত্ব ফিরিয়ে আনাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত গ্রন্থে সাঁইত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে, এগুলিতে হ্রস্ব ছন্দে রচিত মোট 5,569টি ছত্র আছে, যাদের বলা হয় শ্লোক। তা ছাড়া কিছু গদ্যাংশ অছে, যা পড়লে মনে হয় যেন শিক্ষকদের ব্যাখ্যা বা টীকা।

এই কারণেই এ গ্রন্থ কবে রচিত হয়েছিল তা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। এমন-কি, কোনো এক ব্যক্তি হয়তো এর রচয়িতা ন'ন। কিছু নাটকের অস্তিত্ব 'নাট্যশাস্ত্রে' ধরে নেওয়া হয়েছে এবং কিছু প্রাচীন নাট্যকার এর বিধিবিধান অনুসরণ করেন নি। অতএব এটা অনুমান করা যুক্তিসংগত যে, 'নাট্যশাস্ত্র' তার বর্তমান আকৃতি চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীস্ট-শতাব্দের পূর্বে পায় নি।

গ্রন্থটির প্রধান উদ্দেশ্য হল নাটকে কি দেখানো উচিত এবং কি দেখানো উচিত নয়, তার নির্দেশ দেওয়া। নাটককে মূলত এক শ্রাব্য ও দৃশ্য প্রযোজনা ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। লোকে যা উভয়ত শোনে এবং দেখে, তাকে হতে হবে উত্তম, শালীন, শোভন, প্রীতিকর, শিক্ষাপ্রদ এবং মানসিক উন্নতি-সাধক। সংসারের গতি প্রকৃতি (লোক-চরিত) এবং মানুষের আচার-আচরণ দেখাতে হবে, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী শিক্ষা এবং পথ-নির্দেশ পায়। নচেৎ নাটককে পঞ্চম বেদরূপে গণ্য করা চলে না। আমাদের ঐতিহ্যে বৈদিক সাহিত্য সমস্ত জ্ঞানের আদি উৎস।

> মানুষের ভালো এবং মন্দ এবং মধ্যবিধ কর্মের উপর ভিত্তি করে উপদেশ দিতে হবে; সে-কর্মের মধ্যে থাকবে সাহস আনন্দ, এবং সুখ। নাটক হবে দুঃখ অথবা ক্লান্তি অথবা শোক অথবা দুর্ভাগ্য দ্বারা পীড়িত মানুষের চিত্তবিনোদনের উপায়; তা হবে বিশ্রাম (শরীর ও মনের পক্ষে)। (113-114 ছত্র)

এই কারণে নিষ্ঠুরতা বা মৃত্যুকে মঞ্চে দেখানো চলবে না। এবং শ্রোতৃমণ্ডলীতে যেহেতু পুরুষ ও নারী নানান্ ধরনের মানুষ থাকে, সেই হেতু চুম্বন ও আলিঙ্গনের মতো অশোভন জিনিষও দেখানো

যাবে না। তবে সবটাই এক গুরুগম্ভীর নৈতিক শিক্ষা হলে হবে না। নাটকের একই সঙ্গে হওয়া চাই চিত্তবিনোদক ও শিক্ষাপ্রদ।

কী দেখানো হবে এবং কী দেখানো হবে না, ভরত শুধু তাই বলেন না; কিভাবে দেখানো হবে তাও তিনি ব'লে দেন। তাঁর কথায় নাটক হল মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণের অনুকরণ ('লোক-বৃত্ত, অনুকরণ')। মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণ রঙ্গমঞ্চে মূর্ত করতে হবে। সুতরাং নাটককে সংস্কৃতে শ্রেণীবাচক শব্দ 'রূপক' নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা আকার দেয়। ব্যক্তির ব্যবহৃত সমস্ত প্রকাশ-মাধ্যম, যথা, কথা, অঙ্গভঙ্গি, নড়াচড়া, সমস্তই ব্যবহার করতে হবে। এক বা একাধিক মাধ্যমকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে অথবা এক বা একাধিক মাধ্যমের উপর জোর দেওয়ার ফলে নাট্যরূপায়ণ বিভিন্ন প্রকারের (বৃত্তি) হয়। ভরত চারটি প্রধান শ্রেণীর কথা বলেছেন : ১. যাতে বাক্য এবং কাব্য প্রধান (ভারতী বৃত্তি), ২. যাতে নৃত্য ও সংগীত প্রধান (কৈশিকী বৃত্তি), ৩. যাতে ক্রিয়া প্রধান (আরভতী বৃত্তি), এবং পরিশেষে, ৪. যাতে আবেগ প্রধান (সাত্ত্বতী বৃত্তি)। প্রত্যেক মাধ্যম সম্বন্ধে অভিনেতাদের প্রায় সব কিছু জানতে হবে। সুতরাং নাট্যশাস্ত্র বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছে কিভাবে ভাষা গঠিত হয়, কিভাবে ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন অর্থব্যঞ্জনার জন্য কৌশল ও স্বরবৈচিত্র্য প্রয়োগ করা হয়। অভিনেতাদের এও জানা দরকার যে, লোকে মাথা, হাত, কোমর, বুক, পা, চোখ, ভ্রূ, ঠোঁট, চিবুক ইত্যাদির ভঙ্গি দ্বারা অনুভূতি প্রকাশ করে। এমন-কি, চলন এবং পদক্ষেপের মাপ থেকেও প্রকাশ পায় কোনো লোক কী বলতে বা করতে চাইছে এবং কী অনুভব করছে। শুধু তাই নয়, অভিনেতাদের

এও জানা দরকার যে, একজন লোক যে অঞ্চলে বাস করে এবং সমাজের যে শ্রেণীভুক্ত তার জন্যও তার ভাষা ও ভঙ্গির পার্থক্য ঘটে। যেমন ঘটে বয়সের জন্য এবং নারী-পুরুষ ভেদে।

ভরতের অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমশীল প্রতিভার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়ের কোনো দিক, কোনো খুঁটিনাটি বাদ দেন নি। অসাধারণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তিনি নাট্যকারকে বলেছেন কিভাবে নাটক লিখতে হবে, কী ধরনের নায়ক ও নায়িকা নির্বাচন করতে হবে, কিভাবে আরম্ভ করতে হবে, কিভাবে ঘটনার সঙ্গে ঘটনা সংযুক্ত ক'রে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিভাবে নির্বাচিত ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এবং কিভাবে শেষ করতে হবে। কিন্তু তাই সব নয়। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকেও শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে নাটক দেখতে হয় এবং উপভোগ করতে হয়। আরও অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন যে, নাটকের শ্রোতৃমণ্ডলীতে যোগদান করতে হলে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করা দরকার এবং সে-যোগ্যতা তিনি নির্দিষ্টও করে দিয়েছেন।

নাট্যানুষ্ঠানের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া যেমন ভরত ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, কোথায় (কোন্ স্থানে ও পরিবেশে) তা দেখাতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি এক কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন। তিনি ভগবান ব্রহ্মার 'নাট্যশাস্ত্র'কে সংক্ষেপ ক'রে কার্যোপযোগী করার ভার পাওয়ার পর তাঁকে তাঁর প্রথম নাটক প্রস্তুত এবং প্রদর্শন করতে বলা হয়। ভরত তখন দেবদানবের অমৃতমন্থনের কাহিনীটি নাট্যে রূপায়িত করেন। তিনি নিজের শতপুত্র দ্বারা বিরাট কুশীলব তালিকা পুরণ ক'রে ফেলেন

নাটক যেহেতু সমস্ত বর্ণের লোকের (সর্ব বর্ণিক) কাছে অবারিত ছিল, সেইজন্য এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা শুধু উন্মুক্তস্থানেই করা সম্ভব ছিল। তাই তিনি করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দানবরা এই নাট্যানুষ্ঠানে বিক্ষুব্ধ হয়, কারণ তারা পরাজিত দুর্বৃত্তরূপে ঐ কাহিনীতে চিত্রিত হয়েছিল। তারা শুধু গোলমাল ক'রেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা রঙ্গমঞ্চটিও ভেঙে ফেলে। এর ফলে ভরতের চিন্তা শুরু হয়। প্রথমে তিনি দানবদের শান্ত করবার জন্য ভগবান ব্রহ্মার সাহায্যপ্রার্থী হন। ব্রহ্মা দানবদের জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কেন ক্রুদ্ধ হয়েছ? তোমরা কেন মর্মাহত বোধ করছ? নাটকের উদ্দেশ্য শুধু হল আচরণ ও অনুভূতি মঞ্চে প্রদর্শন করা। সর্বদা দেবতাদের সমর্থন করার অথবা দানবদের বিদ্রূপ করার কোনো উদ্দেশ্য তার নেই। ভালো এবং মন্দ, আনন্দ এবং দুঃখ, হাসি এবং কান্না, দুষ্টের শাস্তি এবং সজ্জনদের সমৃদ্ধি— এই যে সমস্ত বৈচিত্র্য পৃথিবীতে দেখা যায় তাই এখানে দেখানো হচ্ছে।" এইরূপ ব্যাখ্যায় ও উপদেশে দানবরা শান্ত হয়। কিন্তু ভরত ভাবেন যে ওটাই যথেষ্ট নয় এবং স্থায়ী সমাধানও নয়। নাটক বস্তুটির রূপই এমন যে তার দ্বারা জন-শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রত্যেক নাট্যানুষ্ঠানের জন্য একটি নাট্যগৃহের আশ্রয় প্রয়োজন। এইভাবেই প্রথম নাট্যগৃহ নির্মিত হল। নাট্যগৃহের উদ্দেশ্য প্রধানত হল বাইরে থেকে হাঙ্গামা সৃষ্টি নিবারণ করা। তবে নাট্যগৃহ যেন প্রযোজনা বা শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে বাধা না হয়। এজন্য ভরত তিন প্রকার নাট্যগৃহ নির্মাণের বিধান দেন: ১. বড় (বিকৃষ্ট), ২. ছোট (ত্রস্র), এবং ৩. মাঝারি (চতুরস্র)। যে ক্ষেত্রে

কাহিনীতে ক্রিয়াকলাপ প্রচুর এবং কুশীলব তালিকা বৃহৎ, সে ক্ষেত্রে নাট্যগৃহ হবে আয়ত এবং শ্রোতৃমণ্ডলী বৃহৎ রঙ্গমঞ্চের সামনাসামনি বসবে। এই ধরনের নাটকে দেখার জিনিষই বেশী। যদি দেখার জিনিষ এবং শোনার জিনিষ তুই-ই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলে মাঝারি আকারের গৃহই উপযোগী। এটা প্রধানত নৃত্য-নাট্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এখানে শ্রোতৃমণ্ডলী রঙ্গমঞ্চের চারদিকে বসতে পারে। পরিশেষে, যেক্ষেত্রে শ্রাব্য বস্তু দৃশ্য বস্তুর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেক্ষেত্রে ছোট নাট্যগৃহ নির্মাণ করতে হবে, সেখানে রঙ্গমঞ্চের তিনদিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য আসনের ব্যবস্থা থাকবে। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে কোনো স্থায়ী নাট্যগৃহ ছিল না। নীচু প্রাকার দ্বারা ঘেরা কোনো মন্দির-প্রাঙ্গণ অথবা প্রাসাদ-সীমানার অন্তর্গত কোনো উদ্যান আশ্রয় ও সুবিধা উভয়তই উপযোগী মনে করা হত। এটা অবশ্য পরবর্তী কাহিনী। প্রথম যুগে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের জন্য একটি নাট্যগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। স্থান নির্বাচন, জমি পরিষ্কার, আয়তনের মাপজোক ইত্যাদি ক'রে তবে এই নাট্যগৃহ নির্মাণ। সঠিক মাপজোকের উপর খুব জোর দেওয়া হত। বস্তুত, মাপবার সূত্র (সূত) এত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় যে, ভরত নির্দেশ দেন কিভাবে এবং কার দ্বারা তা তৈরী করাতে হবে। যদি রজ্জু ছিঁড়ে যায়, তা হলে তা কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার লক্ষণ। এই রজ্জুর (সূত) গুরুত্বপূর্ণ এবং বংশপরম্পরাগত চারণ অর্থে ব্যবহৃত ঐ একই শব্দ (সূত), এ দুয়ের যোগাযোগ থেকেই পরিশেষে আমরা ভারতীয় নাটকের প্রযোজক-কর্মাধ্যক্ষ 'সূত্রধার'কে পেয়েছি ব'লে মনে হয়। পট্টদকল নামক স্থানে (কর্ণাটকে বাদামীর নিকট) এক শিলালিপিতে, সেইদেশের রানী মন্দির-ভবনের 'সূত্রধার'কে তাঁর দানের কথা ঘোষণা

করেছেন। স্পষ্টতই, এই শব্দটি 'স্থপতি' অর্থেও ব্যবহৃত হত। যে-ব্যক্তি আয়তনের মাপজোক করতেন, পরিশেষে তিনি প্রযোজক-কর্মাধ্যক্ষ হ'য়ে গেলেন।

পাঁচ

'নাট্যশাস্ত্র' ভারতীয় নাটককে শুধু যে একটা আকার এবং লক্ষ্য দিয়েছিল তাই নয়, জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নাটককে একটা নির্দিষ্ট স্থান দিয়েছিল। এইখানেই 'নাট্যশাস্ত্রে'র মহত্ত্ব। প্রাচীনকাল থেকেই নাটক ছিল, সক্রিয়ভাবেই ছিল; কিন্তু তা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী। স্বতঃস্ফূর্ত এক আঞ্চলিক অবসর-বিনোদনের বেশী কিছু ছিল না। এ কথা সত্য যে, 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনেক আগেও উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারেরা ছিলেন। কিন্তু কয়জন আমাদের ঐতিহ্যে জীবিত আছেন? প্রথম শতাব্দীর অশ্বঘোষকে আমরা পাই, কিন্তু তাঁর একটি নাটকের কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ ছাড়া নাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এমন-কি, যে ভাসের নাম আমরা কালিদাস এবং পরবর্তী লেখকদের রচনা থেকে জানতাম, তাঁর নাটকগুলি তো মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের হাতে এসেছে। সম্ভবত কালিদাস 'নাট্যশাস্ত্রে'র আগের কালের লোক; সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মানুষের আঞ্চলিক নাটক ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভরতই অথবা ঐ নামে যাঁকেই নির্দেশ করা হোক-না কেন, তিনিই নাটককে একযোগে চিত্তবিনোদন

এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করেন। তাঁর আগে অবস্থা অন্যরকম ছিল। তখন এই ধরনের চিত্তবিনোদন-ব্যবস্থার রূপ বিভিন্ন প্রকার ছিল। তার সংখ্যা নিশ্চয় যে-সব অঞ্চলে তা প্রচলিত ছিল তাদের সংখ্যারই সমান। এবং সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্য ও সংগীত ছাড়া আর কিছু এমন ছিল না যাকে নাটক বলা যায়। ভারতীয় নাটক নৃত্য, সংগীত এবং বচনকে সমন্বিত করেছে, এই সাধারণ বিশ্বাস ভরতের ঐতিহ্য অনুসারে ঠিক নয়। 'নাট্যশাস্ত্রে' ভরত তাঁর আর একটি অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছেন, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর প্রথম নাট্যপ্রযোজনার ('অমৃতমন্থন') ব্যর্থতার পর ভরত পরবর্তী নাট্যপ্রযোজনার জন্য একটি নাট্যগৃহ নির্মাণ করান। এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে তিনি অন্যদের সঙ্গে দেবাদিদেব শিবকেও আমন্ত্রণ করেন। নাটকটি শিবের ভালো লাগে। অনুষ্ঠানের পর তিনি নাটক আরও ভালো করার জন্য একটি প্রস্তাব দেন। অনুষ্ঠানকে আরও চিত্তাকর্ষক করবার জন্য তিনি ভরতকে নৃত্য ও সংগীত প্রবর্তন করতে বলেন। ভরত সম্মত হন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি সংগীত ও নৃত্যের জন্য একটা স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেন। তাঁর প্রথম নাট্যানুষ্ঠানের চরম বিফলতার পর ভরত নিরাপত্তার খাতিরে নাটক আরম্ভের আগে কয়েকজন দেবতার আরাধনার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটা 'পূর্বরঙ্গ' (একধরনের মুখবন্ধ) নামে পরিচিত। এই মুখবন্ধে নৃত্য ও সংগীত প্রবর্তন করা হয়। কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলে নাটকের মধ্যে তাদের স্থান ছিল না। এমন-কি, মুখবন্ধেও "নৃত্য ও সংগীতের বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। যদি বাড়াবাড়ি করা হয়, তা হলে শুধু শিল্পীদের নয়, শ্রোতাদেরও ক্লান্ত বোধ করার সম্ভাবনা", এ কথা ভরত বলেন। (পঞ্চম পরি, 162-163)।

ভরতের অন্য কীর্তি হচ্ছে নাটককে একটা নির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়া। বস্তুত তিনি কাহিনী ও চরিত্র অনুযায়ী নাটকের দশ প্রকার শ্রেণীভাগ করেছেন। তিনটি শ্রেণী আছে যাদের নাম 'ডিমা', 'সমবকার' এবং 'ঈহামৃগ'। তাদের চরিত্রগুলি হল দেবতা ও দানব, আর তাদের কাহিনীতে থাকে যুদ্ধবিগ্রহ, ডাকিনীবিদ্যা ইত্যাদি। এদের দ্বিতীয়টির থাকে তিনটি ক'রে এবং অন্য দুটির থাকে চারটি ক'রে অঙ্ক। অতঃপর আছে তিন প্রকার একাঙ্কিকা, এদের নাম হল 'ভাণ' 'প্রহসন' এবং 'বীথি'। এগুলিতে একটি বা দুটি 'নিম্নশ্রেণী'র চরিত্র থাকে। এটা স্পষ্ট যে, এই শেষোক্ত তিনটিতে এবং প্রথমোক্ত তিনটিতে ভরত আগেকার প্রচলিত শ্রেণীগুলি স্বীকার করেছেন। যিনিই কাহিনী লিখুন-না কেন (যদি লেখক কেউ থেকে থাকেন), পুরাণ ও লোক-উপাখ্যান থেকে তা নিলেই চলত। অবশিষ্ট চারটিতে নায়ক অথবা কাহিনী "তৈরি করতে হত কবিকে" ('কবিকল্পিত')। এদের দুটিতে, যাদের নাম 'অঙ্ক' এবং 'প্রকরণ', নায়ক সাধারণ জীবনযাত্রার মানুষ, 'ব্যাযোগ'-এ নায়ক রাজর্ষি এবং শেষটিতে অর্থাৎ 'নাটক'-এ নায়ক উচ্চ বংশোদ্ভূত প্রথানুযায়ী চরিত্র। 'অঙ্ক' এবং 'ব্যাযোগ'-ও একাঙ্কিকা, এবং অন্য দুটিতে পাঁচ থেকে সাত অঙ্ক সন্নিবিষ্ট করা চলে।

আগেই উল্লেখ করেছি, 'নাট্যশাস্ত্র' আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের সমগ্র গঠন নির্দেশ ক'রে দিয়েছে। নাটক আরম্ভ হয় 'পূর্বরঙ্গ' দিয়ে, যাতে নানান্ দেবতার বন্দনা করা হয়। ভরতের কীর্তি যে কত বিরাট তা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি আজও ভারতবর্ষের যে-কোনো অঞ্চলে যে-কোনো ভাষায় প্রত্যেকটি গ্রাম্য নাটক আরম্ভ হয় ভরত যেমন বিধান দিয়েছেন ঠিক সেই ভাবে।

সূত্রধার তাঁর ঐ নামেই অথবা আঞ্চলিক ভাষার সমার্থক নামে নাটক আরম্ভ করেন প্রায় সেই সব বাক্য দিয়েই যা ভরত ব'লে গিয়েছেন (এমন-কি, আধুনিক শহুরে থিয়েটারেও প্রথম আমলে তাই হত, কিন্তু এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে)। পর্দা ব্যবহার করা হয় না, পর্দা নামিয়ে অঙ্কগুলি পৃথক করা হয় না। এইসব খুঁটিনাটি বিষয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষিত এবং সমগ্র উপমহাদেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত রয়েছে, এর জন্যই আমরা এক অখণ্ড ভারতীয় থিয়েটারের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে উৎসাহিত হই। ভারতীয় থিয়েটার সমগ্র উপমহাদেশের এক অখণ্ড নাট্যকলাই শুধু নয়, তা এক ঐতিহ্যও বটে, যা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমস্ত উপপ্লব অতিক্রম ক'রে টিঁকে রয়েছে। এই হল ভরত ও তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে'র পরম কৃতিত্ব।

সংস্কৃত নাটক

এক

ভারতীয় থিয়েটারের আদিপর্ব সম্বন্ধে পূর্ববর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ১. বৈদিক সূক্তের আগে থেকেই এক ধরনের থিয়েটারের অস্তিত্ব ছিল, এবং ২. যাকে আমরা এখন ভারতীয় থিয়েটার বলি, ভরতই তার গোড়াপত্তন করেন। তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ দুটি ঘটনার মধ্যে ব্যবধান বহু শতাব্দীর। মধ্যবর্তী কালে এক বিরাট কাণ্ড ঘটে, যার ফলে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের জন্ম হয়। এ কাণ্ড হল খ্রীস্টজন্মের এক বা দুই শতাব্দী আগে মহাকাব্য 'মহাভারতে'র প্রকাশ। গোড়ায় এটি ছিল একটি খণ্ডকাব্য যাতে কৌরব ও পাণ্ডব নামে দুই ভ্রাতৃ-পরিবারের মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধ বর্ণিত হয়। সেই প্রাচীন কালে রাজারা তাঁদের রাজসভায় ভাট নিযুক্ত করতেন। এই ভাটেরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের এবং রাজন্যের পিতৃপুরুষদের গৌরবগাথা রচনা ক'রে গান গাইতেন। স্পষ্টতই, এটা ছিল একটা জনপ্রিয় অবসর বিনোদক অনুষ্ঠান। কারণ ভাট ছাড়াও ছিলেন ভ্রাম্যমাণ চারণ দল। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সামনে প্রাচীন বীরদের এবং পৌরাণিক নায়কদের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা ক'রে গান গাইতেন।

'মহাভারতে'র আদি রূপের নাম ছিল 'জয়'। বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের অতিমানবিক কার্যকলাপের জন্য 'জয়' নিশ্চয় খুব জনপ্রিয় ছিল। এই জনপ্রিয়তার জন্য ভাট ও চারণেরা স্বভাবতই তাতে আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা যোগ করতে উৎসাহিত হয়। সম্ভবত এক শতাব্দী বা দুই শতাব্দীর মধ্যে এমন একটা সময় আসে যখন তা আমরা যাকে 'মহাভারত' ব'লে জানি সেই আকার নেয়। যে-সব ঘটনা মূল কাহিনীকে গ্রথিত করে শুধু সেই সব ঘটনাই নয়, বাইরের অনেক ঘটনাও তাতে স্থান পায়। এই মহাকাব্যে একটি ছত্র আছে এই: "যা এখানে আছে, তা তুমি অন্যত্র পাবে; যা এখানে নেই, তা তুমি কোথাও পাবে না।" এটা শূন্যগর্ভ দম্ভোক্তি নয়। সমস্ত বৈদিক পুরাণ, সমস্ত প্রচলিত লোকসাহিত্য, সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্য, এমন-কি, ধর্মের বিভিন্ন রূপ এবং দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

এই মহাকাব্য 'শ্লোক' নামক এক পদ্যবন্ধে রচিত। কাহিনী বর্ণনার পক্ষে তা খুব উপযোগী। মহাভারতের রচনাশৈলী প্রাঞ্জল এবং সতেজ, ধ্বনিপ্রবাহ বাঙ্ময়। নাটকীয় পরিস্থিতি এবং সংলাপও রয়েছে। শাস্ত্র (প্রামাণ্য গ্রন্থ) এবং পুরাণ (আবৃত্তির জন্য রচিত পবিত্র গ্রন্থ), এই দুই ভূমিকা মহাভারতকে অর্পণ ক'রে তার জনপ্রিয়তা আরও বাড়ানো হয়।

এ মহাকাব্যের কথক নিজের নাম বলেন সৌতি অর্থাৎ সূতের পুত্র। মনে হয়, সূত এক বংশানুক্রমিক চারণ জাতি। মুনিদের এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে সৌতি গান করেন। মুনিরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি বলেন: "হ্যাঁ, এ সম্বন্ধে আমি আমার পিতার কাছ থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয় জেনেছি"; অতঃপর তিনি সংযোজন

করতে থাকেন, দৃষ্টান্ত দিতে থাকেন এবং ব্যাখ্যা করতে থাকেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত ক'রে বৈদিক হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার এক বিরাট চেষ্টাই মহাভারতে প্রতিফলিত। বৌদ্ধ ধর্ম যে চার বা পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে অন্য দেশে নির্বাসিত হয় সেটা মহাভারতের সাফল্যের এক নিদর্শন ব'লে মনে হয়। এর অর্থ এই নয় যে, বৌদ্ধধর্মের কোনো বিশ্বাসযোগ্য পাল্টা জবাব মহাভারত দিতে পেরেছিল। এ কাব্যে অন্যান্য জিনিষ এত আছে যে, ঐ রকম প্রভাব সৃষ্টি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। মহাভারত শুধু যে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল তা নয়, পরন্তু ঐ রকম প্রচার লাভ করেছিল ব'লেই তা বর্তমান কাল পর্যন্ত তার আবেদনও বজায় রেখেছে। আধুনিককালে একজন নিরক্ষর কৃষকও এই মহাকাব্যের কাহিনী এবং নায়কদের জানে।

বর্ণনা-শৈলীর একটা বিশেষত্ব এই মহাকাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ বলা যেতে পারে। এ কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এ কাব্যে অনেক সংলাপ আছে। এগুলি মূল বর্ণনাত্মক কাব্যের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট করা হয় নি, করা হয়েছে বাইরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভীষ্মের মতো এক চরিত্র যখন কথা বলবার উদ্যোগ করেন, তখন কথক তাঁর আবৃত্তি থামিয়ে দিয়ে বলেন: "এখন ভীষ্ম বলছেন", অতঃপর তিনি পরবর্তী কলি শুরু করেন। কথক ও শ্রোতৃমণ্ডলী পরস্পরের ধরন-ধারণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কথক আর সব সময় থামবার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। কে এবার কথা বলছেন তা ঘোষণা না ক'রে সেই চরিত্রের উপযোগী সুরে ব'লে যেতেন। তা থেকেই শ্রোতারা বুঝে নিত কে বলছেন। এইভাবে ক্রমে

নাটকীয় সংলাপের একটা রীতি বিকাশ লাভ ক'রে থাকতে পারে।

আর একটি জনপ্রিয় মহাকাব্য 'রামায়ণ'। প্রসঙ্গত, এতে দু'জন গায়কের কথা আছে। একজন হলেন কুশ, অন্যজন লব। দুই গায়ক থাকায় সংলাপ এক নাটকীয় দৃশ্যে পরিণত হত। গায়কের সংখ্যা এক হোক বা দুই হোক বা অনেক হোক, এটা নিশ্চিত যে, সংলাপ-সমন্বিত মহাকাব্যিক কাহিনীই ছিল ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের বীজকেন্দ্র। সূত বা সৌতি অর্থাৎ চারণ অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করার মতো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারে পরিণতি লাভ করেছেন। প্রযোজক-কর্মাধ্যক্ষ হওয়া ছাড়াও সূত্রধার একজন অভিনেতাও ছিলেন। ভবভূতির একটি নাটকে (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) সূত্রধার তাঁর সঙ্গীকে বলেন : "যদি সব প্রস্তুত হয়ে থাকে, তা হলে আরম্ভ করা যাক। আমি কামন্দকীর ভূমিকা নেব আর তুমি নাও তার শিষ্যার ভূমিকা।"

দুই

আমাদের জানা প্রাচীনতম ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যকার ভাস। তাঁর নাটকগুলি পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, মহাকাব্য দুটিই সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যকে প্রথম প্রেরণা যোগায়। ভাসের নাম আমরা জানতে পারি কালিদাসের একটি নাটক মারফত। কিন্তু

ভাসের রচনা আবিষ্কৃত হয় মাত্র ৫০।৬০ বছর আগে। তেরোটি নাটক আছে, এদের সবগুলিই ভাসের রচনা ব'লে আবিষ্কারক পণ্ডিত নির্দেশ করেন। কিন্তু সকলে তা মানেন না। কয়েকটি নাটকের রচয়িতা কে তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এ বিতর্ক অবশ্য আমাদের বক্তব্যের পক্ষে অবান্তর। তেরোটি নাটকের মধ্যে ছয়টি মহাভারত থেকে নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে লেখা। এগুলি যে ভাসের লেখা সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই। অন্য দুটি নাটক অপর মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনী নিয়ে লেখা। একটি নাটক, যা ভাসের রচনা ব'লে মনে হয় না, তার বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণের শৈশব। দুটি নাটকে জনপ্রিয় পৌরাণিক নৃপতি উদয়নের কাহিনীকে নাট্যরূপায়িত করা হয়েছে ; এদুটিই ভাসের রচনা ব'লে স্বীকৃত। 'চারুদত্ত' ও 'অবিমরক' নামক অবশিষ্ট দুটি নাটকে ভাসের রচনা-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

দশ বা তেরোটি বিষয়বস্তুর ছয়টিই যে মহাভারতের ঘটনা থেকে নেওয়া, এ থেকেই বোঝা যায় এই মহাকাব্য ভাসকে কি গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রভাব আরও পরিলক্ষিত হয় তাঁর লেখন-শৈলীর প্রাঞ্জলতায়, তাঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা-পদ্ধতিতে এবং মহাভারতের ছন্দের প্রতি তাঁর অনুরাগে। শুধু তাই নয়। দেখা যায়, নাটকীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে ওতপ্রোত রয়েছে বৈদিক হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব কীর্তনের আগ্রহ। এ সংস্কৃতি মহাভারতই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভাসের নাটকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

মহাভারতের ঘটনা নিয়ে রচিত ছয়টি নাটকের মধ্যে মাত্র একটি, 'পঞ্চরাত্র', আকারে বড়, অর্থাৎ তিন অঙ্কে। অবশিষ্ট পাঁচটি,

'দূতবাক্য', 'দূতঘটোৎকচ', 'মধ্যম-ব্যাযোগ', 'কর্ণ-ভর' এবং 'উরু-ভঙ্গ', এদের প্রত্যেকটি একাঙ্কিকা। যজ্ঞানুষ্ঠানের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে 'পঞ্চরাত্র' আরম্ভ করা হয়। দুর্যোধন এক যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন; তিনি তাঁর গুরু দ্রোণকে প্রতিশ্রুতি দেন দ্রোণ যা চাইবেন তিনি তাঁকে তাই দান করবেন। দ্রোণ এই মনস্কামনা ব্যক্ত করলেন যে, পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। দুর্যোধন সম্মত হলেন, কিন্তু একটি শর্তে। যদি পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাস থেকে পাঁচ রাত্রির মধ্যে (এ থেকে নাটকের নাম) বেরিয়ে আসেন, তা হলে তিনি তাঁদের অংশ ফিরিয়ে দেবেন। কৌরবেরা রাজা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং বিরাটের প্রাসাদে অজ্ঞাতবাসী পাণ্ডবেরা সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। অর্জুন নপুংসকের ছদ্মবেশে নৃত্যশিক্ষক রূপে বাস করছিলেন, তিনি কৌরবদের পরাজিত করলেন; তখন তাঁর ও তাঁর ভাইদের পরিচয় প্রকাশ পেল। দুর্যোধন তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন, তিনি পাণ্ডবদের অংশ ফিরিয়ে দিলেন। বৈদিক হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি ভাসের শ্রদ্ধা নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ পায়। যজ্ঞানুষ্ঠানের গুণকীর্তন করা হয়। সর্বজন-সম্মানিত বর্ষীয়ান ভীষ্ম দ্রোণকে প্রণাম করেন এই ব'লে: "আপনি ব্রাহ্মণ এবং আমি ক্ষত্রিয়।" (প্রথম অঃ—27)। এক স্ত্রীলোকের স্বভাব-দোষে একটি উত্তম পরিবার ধ্বংস হ'য়ে যায়। (প্রথম অঃ—14)। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা-নির্দিষ্ট কর্তব্য কঠোরভাবে পালন করতে হবে, সুতরাং "একজন ক্ষত্রিয়কে হয় রণক্ষেত্রে মরতে হবে, নয় শত্রুজয় করতে হবে।" (তৃতীয় অঃ—5)।

ভাসের এই মনোভাব তাঁর সমস্ত নাটকেই পরিষ্কার দেখা যায়। 'দূতবাক্য' নাটকটির এক অঙ্কের পরিসরে দেখানো হয় কৃষ্ণ শান্তি-

অভিলাষী পাণ্ডবদের দূতরূপে দুর্যোধনের কাছে এসেছেন। তাঁরা তাঁদের রাজ্য ফেরত চান। কোনো ক্ষত্রিয়ের এরকম করা অনুচিত। দুর্যোধন বিদ্রূপ ক'রে বলেন: "পরাজিত শত্রুর কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে হয়। কেউ তা ভিক্ষা করে না অথবা কেউ তা দান করে না।" (24 ছত্র)।

'কর্ণ-ভর'-এ দেবতা ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কাছে আসেন এবং কর্ণের অজেয় বর্মটি চান। সমস্ত উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণ এই ব'লে তা দান করেন যে, ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তিনি কখনও ভঙ্গ করেন নি।

'মধ্যম ব্যাযোগ' ঘটোৎকচের একজন 'মধ্যম' ব্রাহ্মণ সন্ধানের ঘটনাটি বর্ণনা করে। ঘটোৎকচের মা উপবাস ভঙ্গ করবেন ব'লে তার খাদ্যের জন্য এই ব্রাহ্মণ দরকার। বনের মধ্যে সে 'হে মধ্যম, হে মধ্যম' ব'লে চীৎকার করতে থাকে। তখন ভীম বেরিয়ে আসেন, কারণ তিনি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠা পত্নী কুন্তীর তিনপুত্রের মধ্যে মধ্যম। ঘটোৎকচের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং ঘটোৎকচ ভূপাতিত হয়, তখন তার মা এসে উপস্থিত হয় এবং ভীমকে চিনতে পেরে দু'জনকে প্রতিনিবৃত্ত করে, কারণ ভীম হলেন তার স্বামী আর ঘটোৎকচ সেই বিবাহের সন্তান। ঘটোৎকচ কেন একজন ব্রাহ্মণকে আহার করবার জন্য আনছিলেন? "দেবতাদের মধ্যেই হোক অথবা মানুষদের মধ্যে, মা এক দেবী।" (37 ছত্র)। ঘটোৎকচ হিন্দু অনুশাসনেরই পুনরাবৃত্তি করে।

'উরুভঙ্গ'-এ দুর্যোধন ভীমের দ্বারা পরাজিত হয় এবং রঙ্গমঞ্চের উপরই মারা যায়। এটা 'নাট্যশাস্ত্রে'র সমস্ত প্রথা-নিয়মের বিরোধী। শেষ একাঙ্কিকাটির অর্থাৎ 'দূতঘটোৎকচ'-এর একটি দৃশ্যে আছে

অভিমন্যুর মৃত্যুর পর ঘটোৎকচ সমগ্র কৌরব পরিবারকে বধ করবার শপথ গ্রহণ করে।

রামায়ণের কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত দুটি নাটকের মধ্যে 'প্রতিমা' আরম্ভ হয় ভরতের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি নিয়ে। ভরত রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি ফিরে আসেন ; রাজধানীতে প্রবেশ করে তিনি প্রথমে পিতৃ-পুরুষদের গৃহে যান, সেখানে মৃত পূর্ব-পুরুষদের প্রতিমা অর্থাৎ মূর্তি রক্ষিত আছে। তিনি পিতার মূর্তি দেখতে পেয়ে মর্মাহত হন এবং রামের নির্বাসন ও পিতার মৃত্যুর সংবাদ জানতে পান। নাটক শেষ হয় রাবণের নিধনে, যে-রাবণ রামের পত্নী সীতাকে হরণ করেছিল। এখানেও বৈদিক ঐতিহ্যের প্রাধান্য দেখানো হয়। যেমন, কৈকেয়ীকে যখন তাঁর পুত্র ভরত জিজ্ঞাসা করে কেন তিনি রামকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন, তখন তিনি উত্তর দেন যে, এক মুনির অভিশাপের জন্যই এ রকম হয়, কারণ "কোনো মুনির অভিশাপ এড়ানো সম্ভব ছিল না, এবং রামকে নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া তার গুরুতর পরিণাম লাঘব করা সম্ভব ছিল না (চতুর্থ অঙ্ক)। রাবণ যখন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করতে আসেন, তখন তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মণ হিসাবে তিনি মনুসংহিতা 'মহেশ্বর যোগ' ; বৃহস্পতিসূত্র, মেধাতিথির 'ন্যায়' এবং ধর্মানুষ্ঠানের 'প্রচেতস' বিধি অধ্যয়ন করেছেন! তেমনি আবার সীতা যখন নির্বাসনে রামের অনুগামী হবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করে নি, কারণ প্রত্যেকে জানত যে, "স্ত্রী হল স্বামীর সম্পত্তি" (প্রথম অঃ—25)।

'অভিষেক'-এর বিষয়বস্তু বালিবধ এবং সুগ্রীবকে তাঁর পরিবর্তে সিংহাসনে স্থাপন। বালি তাঁর ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছিলেন।

রামের উপদেশ হল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবে না।”

‘প্রতিজ্ঞা যৌগান্ধরায়ণ’ রাজা উদয়নের কাহিনী নিয়ে রচিত চার অঙ্কের নাটক। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ উদয়নকে পরাজিত ও বন্দী করেছেন। প্রদ্যোৎ তাঁর কন্যা বাসবদত্তার বিবাহ দিতে চান উদয়নের সঙ্গে। উদয়নের মন্ত্রী যৌগান্ধরায়ণ তাঁর প্রভুকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন এবং কৃতকার্যও হন। ‘স্বপ্নবাসবদত্তা’ নামক ছয় অঙ্কের অন্য নাটকটির বিষয়ও ঃঐ একই উদয়ন। বাসবদত্তার সঙ্গে বিবাহের পর উদয়ন তাঁর রাজ্যকে অবহেলা করছেন। তাঁর শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ ক’রে কিছু কিছু অংশ দখল ক’রে নিয়েছে। সুতরাং তাঁর মন্ত্রী সেই যৌগান্ধরায়ণ এক ফন্দি আঁটেন; তিনি এই গুজব ছড়িয়ে দেন যে, তিনি এবং বাসবদত্তা এক অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন। অতঃপর এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি মগধ রাজ্যের রাজকুমারী পদ্মাবতীর কাছে বাসবদত্তাকে সঙ্গিনীরূপে রেখে আসেন। তিনি বলেন বাসবদত্তা তাঁর ভগ্নী। মন্ত্রীর অভিপ্রায় হল পদ্মাবতীর সঙ্গে রাজা উদয়নের বিবাহ দেওয়া, যাতে মগধরাজ মিত্ররূপে সাহায্য করতে পারেন। বিবাহ ঠিক হয়। বিবাহের একদিন পরে রাজা পদ্মাবতীর কক্ষে শয়ন করতে যান, পদ্মাবতী অসুস্থ ব’লে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কে নিদ্রিত রয়েছে তা না জেনে বাসবদত্তা যথারীতি পদ্মাবতীকে পরিচর্যা করতে আসে এবং হঠাৎ শুনতে পায় উদয়ন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছেন: “হে বাসবদত্তা” (এ থেকেই নাটকের নাম)। বাসবদত্তা জেনে আশ্বস্ত হয় যে রাজা এখনও তাকে ভালোবাসেন। অবশেষে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পায় এবং সকলেই সুখী হয়। এই দুটি নাটকেই এমন এক সমাজ

বিদ্যমান, যার আচার, রীতিনীতি এবং কুসংস্কার এক সুপ্রতিষ্ঠিত পুরোহিত-তন্ত্রের। প্রকৃতপক্ষে, উভয় নাটকের কাহিনীই সম্ভব হয় শুধু এই কারণে যে, মন্ত্রী যৌগান্ধরায়ণ এক সিদ্ধ পুরুষের ভাগ্যগণনায় বিশ্বাস করেন।

অবশিষ্ট তিনটি নাটকের মধ্যে পঞ্চাঙ্ক 'বালচরিত'-এর বিষয়বস্তু কৃষ্ণের বাল্য-লীলা। আশ্চর্য এই যে, এ কাহিনীর বিবরণ পুরাণ-বর্ণিত বিবরণ থেকে পৃথক। যেমন, এখানে বলা হয়েছে কৃষ্ণ বাসুদেবের সপ্তম সন্তান, অষ্টম নয়। 'অবিমরক' নাটকটি এক অভিশাপগ্রস্ত রাজপুত্রের কাহিনী। এই রাজপুত্র এক রাজকুমারীকে (রাজা কুন্তীভোজের কন্যা) ভালোবাসে এবং তার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে। নাটকটিতে নায়কের বহুবিধ চমকপ্রদ কার্যকলাপের ছড়াছড়ি।

ভাস এক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে এবং তাঁর রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকরূপে স্বীকৃত। তাঁর বহু শতাব্দী পরে আর এক কবিনাট্যকার ভাস সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁর নাটকগুলির অগ্নিপরীক্ষা হ'লে 'বাসবদত্তা' অক্ষত থাকবে। নাটকের কয়েকটি নাম থেকেই বোঝা যায়, ভাসের নাটকীয় বোধ তীক্ষ্ণ ছিল। ভরতের পিতৃ-পুরুষ-গৃহ পরিদর্শন অথবা স্বপ্নের মধ্যে রাজার কথা বলার সময় বাসবদত্তার সেই কক্ষে প্রবেশ ভরতের এই নাটকীয় বোধের চমৎকার দৃষ্টান্ত। সেই রকম, সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য নাটকের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করার কৌশল অত্যন্ত উপভোগ্য। 'অবিমরক'-এ যখন রাজা কুন্তীভোজকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি উদ্বিগ্ন কিনা, তখন তিনি উত্তর দেন: "বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতার উদ্বিগ্ন হবার কারণ যথেষ্ট থাকে" (প্রথম অঙ্ক)। 'স্বপ্নবাসবদত্তা'য় (প্রথম অঙ্ক) অনূঢ়া

পদ্মাবতী একটি গোলক নিয়ে খেলা করছে। তার সঙ্গী বলে: "খেলে যাও। যতদিন তুমি অবিবাহিত আছ, ততদিন আনন্দ কর।" প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, 'প্রতিমা'য় থিয়েটার সম্বন্ধে এক কৌতূহলোদ্দীপক আলোকপাত করা হয়েছে, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। রামের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে এক নাটক প্রযোজনা করা হবে। অভিনেতাদের বলা হত 'নাটকীয়'. এই নাটকীয়দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এই "উপলক্ষ্যের উপযোগী" এক নাটক মঞ্চস্থ করে।

তিন

ভাস যদি হন নিয়মকানুনের বন্ধনমুক্ত এক স্বাভাবিক নাট্যকার, কালিদাস হলেন এক মার্জিত পরিশীলিত শিল্পী। তিনি স্বয়ং তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকে বলেছেন, তাঁর গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে "বিশেষজ্ঞেরা সন্তুষ্ট না হ'লে" তিনি নিজেকে সার্থক মনে করতে পারেন না। যে সব ব্যক্তির নিজেদের কোনো বিচার ক্ষমতা নেই এবং যারা অন্যের মতামতের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের প্রতি তাঁর সামান্যই শ্রদ্ধা। ঐতিহ্যের প্রতিকূলে দাঁড়াবার, এমন-কি, অতীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতার বিরুদ্ধতা করবার সাহস তাঁর ছিল।

কালিদাস তিনটি নাটক লিখেছেন: (১) বিক্রমোর্বশীয়, (২) মালবিকাগ্নিমিত্র, এবং (৩) অভিজ্ঞানশকুন্তলা। তিনটি

নাটকেরই বিষয়বস্তু এক রাজার প্রেমকাহিনী, যাঁর আছে এক রানী এবং একটি হারেম। দুইজন রাজা পৌরাণিক, একজন (অগ্নিমিত্র) ঐতিহাসিক ব্যক্তি। 'বিক্রমোর্বশীয়'তে একজন রানী মঞ্চে উপস্থিত হন; 'মালবিকাগ্নিমিত্র'তে আসেন দুইজন রানী; এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'য় কোনো রানী মঞ্চে আসেন না। তিনজন নায়িকার মধ্যে উর্বশী হলেন স্বর্গের নর্তকী, মালবিকা ইতিহাসের এক রাজকুমারী এবং শকুন্তলা হলেন উর্বশীর সমজাতীয়া এক মাতার কন্যা। পরিশেষে, একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত তিনটি নাটকের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী নাটকের চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে হয়। 'বিক্রমোর্বশীয়' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এ সমস্ত ঘটনা প্রাসাদ-সীমানার মধ্যে ঘটে, আর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় ঘটনাস্থল শুধু আমাদের ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত এক আশ্রম-সমন্বিত বিশাল উন্মুক্ত অরণ্যই নয়, পরন্তু মধ্য অন্তরীক্ষমণ্ডল এবং উচ্চ স্বর্গলোকও।

আগেই বলেছি, প্রথম নাটকটিতে রাজা বিক্রম এবং উর্বশীর প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পুরুরবস (বিক্রমের আদি নাম, যা বেশি ব্যবহৃত হয়) এবং উর্বশীর কাহিনী বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত এবং তা পৌরাণিক সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। সূত্রধারের ভূমিকার পর (বরং বলা যায় ভূমিকার সময়) উর্বশীর আর্ত চীৎকার শোনা যায় এবং বিক্রম প্রবেশ করেন। সেটাই প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ। চীৎকার শুনে বিক্রম উর্বশীকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যান। দানবকে পরাজিত ক'রে তিনি উর্বশীকে নিয়ে গিয়ে তাঁর রথে ওঠান। অসমান ভূমির জন্য চলন্ত রথে ঝাঁকুনি লাগে, এর ফলে বিক্রমের কাঁধ উর্বশীর কাঁধ স্পর্শ করে। এই প্রথম শারীরিক সংস্পর্শ থেকে রাজার হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হয়; উর্বশী যখন জ্ঞান

ফিরে পেয়ে রাজার দিকে প্রথম তাকায়, তখন তার ক্ষেত্রেও তাই হয়। অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটে অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাধাবিঘ্ন রানীর জন্য ঘটে না, ঘটে এই কারণে যে, উর্বশী স্বর্গলোকের অধিবাসিনী এবং ইন্দ্রসভার নর্তকী। দুইবার তাকে ইন্দ্র তলব করেন এবং দুইবারই সে নিজে থেকে ফিসে আসে। প্রথমবার সে এক প্রেমপত্র লেখে, সেটি রাজার হাতে পৌঁছয়, কিন্তু রাজার বিদূষকের অপটুতার জন্য পরে রানীর হাতে পড়ে। উর্বশীর প্রত্যাবর্তনের দ্বিতীয় উপলক্ষ্যটি তার নিজের কার্য দ্বারাই ঘটে। ইন্দ্রের সভায় এক নাটকে তার ভূমিকায় অভিনয় করার সময় উর্বশী তার সংলাপ ভুলে যায়, শুধু তাই নয়, নাটকে তার প্রেমিকের নাম 'পুরুষোত্তম'-এর জায়গায় বলে "পুরুরবস"। এ কাহিনীতে রানী স্পষ্টতই খুব মৃদুস্বভাব, সুতরাং বিক্রম ও উর্বশীর বিবাহ হয়ে যায়। শেষ প্রতিবন্ধ ঘটে যখন অতিমানবিক জাদুক্রিয়ায় উর্বশী এক লতায় রূপান্তরিত হয়। রাজা তখন তার সন্ধানে উন্মাদের মতো ঘুরে বেড়ান এবং শুধু পশুপক্ষীকে নয়, নদীপর্বতকেও জিজ্ঞাসা করতে থাকেন তারা তাঁর প্রিয়তমাকে দেখেছে কিনা। অবশেষে যখন তাঁদের পুনর্মিলন হয়, তখন একটি বালক রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। বিক্রমের ঔরসে উর্বশীর গর্ভে এই বালকের জন্ম, কিন্তু বিক্রম তা জানতেন না। নাটকের উপসংহারে রাজা তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে উর্বশীর সঙ্গে সংসার ত্যাগ করেন।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটি তিন বিষয়ে পৃথক: ১. চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক; ২. রাজা অগ্নিমিত্র এক চিত্রে রানীর সেবিকাদের মধ্যে মালবিকাকে দেখে তার প্রেমে পড়েন; ৩. রানী দু'জন,

তারা দু'জনই রাজার প্রণয়-ব্যাপার বানচাল করার জন্য সক্রিয়। আর অসাধারণ চতুর বিদূষক ঐ প্রণয় সফল করার জন্য সক্রিয়। বিদূষকই প্রথমে কৌশল ক'রে নৃত্য-শিক্ষকদের মধ্যে এক প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করে। এই ভাবে সে মালবিকাকে নর্তকীর মনোহর বেশে ও ভঙ্গিতে রাজার সামনে উপস্থিত করে। তার দ্বিতীয় দুষ্ট কৌশল হল প্রথমে রানীর পায়ে চোট লাগানোর ব্যবস্থা ক'রে নায়ক ও নায়িকাকে প্রাসাদ-উদ্যানে সম্মিলিত করা। অবশেষে যখন মালবিকাকে কড়া নজরবন্দীতে রাখা হয় তখন সে সর্পদষ্ট হওয়ার ভান ক'রে রানীর মোহরযুক্ত আংটি হস্তগত করে; এই আংটিতে শুধু যে সাপের বিষ ঝাড়াবার জাদু ছিল তাই নয়, মালবিকার কারাকক্ষে প্রবেশের ছাড়পত্রও ছিল এই আংটি। শেষ পর্যন্ত বিদূষকই অন্য সব চরিত্রকে, এমন-কি, নায়ককেও অতিক্রম ক'রে প্রধান হয়ে ওঠে এবং এই নাটককে এক অবিস্মরণীয় কমিডিতে পরিণত করে।

উপরোক্ত দুটি নাটক পাঁচ অঙ্কের, কিন্তু শেষ নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' সাত অঙ্কের। এখানে প্রেমের জন্ম অতি অদ্ভুত পরিবেশে, যথা, এক মুনির (কণ্ব) তপোবনে। রাজা দুষ্যন্ত তিনজন যুবতীকে তরুলতায় জলসেচন করতে দেখেন, এবং যদিও প্রথমে তিন যুবতীকেই তাঁর ভালো লাগে, কিন্তু ক্রমে একজনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন; সে শকুন্তলা। শকুন্তলাও তাঁর প্রেমে পড়ে, যদিও তপোবনে সরল নিষ্পাপ জীবন যাপন করার ফলে সে বুঝতে পারে না যে, যা সে অনুভব করছে তা হল প্রেম। বিদূষকের মতো বাইরের কোনো পাত্র রাজাকে সাহায্য করে না, তিনি নিজের চেষ্টাতেই নায়িকার হৃদয় জয় করেন এবং তাঁকে গন্ধর্বমতে (এক রকম

পারস্পরিক চুক্তি) বিবাহ করতে তাকে কৌশলে রাজী করান। অতঃপর তিনি তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, শীঘ্রই তিনি শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। চ'লে যাওয়ার আগে তিনি বিবাহচুক্তির নিদর্শন হিসাবে তাঁর আংটি শকুন্তলার আঙুলে পরিয়ে দেন। শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা হয়। একদিন সকালে সে যখন একমনে ভাবছিল দুষ্যন্ত কেন তাকে নিয়ে যেতে বিলম্ব করছেন, তখন দুর্বাসা মুনির আহ্বান সে শুনতে পায় না। সেই ক্ষণক্রোধী মুনি তাকে অভিশাপ দেন যে, দুষ্যন্ত তাঁর বিবাহের কথা ভুলে যাবেন এবং তাঁর স্মৃতি কিছুতেই আর জাগ্রত হবে না। শকুন্তলার সহচরীরা ঐ অভিশাপ শুনতে পায় এবং তারা তার কঠোরতা হ্রাস করতে মুনিকে অতি কষ্টে সম্মত করায়। তখন মুনি বলেন: "দুষ্যন্তকে কোনো স্মারকচিহ্ন দেখিয়ো, তা হলে দুষ্যন্তের মনে পড়বে।" আংটিটা রয়েছে ব'লে সহচরীরা আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু অবশেষে যখন শকুন্তলা দুষ্যন্তের কাছে যায়, তখন দুষ্যন্ত তাকে চিনতে পারেন না; শকুন্তলা আংটিটা দেখিয়ে তার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চায়, কিন্তু আংটি সে পায় না, দেখে আঙুলে তা নেই। সুতরাং অপরিচয়ের ব্যর্থতা নিয়ে সে তার মাতার গৃহে বাস করতে যায়। আংটিটা ঘটনাক্রমে এক হ্রদে প'ড়ে গিয়েছিল, পরে এক ধীবর সেটা এক মাছের পেটের মধ্যে পায়। চুরির অভিযোগে তাকে রাজার কাছে নিয়ে আসা হয়। যে মুহূর্তে আংটির উপর রাজা দৃষ্টিপাত করেন, অমনি তাঁর স্মৃতি ফিরে আসে; কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না শকুন্তলাকে কিভাবে এবং কোথা থেকে উদ্ধার করা যাবে। অতঃপর এক ঘটনা ঘটে, ইন্দ্র নিজের সাহায্যের জন্য দুষ্যন্তকে আমন্ত্রণ করেন। ফেরার পথে

দুষ্মন্ত মারীচ মুনির আশ্রমে থামেন। সেখানে তিনি শকুন্তলার পুত্র মারফত (তাঁরই ঔরসে ঐ বালকের জন্ম, কিন্তু তখনও তিনি তাকে চেনেন না) শকুন্তলাকে খুঁজে পান এবং তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হন।

কোনো নাটকের মহত্ত্ব তার কাহিনী দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না, এমন-কি, গুণগ্রাহী আলোচনার দ্বারাও নয়। নিজে দেখে অভিজ্ঞতার দ্বারা তা উপলব্ধি করতে হয়। তবুও এমন কতকগুলি জিনিষ থাকে যা নির্দেশ করা যায়, যাতে পাঠক অথবা দর্শকের মনোযোগ সহজে গুণগ্রহণে সমর্থ হয়। শেষ নাটকটি এক দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যায়। কাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আমরা দেখি এখানে নায়ক হলেন এক রাজা, নায়িকা এক মুনি ও এক স্বর্গ-নর্তকীর মিলনান্ত কন্যা, নায়িকার পালক পিতা হলেন আর এক মুনি, অতঃপর আছেন অভিশাপ বর্ষণে শ্রুতকীর্তি দুর্বাসা এবং সর্বশেষে আর এক মুনি মারীচ। এরূপ কাহিনী কি সাধারণ সংসারী মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্র আগ্রহের বিষয়? এবং তাও বিংশ শতাব্দীতে যখন সম্ভবত কেউ স্বর্গ বা মুনি বা অভিশাপ সম্বন্ধে বিশ্বাসী নয়? কিন্তু আশ্চর্য সত্য এই যে, নাটকটির শুধু যে এক চিরন্তন আকর্ষণ আছে তাই নয়। এক বিশ্বজনীন আবেদনও আছে। এই নাটক যে নিউইয়র্ক, লণ্ডন এবং মস্কোর মতো স্থানে অভিনীত ও সমাদৃত হয় তা থেকেই আমরা সেটা দেখতে পাই। কী কী গুণের জন্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র এই আবেদন? কালিদাস কিভাবে কাহিনীকে ক্রমবিকশিত করেছেন এবং চরিত্রগুলিকে চিত্রিত করেছেন তা যদি আমরা দেখি, তা হলে আমরা সহজে বুঝতে পারব। দুষ্মন্ত একজন রাজা, কিন্তু নাটকে তাঁকে তাঁর রাজ-কর্তৃত্বে অথবা রাজকীয় পরিবেশে প্রায়

দেখানোই হয় না। তিনি অন্য সব যুবকেরই মতো : তিনি খেলা-ধুলা (যেমন মৃগয়া) ভালোবাসেন, তিনি প্রেমে পড়েন, তিনি মিষ্টি কথা বলেন এবং তিনি সে সম্বন্ধে সব কিছু ভুলেও যেতে পারেন। যে পালক পিতা মাত্র একটি অঙ্কে মঞ্চে দেখা দেন (চতুর্থ অঙ্ক) তাঁকে মুনি হিসাবে দেখানো হয় নি, বরাবর দেখানো হয়েছে এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হিসাবে। দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য শেষ পর্যন্ত সামান্যই থাকে, কারণ আংটিটি নায়ক ও নায়িকাকে পুনর্মিলিত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁদের মিলনজাত সন্তান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সাধারণ বন্ধনস্বরূপ, সেই পুনর্মিলন ঘটায়। এটাই যুক্তিসংগত ও বাঞ্ছনীয়। এই সব চরিত্র তাদের প্রায় অতিমানবিক অবস্থা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মতোই অদৃষ্টের ক্রীড়নক। পালক পিতা তাঁর দিব্য-দৃষ্টি-বলে নাকি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারেন, অথচ নিকট ভবিষ্যতে তাঁর কন্যার জীবনে কী ঘটবে তা তিনি দেখতে পান নি। কন্যাকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি যে উপদেশ দেন, তাতে ধ'রেই নেন যে দুষ্যন্ত তাকে গ্রহণ করবেন! চরিত্রগুলি জীবন্ত, সংলাপ সজীব। এটাও নাটকের আবেদনের আর এক কারণ। পঞ্চম অঙ্কে সারদ্বত এবং শার্ঙ্গরব নামক দু'জন শিষ্যের এবং গৌতমী নামক এক বর্ষীয়সী সন্ন্যাসিনীর সমভিব্যাহারে শকুন্তলা দুষ্যন্তের কাছে আসে। এই বর্ষীয়সী মহিলা তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং শকুন্তলাকে গ্রহণ করবার জন্য দুষ্যন্তকে অনুরোধ করেন, যেহেতু প্রেমবশে দুষ্মন্ত ইতিপূর্বেই তাকে নির্বাচিত করেছেন। অতঃপর এই সংলাপ :

দুষ্মন্ত—এ আবার কি ?

শকুন্তলা—(স্বগত) এ কথাগুলি জ্বলন্ত অগ্নির মতো।

শার্ঙ্গরব—হে রাজন্, আপনি কেন এ কথা বলছেন ? সংসারের গতিপ্রকৃতি আমরা বনবাসীরা যেমন জানি, আপনি তার চেয়ে ভালো জানেন। যে যুবতীর স্বামী জীবিত, সে যদি পিতৃগৃহে বাস করে, তা হলে অন্যেরা তাকে সন্দেহ করে। সে সৎ থাকলেও সন্দেহ করা হয়। এই কারণে তার আত্মীয়স্বজন তাকে স্বামীর কাছে রেখে আসে, তার স্বামী তাকে পছন্দ করুক বা নাই করুক।

রাজা (দুষ্মন্ত)—কি ? আমি কি এই রমণীকে বিবাহ করেছি ?

শকুন্তলা—(স্বগত, বিষণ্ণভাবে) বাস্তবিক, আমার হৃদয় ঠিকই শঙ্কিত হয়েছিল।

শার্ঙ্গরব—রাজার পক্ষে কি উচিত তিনি যা করেছেন তা অস্বীকার করা, তাঁর কর্তব্য (ধর্ম) বোধের প্রতি বিমুখ হওয়া ?

রাজা—কি অন্যায় প্রশ্ন !

শার্ঙ্গরব—স্পষ্টতই, ক্ষমতামত্ত ব্যক্তিরা এইরকমই ব্যবহার করে।

রাজা—এটা ইচ্ছাকৃত অপমান।

গৌতমী—কন্যা, এক মুহূর্তের জন্য লজ্জা ত্যাগ করো। এসো, আমি তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করি। তখন তোমার পতি তোমাকে চিনতে পারবেন। (তাই করে)

রাজা—(শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে স্বগত) কি অনাহত সৌন্দর্য ! আমার কাছে তা অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হয়েছে, আর আমি সন্দেহ করছি এই রমণীকে বিবাহ করেছি কিনা। আমি শিশিরাবৃত পদ্মদ্বারা আকৃষ্ট মধুকরের মতো। আমি একে ত্যাগ করতে পারি না, আবার গ্রহণও

করতে পারি না। (দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব নিয়ে বসে থাকেন)

প্রতিহারী—ন্যায়পরায়ণতার প্রতি প্রভুর কি বিপুল শ্রদ্ধা। এমন সৌন্দর্য এত সহজে পাওয়া গেলে অন্য কেউ কি তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করত ?

শার্ঙ্গরব—হে রাজন্, আপনি এমন নীরব কেন ?

রাজা—হে তাপসগণ, আমার চেষ্টা সত্ত্বেও আমি এই রমণীর সঙ্গে আমার বিবাহ স্মরণ করতে পারছি না। তা হলে আমি কি করে এঁকে গ্রহণ করব, বিশেষত যখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এঁর যে-সন্তান জন্মাবে আমি তার পিতা কিনা ?

শার্ঙ্গরব—অতদূর যাবেন না। আপনি কি জানেন, যে-মুনি তাঁর কন্যার উপর আপনার বলাৎকার ক্ষমা করেছিলেন, আপনি তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছেন ? আপনি কি জানেন, আপনি সেই তস্করের মতো যাকে দয়াবান গৃহস্থ অপহৃত সম্পত্তিসুদ্ধ ছেড়ে দিচ্ছে ?

উদ্ধৃতি আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, কারণ নাট্যকার হিসাবে কালিদাস সম্বন্ধে ধারণা করার পক্ষে এই যথেষ্ট। উপরের অংশ থেকে বোঝা যায়, কালিদাসের চরিত্রগুলি শুধু যে নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয় তাই নয়, তারা সর্বজনীন মানবিক প্রকৃতিও রূপায়িত করে।

কালিদাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন, ব্যাপকভাবে পর্যটন করেছিলেন এবং পূর্ণভাবে জীবন যাপন করেছিলেন, যা তাঁর রচনা থেকেও আমরা বুঝতে পারি।

চার

ভাস তাঁর বিষয়-নির্বাচনে 'মহাভারত' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাভারতের নায়কেরা ভাসের নাট্যাবলীর নায়ক। কালিদাস তাঁর তিনটি নাটকের মধ্যে দু'টির বিষয় ও নায়ক সংগ্রহের জন্য পৌরাণিক সাহিত্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পরবর্তী শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ভবভূতি তিনটি নাটক লেখেন: ১. মালতী-মাধব, ২. মহাবীর চরিত, এবং ৩. উত্তর-রামচরিত। এই তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে ভারতবর্ষের অপর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রামায়ণ'-এর সমগ্র কাহিনী বিবৃত। এটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি নাটকের নামকরণে 'চরিত' (কার্যকলাপ বা জীবন কাহিনী) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণে এই শব্দটি 'নাট্যশাস্ত্র'ও ব্যবহার করেছে, কালিদাসও করেছেন। 'নাট্যশাস্ত্রে' নাটকের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, তা 'চিত্রিত করে লোক-চরিত' অর্থাৎ জগতের (মানুষের) রীতিনীতি ও কার্যকলাপ। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এ একজন নৃত্যশিক্ষক বলেন যে, "নাটকে লোকচরিত (জগতের মানুষের কার্যকলাপ) দেখা যায়, যা ত্রিগুণ দ্বারা চালিত হয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় উপনীত হয়।" ভবভূতি রামকে অভিহিত করেছেন 'লোকোত্তর' বলে, অর্থাৎ অসাধারণ মহামানব। স্পষ্টতই, রামের কার্যকলাপ প্রদর্শন করা, উপলব্ধি করা, বিশ্লেষণ করা ও

বিচার করা তাঁর এই দুটি নাটক রচনার উদ্দেশ্য ছিল। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে যখন ভবভূতি জন্মেছিলেন, তার বহুপূর্বেই সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রসার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং পণ্ডিতেরা উচ্চ সংস্কৃতকে কৃত্রিমভাবে পুষ্ট করে আঁকড়ে ছিলেন। উচ্চ সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধে একটা সমালোচনা ছিল এই যে, তা এমন এক ভাষায় লেখা, যা জনসাধারণের ভাষা নয়। পরবর্তী লেখকদের সম্বন্ধে এই সমালোচনা আরও বেশি প্রযোজ্য ছিল। বিশেষ ভাবে, ভবভূতি এমন বিদ্বান ছিলেন যে, তাঁর সংস্কৃত প্রায়শই পাঠকের নাটক উপভোগের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াত। তবুও ভবভূতিকে এক মহৎ নাট্যকার বলে মনে করা হয়। এমন-কি, ভবভূতি প্রাচীন-কালেও খ্যাতি অর্জন করেন; সাধারণত বলা হত যে 'উত্তর-রাম-চরিত'-এ ভবভূতি মহত্ত্বের শিখরে উঠেছেন ('উত্তরে-রাম-চরিতে ভবভূতির্বিশিষ্যতে')। তা হতে পারে। কিন্তু নানা ধরনের শ্রোতা ও দর্শকের সামনে অভিনীত হওয়ার জন্য নাটক লেখা হয়, এ কথা জেনেও কেন এই মহৎ নাট্যকার নাটক লিখলেন এক কৃত্রিম ও মৃত ভাষায়, কেন জনসাধারণের ভাষায় লিখলেন না?

এই সমালোচনা প্রথম আমলের ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দান, এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আমরাও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা ক'রে থাকি। ভবভূতি এবং অন্য অনেকে কেন সংস্কৃতে লিখলেন, এই প্রশ্ন ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রেখে প্রশ্ন করা যাক্, কোন্ ভাষায় ঐ লেখকেরা লিখবেন ব'লে আশা করা যেত। সোজা উত্তর হবে: "জনসাধারণের ভাষায়"। সেটা কোন্ ভাষা হবে? আমরা নিশ্চিত নই, তবে অনুমান ক'রে আমরা বলি, তা হওয়া উচিত ছিল প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু কোন্ প্রাকৃত? বিভিন্ন

অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা ছিল। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে আমরা প্রথম প্রাকৃত ব্যাকরণ পাই, তার আগে নয়। অতএব এটা নিশ্চিত যে, দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষাগুলি সৃজনধর্মী রচনার মাধ্যম হওয়ার মতো উন্নত হয় নি। কথ্য ভাষারূপে প্রচলিত আছে বলেই কোনো ভাষা সাহিত্যের বাহন হতে পারে না। একজন সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় শব্দ সংখ্যা পাঁচ শ'র বেশি হবে না। সে-ভাষা কি ক'রে ধারণা, সম্বন্ধ, সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, আবেগ এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবে? এমন-কি, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেই বা ক'জন লেখক জনসাধারণের ভাষায় লেখেন? ভারতীয়দের নিজেদের ভাষাগুলি উন্নত হবার আগে তাদের উপর ইংরিজীর কতখানি প্রভাব ছিল তার থেকেই তো এ বিষয়ে এক উপযুক্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় লিখে ভবভূতির মতো ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের ভাষার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করেছিলেন। কথ্য ভাষা থেকে বহুদূরে স'রে যাওয়ার পরও সংস্কৃতই ছিল একমাত্র ভাষা যার মারফত যথোচিত ভাব প্রকাশ সম্ভব ছিল। আর এই সংস্কৃতও ব্যবহার করত এক শ্রেণীর চরিত্রেরা। সাধারণত, নায়িকা সুদ্ধ সমস্ত স্ত্রীলোক, সমস্ত পরিচারক-পরিচারিকা, বিদূষক এবং অনুরূপ চরিত্রেরা কথা বলত কেবল প্রাকৃতে।

আগেই বলেছি, ভবভূতি তিনটি নাটক লেখেন, যাদের দুটির বিষয়বস্তু হ'ল রামের কাহিনী। তৃতীয়টির নাম 'মালতী-মাধব'; এটি রোমিও-জুলিয়েট ধাঁচের এক নাটক। নাটকটির প্রস্তাবনায় ভবভূতি শুধু যে নিজের সম্বন্ধে তথ্য দেন তাই নয়, তিনি সাধারণ ভাবে নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে নিজের নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতামতও ব্যক্ত করেন। ভবভূতি বলেন, পণ্ডিত হলেই

নাট্যকার হওয়া যায় না। নাটক লিখতে হলে বিশেষ কিছু ক্ষমতার প্রয়োজন। বিভিন্ন আবেগকে প্রকাশ করা, একদল অভিনেতা দ্বারা চিত্তাকর্ষকভাবে দেখানো যায় এমন ক্রিয়াকলাপ কল্পনা করা, সাহসিক কর্মসঞ্জাত পারস্পরিক তীব্র বাসনা প্রকাশ করা এবং মার্জিত শৈলীতে সজীব সংলাপ রচনা করা— এইসব ক্ষমতা নাট্যকারের থাকা প্রয়োজন (প্রথম অঃ-4)। নাট্যকারের প্রতিভা প্রকটিত হবে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ বাক্য এবং গভীর অর্থব্যঞ্জক শব্দনিচয়ের মধ্য দিয়ে, বেদ বা উপনিষদ বা যোগ সম্বন্ধে নাট্যকারের পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়ে নয় (প্রথম অঃ-7)। স্পষ্টতই, সমসাময়িক শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর নাটকের অনুরাগী ছিল না। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন : "তোমরা যারা আমার সমালোচনা করো, তোমরা কিছুই জানো না। আমার এই প্রয়াস তোমাদের জন্য নয়। পৃথিবী বিপুল, কাল নিরবধি। কোনো স্থানে, কোনো সময়ে, কোনো একজন জন্মাবেন যিনি আমার সমকক্ষ হবেন এবং আমার রচনার গুণগ্রহণ করবেন" (প্রথম অঃ-4)। ভবভূতি বলেন, তিনি অভিনেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

ভবভূতির এই প্রস্তাবনায় আমরা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বিকাশের একটা অধ্যায় দেখতে পাই। ভবভূতির মতো একজন বিদ্বান এবং ঐতিহ্য-আশ্রয়ী ব্রাহ্মণ যে নাটক রচনা এবং অভিনেতা সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের অভাবে তাঁর নাট্যাভিনয় ভগবান কলাপ্রিয়নাথের উৎসব ('যাত্রা') কালে মন্দির-চত্বরে নিয়ে যান, এটা আমরা এখন যাকে বলি পোষাকী বা শহুরে থিয়েটারের জনসাধারণের কাছে যাওয়া তারই নিশ্চিত লক্ষণ। 'মালতী-মাধব'-এর কাহিনী এবং দৃশ্য এমন যে তা সবিশেষ জনপ্রিয় না হয়ে পারে না।

মাধব বিদর্ভের মন্ত্রীর পুত্র, মালতী পদ্মাবতীর মন্ত্রীর কন্যা। এই দু'জন তরুণ তরুণীর পিতারা তাঁদের যুবা বয়সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, একজনের পুত্রের সঙ্গে অন্য জনের কন্যার বিবাহ দেওয়া হবে। দুই পিতার সতীর্থা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকী এই 'চুক্তি'র সাক্ষী ছিলেন। মাধব এখন পদ্মাবতীতে অধ্যয়ন করছে ; সেখানে মালতী ও কামন্দকীও আছে। দুর্ভাগ্যবশত, পদ্মাবতীর রাজার এক বয়স্ক প্রিয়পাত্র, নন্দন, মালতীকে বিবাহ করতে চায় এবং রাজা তার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকীর কৌশলে প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জন শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নাটকটিকে দশ অঙ্কে বিস্তৃত ক'রে নাট্যকার তাতে নানারকম অসাধারণ ব্যাপার ঢুকিয়েছেন। এক বাঘ ক্ষিপ্ত হয়ে যায় (রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে) এবং নায়ক তাকে বধ করে ; কাপালিক সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি মালতীকে হরণ করে এবং তাকে তাদের দেবীর কাছে বলি দিতে উদ্যত হয় ; এই দৃশ্যটি আবার শ্মশানে এক মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থাপিত ; নন্দনকে বিবাহ করার জন্য মালতীকে যখন বাধ্য করা হচ্ছিল, তখন মাধবের বন্ধু মকরন্দকে মালতীর পোষাক পরিয়ে তার জায়গায় উপস্থিত করা হয়, নকল মালতীর সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিতও হয় এবং বেচারা নন্দন নববধূর আলিঙ্গন লাভের বদলে এক বলবান যুবকের বাহুবন্ধনে পিষ্ট হওয়ার উপক্রম করে। মালতী মাধবকে ভালোবাসে, কিন্তু পিতার অনুমতি ছাড়া তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে। তার এই মনোভাবে মাধবের ধারণা হয় যে, মালতী তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে না। উপরন্তু একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণীই যে প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনকে মিলিত করবার জন্য তৎপর, এটা যেমন কৌতুকজনক তেমন অপ্রত্যাশিত।

সন্ন্যাসিনী বলেন : "তুমি যদি মাধবকে ভালোবাসো, তা হলে তুমি পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে বিবাহ করলে দোষ হয় না।" নাটকটির একমাত্র ত্রুটি হ'ল ভবভূতির কাব্যিক উৎসাহ, যার জন্যে প্রায়ই তিনি দীর্ঘ বর্ণনায় মশগুল হয়েছেন। একটা সমগ্র অঙ্ক (নবম) কালিদাসের এক উদ্দেশ্যহীন অনুকরণ।

রামের কাহিনী প্রায় সমগ্রভাবে বর্ণনা করে অন্য যে দুটি নাটক তিনি লেখেন, সে-দুটি মনে হয়, একটা পরিকল্পনা অনুসারে এবং একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়। সাত অঙ্ক বিশিষ্ট 'মহাবীর-চরিত' আরম্ভ হয় সীতার সঙ্গে রামের বিবাহে এবং শেষ হয় রাবণকে উৎসাদন করে 14 বছর নির্বাসন অন্তে রাজ্যাধিকার গ্রহণের জন্য রামের প্রত্যাবর্তনে। প্রস্তাবনায় ভবভূতি রামের এই 'চরিত' রচনার একটি কারণ দিয়েছেন : "রাম রঘুবংশের আনন্দ ছিলেন, তিনি ত্রিভুবনের আপদ উচ্ছেদে (অর্থাৎ রাবণ নিধনে) অসাধারণ বীরত্বপ্রদর্শন করেন, তিনি সমস্ত ধর্মবিরোধীদের শাস্তি দেন। আমি তাঁর সম্বন্ধে লিখছি, (কারণ) আমি তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি-কলাপের অনুরাগী।" রাম এবং রাবণের মধ্যে এক ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিরোধ আমদানী ক'রে ভবভূতি সীতা-হরণের উদ্দেশ্যটা বদ্‌লে দেন। রাবণের ভগ্নী প্রায় একজন গুপ্তচর, ভবভূতির রচনা অনুযায়ী সে গোপনে রামের প্রাসাদে প্রবেশ করে এবং রামের নির্বাসন দাবি করার জন্য কুঁজী মন্থরার মতো কৈকেয়ীকে প্ররোচিত করে। ভবভূতি বর্ণাশ্রমে এবং বর্ণাশ্রম-নির্দিষ্ট কর্মবিভাগে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং যে পরশুরাম ব্রাহ্মণ হয়েও অস্ত্রধারণ করেছিলেন, রাম তাকে পরাজিত ক'রে শিক্ষা দেন। তবে ভবভূতি রাজারাজড়াদের অবিরাম লড়াই পছন্দ করতেন না। পরশুরামকে

দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করান বীর হতে হলে নিষ্ঠুর হতেই হয় কিনা। কাহিনীর এই অংশে রামও বেশ-কিছু প্রাণনাশের জন্য দায়ী হয়েছেন। অতএব অন্য কোন্ গুণ রামকে 'লোকোত্তর' অর্থাৎ মহামানব করেছে তার আবিষ্কারে ভবভূতি অগ্রসর হন। তাঁর পরবর্তী নাটক 'উত্তর-রামচরিত'-এ তিনি তার সন্ধান পান।

রাজ্যাভিষেকের পর থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রামের উপাখ্যান এই সাত অঙ্কের নাটকটির বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা একটাই : সীতাবর্জন। এই ঘটনাই সমগ্র নাটকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। একেবারে প্রস্তাবনা থেকেই নাট্যকার এক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। সূত্রধার কৌতূহলী হয়ে ভাবেন, "রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান যদি আরম্ভ হয়ে থাকে, তা হলে রাজধানীর পথগুলি পর্যন্ত নিস্তব্ধ কেন?" অতঃপর তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপের সময় সূত্রধার প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেন যে, উত্তম ব্যবহার এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে লোকে সর্বদাই সন্দিগ্ধ। তাঁর বন্ধু শুধু যে একমত হন তাই নয়, তিনি বলেন বস্তুত লোকে সীতার সতীত্বও সন্দেহের চোখে দেখছে, যেহেতু সীতা রাবণের দ্বারা অপহৃতা হওয়ার পর কয়েক বছর তার প্রাসাদে অতিবাহিত করেছেন। আসন্ন ট্র্যাজিডি এইভাবে প্রথম ঘটনায় ছায়া ফেলে। ক্রমে তার ছায়া বিস্তৃত হয় এবং প্রথম অঙ্ক অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নিরানন্দ আবহাওয়া জমাট বাঁধে। রাম যখন সীতার চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে বলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁদের নির্বাসন-বাসের চিত্র এনে দেখান। তাতে ফল আরও খারাপ হয়, কারণ কোনো কোনো স্মৃতি কষ্ট-দায়ক। অন্তঃসত্ত্বা সীতা ক্লান্ত বোধ করেন এবং রামের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই সময় শহরের গুপ্তচর এসে সীতার

বিরুদ্ধে শহরে যে কুৎসারটনা চলছে তা রামকে জানায়। রাম কি করবেন? জনসাধারণকে উপেক্ষা ক'রে সীতার সঙ্গে থাকবেন, না রাজধর্ম অনুযায়ী জনসাধারণকে তুষ্ট করবার জন্য সীতাকে বর্জন করবেন? প্রজাদের কাছে রাজাকে পুণ্যের অবতার হতে হবে। যতদিন তারা সীতার সতীত্বে সন্দেহ করবে, ততদিন সীতার সঙ্গে বাস করলে তিনি তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবেন না। রাজা যদি অন্যায় করেন, তা হলে তাঁর রাজ্যের এবং তাঁর প্রজাদের অমঙ্গল হয়। তবু তিনি জানেন যে, সীতা নিষ্কলুষ। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তিনি সীতাকে শুচিতার আদর্শ ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে, এবং তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন, যাতে রাজার অন্যায় তাঁর রাজ্যের অমঙ্গল না ঘটায়। তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক মুহূর্ত পরেই কয়েকজন মুনির আর্ত চীৎকার শোনা যায়, লবণ দানবের অত্যাচারে তাঁরা কাতর। রাম উচ্চৈস্বরে ব'লে ওঠেন, "কি, দানবরা এখনও সক্রিয় রয়েছে!" যেন তাঁর সিদ্ধান্ত এই ধরনের অত্যাচার থেকে তাঁর প্রজাদের বাঁচাবে ব'লে তিনি আশা করেছিলেন। প্রথম অঙ্কে যেখানে রাম তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটাই নাটকীয়ভাবে সর্বোৎকৃষ্ট। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র চতুর্থ অঙ্ককে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করা হয়; ভবভূতির নাটকের এই অঙ্ক তার চেয়ে মহত্তর যদি নাও হয়, তার সমকক্ষ নিশ্চয়ই। অবশিষ্ট ছয়টি অঙ্কে রামের দুঃখ যন্ত্রণা এবং রাম সম্বন্ধে অন্যের বিচার প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অঙ্কে তিনি কর্মোপলক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যে আসতে বাধ্য হন, সেখানে তিনি নির্বাসনকালে সীতার সাহচর্যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন। প্রত্যেকটি

তৃণ এবং অরণ্যের পশুরা তাঁর মনে সেই স্মৃতি জাগ্রত করে এবং তিনি যন্ত্রণা পান। তৃতীয় অঙ্কে তাঁর ও সীতার বহুদিনের সখী বাসন্তীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়; শেষ পর্যন্ত বাসন্তীও তাঁকে দোষারোপ ক'রে বলে: "আপনি কি ক'রে এমন কাজ করতে পারলেন?" পরবর্তী অঙ্কে তাঁর শ্বশুর জনক এবং অন্য প্রবীণেরা তাঁর নিন্দা করেন। পঞ্চম অঙ্কে বালক লব রামকে তার পিতা না জেনে তাঁকে বিদ্রূপ করে। ষষ্ঠ অঙ্কে লব এবং তার ভ্রাতা কুশ রামকে বলে, বাল্মীকি তাদের যে রামায়ণ-কাহিনী শিখিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে, রাম এবং সীতা ছিলেন আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা, একজন ছিলেন অন্যজনের প্রাণবায়ুর মতো। কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বলা না হলেও এই উক্তি রামের পক্ষে এক নির্মম আঘাত। শেষ অঙ্কে, সম্ভবত নাট্যকলার প্রচলিত প্রথার খাতিরে, ভবভূতি সীতা ও দুইপুত্রের সঙ্গে রামের পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন। রামের চরিত্র ও আচরণ বিশ্লেষণে ভবভূতি ভারতীয় নাটককে খুব উঁচু স্তরে নিয়ে গেছেন। তৃতীয় অঙ্কে সীতা রঙ্গমঞ্চে আসেন, কিন্তু তাঁর রক্ষিণী তমসা ছাড়া আর কারও তিনি দৃষ্টিগোচর ন'ন বলে ধরে নেওয়া হয়। বাসন্তীর সঙ্গে বাক্যালাপে রামের মনে যন্ত্রণাকর পূর্বস্মৃতি জাগে এবং তিনি একবার অজ্ঞান হয়ে যান। সীতা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর কপালে হাত রাখেন। রাম চেতনা ফিরে পান, কার স্পর্শ তা চিনতে পারেন এবং সীতার হাত ধরেন; কিন্তু সীতা তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়িয়ে নেন। কিন্তু সেই ক্ষণিকের স্পর্শ সীতাকে রোমাঞ্চিত করে, তাঁর গণ্ডদেশ রক্তিম ক'রে তোলে; তা তমসার দৃষ্টি এড়ায় না।

সীতা—(স্বগত) আমি সংযম হারিয়ে তমসার কাছে ধরা

পড়ে গিয়েছি বলে আমার এত লজ্জা করছে। ও কি মনে করবে? ও নিশ্চয় ভাববে এটা কি বিচ্ছেদ না প্রেম।

রাম—(চারদিকে তাকিয়ে) হায়, সে তো নেই এখানে। হে বৈদেহী, তোমার কি দয়া নেই?

সীতা—আমি যদি বেঁচে থাকি আর তোমাকে এইভাবে যন্ত্রণা পেতে দিই, তা হলে নিশ্চয়ই আমি দয়াহীনা।

রাম—প্রিয়ে, কোথায় তুমি? দয়া করো। আমাকে এই অবস্থায় রেখে যেয়ো না।

সীতা—হে স্বামিন, এ কি বিপরীত কাণ্ড!

বাসন্তী—প্রভু, শান্ত হোন। আপনার অসাধারণ শক্তি দ্বারা নিজেকে সংযত করুন। দুঃখ করবেন না। নিশ্চয় আমার সখী (সীতা) এখানে নেই।

রাম—নিশ্চয় সে কোথাও নেই। নচেৎ বাসন্তীও তাকে দেখতে পেত। বোধ হয় আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমি তো নিদ্রিত নেই! না, রামের জন্য নিদ্রা ব'লে কোনো বস্তু নেই। বোধ হয় বারংবার আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবণতা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে।

(তাঁর মন বিক্ষিপ্ত করার জন্য বাসন্তী কতকগুলি স্থান দেখায় যেখানে সীতা হরণের চিহ্ন এখনও লক্ষিত হয়।)

রাম—এ বাস্তবিক এক অন্যরকম বিচ্ছেদ। সে সময় শত্রুবধ ক'রে বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো গিয়েছিল। কিন্তু এখন নীরবে যন্ত্রণা ভোগ ছাড়া কোনো প্রতিকার নেই।

সীতা—প্রথম বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ঐ মন্তব্যে আমি আত্মপ্রসাদ বোধ

করছি। কিন্তু এখন কোনো 'প্রতিকার নেই'। আমার ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে।

রাম—হে প্রিয়ে, কোথায় তুমি? সে কেমন স্থান যেখানে সুগ্রীবের সাহায্য কিংবা বানরসৈন্যের বীরত্ব কিংবা হনুমানের শূন্যমার্গ অতিক্রমণ আমার প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে না? সে স্থান পর্যন্ত পথ নির্মাণের দক্ষতা কি শ্রেষ্ঠ পূর্তবিদ্যা-বিশারদ নলের নেই? লক্ষ্মণের বাণও কি সে পর্যন্ত পৌঁছয় না?

সীতা—আমি আত্মপ্রসাদ বোধ করছি।

রাম—সখী বাসন্তী, আমার বন্ধুদের সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি তাদেরও দুঃখের কারণ হই। কতক্ষণ আমি তোমাকে কাঁদাতে থাকব? আমি এখন চলে যাই।

এ অত্যুৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকীয় সংলাপ। ভবভূতি নিঃসন্দেহে সংস্কৃত নাটককে আগের চেয়ে আরও উচ্চ স্তরে উন্নত করেন।

পাঁচ

ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতেও ভবভূতির নাটকের মতো সংস্কৃতে লেখা নাটক প্রকাশ্যে অভিনীত হত কিনা এবং হলে কোথায় হত, এটা আবিষ্কার করতে পারলে খুব আগ্রহের বিষয় হয়। ভবভূতি তিনটি নাটকেই নিজে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবান কলাপ্রিয়নাথের

মেলায় বা উৎসবে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে নাটকগুলি লেখা হয়। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা অনুসারে যদি আমরা এটা একটা প্রচার-কৌশল ব'লেও ধ'রে নিই, তবু ভবভূতিকে আমাদের বিশ্বাস করার অন্য কারণ আছে। বহুশতাব্দী পূর্ব থেকে মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ এবং পুরাণের মন্দির-আবৃত্তি সন্ধ্যাকালের এক নিয়মিত সৎকর্ম রূপে প্রচলিত হয়েছিল, এবং পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এক ধরনের সামাজিক কর্মে পরিণত হতে পারে বলে এই অনুষ্ঠান নিশ্চয় আরও উৎসাহ লাভ করেছিল। আজও ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে এরকম অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। ভাষাটা যে সংস্কৃত ছিল সেটা বাধা তো ছিলই না, বরং কার্যত একটা আকর্ষণ ছিল, কারণ সংস্কৃত ভাষা এক শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় সমস্ত নাটকেরই বিষয় ছিল ঐ দুই মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে আহৃত কাহিনী এবং পরে প্রাচীন বীরগাথা কিংবা 'কথাসরিৎসাগর'-এর মতো (যেমন ভবভূতির 'মালতী-মাধবে'র ক্ষেত্রে) জনপ্রিয় আখ্যান-সংকলন বা অনুরূপ জনপ্রিয় সাহিত্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত ঘটনাবলী। এমন-কি, আধুনিক খাঁটি গ্রাম্য নাটকে প্রধান বা 'উচ্চস্তরের' চরিত্রের সংলাপে এমন সব জমকালো সংস্কৃত বাক্য শোনা যায়, যা সাধারণ পল্লী-শ্রোতারা কেন, অভিনেতারাও নিশ্চয় বুঝতে অসমর্থ। ভবভূতি স্পষ্টতই সমসাময়িক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না; মনে হয়, তিনি তাদের বিরূপতা পরাভূত করেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রবর্তন ক'রে। পুরনো বিষয়বস্তুকে তিনি এক সমসাময়িক পটভূমি দিয়েছিলেন। দুষ্টকে দমন করতে কিংবা ছোট রাজরাজড়ার মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ নিবারণ করতে সক্ষম এমন নায়কের জন্য তাঁর

সন্ধান অথবা তাঁর বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কর্তৃক অভিভাবকদের অগ্রাহ্য করতে তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকাকে উৎসাহ দান কিংবা তাঁর নরবলি-দানে অভ্যস্ত কাপালিক চরিত্রের আমদানী— এ সবেরই নিশ্চয় কোনো বিশেষ সমকালীন তাৎপর্য ছিল।

ভবভূতির মতোই সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ আর-একজন বিবেকবান নাট্যকার হলেন বিশাখদত্ত। একটি এবং একমাত্র রাজনৈতিক নাটক রচনার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তিনি। উপরন্তু, তা এমন নাটক যাতে কোনো প্রেমের দৃশ্য তো নেই-ই, এমন-কি, মদনদেবতা এবং তাঁর ধনুঃশরেরও কোনো উল্লেখ নেই। নাটকটির নাম 'মুদ্রারাক্ষস'। রাজনৈতিক প্রশাসন সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রথম যিনি লেখেন সেই চাণক্যের পরিচালনায় চন্দ্রগুপ্ত (বিশ্রুতকীর্তি অশোকের পিতামহ) কর্তৃক মগধ সাম্রাজ্য স্থাপন এই নাটকের বিষয়। গ্রন্থের নামে 'রাক্ষস' শব্দটির অর্থ দানব নয়। নন্দবংশের যে শেষ রাজাকে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনচ্যুত করেন, তাঁর প্রতিভাশালী মন্ত্রীর নাম এটি। রাক্ষসের দক্ষতা যেমন ছিল অসাধারণ, তাঁর রাজানুগত্য ছিল তেমনই অটল। রাক্ষস যাতে তাঁর আনুগত্য চন্দ্রগুপ্তের সেবায় নিয়োজিত করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী হতে রাজী হন তার ব্যবস্থা করা ছিল চাণক্যের এক অভিপ্রায়। নাট্যকার সাত অঙ্কের এই নাটকে সেই অভিপ্রায় পূরণ করেন। গোয়েন্দা-গিরি, পাল্টা গোয়েন্দাগিরি, চতুর প্রতারণা এবং কপট কলহ এ নাটকের পাঠক বা দর্শকের আগ্রহ ও কৌতূহল অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরে ক্রমেই বাড়িয়ে চলে।

একেবারে প্রথম অঙ্কেই চাণক্যের কথার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তাঁর এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ ক'রে দেন : "যতদিন নন্দরাজারা

রাজত্ব করেছিলেন, ততদিন দেশ কোনো সময় নিরাপদ ছিল না। এখন দেশ এক রাজশাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে" (প্রথম অঃ—22)। বিশাখদত্ত এবং ভবভূতি যদি সম্পূর্ণ সমসাময়িক না হয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে ব্যবধান কয়েক বছরের বেশি ছিল না। বিশাখদত্ত ভবভূতির মতোই তাঁর সময়ের থিয়েটার সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট ছিলেন। চতুর্থ অঙ্কে (3 ছত্র) তিনি উত্তম নাটককে উত্তম কূটনীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবলম্বিত উপায় যখন অনভিপ্রেত লক্ষ্যে নিয়ে যায়, তখন তা কুকবি দ্বারা রচিত নাটকের মতোই খারাপ। 'মুদ্রারাক্ষস' চমৎকার অভিনয়যোগ্য নাটক, এবং এ নাটক আমাদের কালেও বহু নাট্যকারকে অনুপ্রাণিত করেছে। নাটকটি গতিময় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলীতে পূর্ণ, যেগুলি একটা থেকে আর-একটায় দর্শককে টেনে নিয়ে যায়। ভারতীয় থিয়েটারের ক্রমবিকাশে এ একটা বিশেষ অধ্যায়ের নিদর্শন ; এই অধ্যায়ে থিয়েটার এক পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক কর্মে পরিণত হয়েছিল।

আমরা একটি নাটকের প্রসঙ্গ এ পর্যন্ত দুই কারণে উল্লেখ করি নি: প্রথমত, আমরা জানি না কে এই নাটক লিখেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, আমরা জানি না গ্রন্থকার কোন্ সময়ের লোক। আমাদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই নাটক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম, এবং শুধু তাই নয়, সংস্কৃতে এই শ্রেণীর নাটক আর নেই। নাটকটির নাম 'মৃচ্ছকটিক' (মাটির গাড়ি)। বলা হয় শূদ্রক নামে এক পৌরাণিক নৃপতি এর রচয়িতা। নাটকের প্রধান বিষয় হল দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং অনুরূপ সংস্কৃতিসম্পন্না কিন্তু ধনী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার মধ্যে প্রেম। এ প্রেম এক পক্ষের নয়, উভয় পক্ষের ; কিন্তু দারিদ্র্যের

কারণে নায়ক উদ্যোগী হতে সমর্থ ছিলেন না, উদ্যোগী হওয়া সম্ভব ছিল বসন্তসেনার পক্ষে তার তীব্র প্রেম এবং তার বৃত্তিগত শিক্ষা উভয় কারণেই। কাহিনীর দুষ্ট চরিত্র হল রাজার নির্বোধ ও দুরাচারী শ্যালক, যে চারুদত্তের প্রতিদ্বন্দ্বী। বারাঙ্গনা তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ রমণীকে এক নির্জন স্থানে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে এমন প্রহার করে যে, সে চেতনা হারায়; সে মারা গিয়েছে ভেবে ঐ দুর্বৃত্ত আদালতে চলে যায় এবং হত্যার দায়ে চারুদত্তকে অভিযুক্ত করে। চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হয়; একেবারে শেষ মুহূর্তে বসন্তসেনা জ্ঞান ফিরে পেয়ে আদালতে ছুটে যায়। অতঃপর অপরিহার্য পরিণতি।

এই সাদামাটা কাহিনী থেকে নাটকটি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় না। এ নাটক সমাজের অন্ধকার দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত করে। যে দুর্বৃত্তদের জীবনে কোনো নোঙর নেই তাদের ইতর দিনযাপন, অভিজাত স্বৈরাচারীদের আরামের জীবন, দারিদ্র্যের অশুভ পরিণাম (যার ফলে একজন ব্রাহ্মণ পাকা চোর হয়ে যেতে বাধ্য হয়) এবং জনসাধারণের বাস্তব জীবনের এইরকম সব অন্য দিকের সঙ্গে এই নাটকে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'য় পারিবারিক সমস্যা উপস্থিত করেন, ভবভূতি বিবাহ-প্রথার সমালোচনা করেন, আর 'মৃচ্ছকটিক' প্রচলিত সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহ ক'রে আমাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। রাজনৈতিক বিদ্রোহকে ঘিরে একটি অপ্রধান আখ্যান গ্রথিত করা হয়েছে, সেটিও সার্থক হয়।

আমরা এই নাটক সম্বন্ধে যা বলছি, দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে তা পরিষ্কার হবে। দুষ্ট চরিত্রটির নাম শকর, সে তার বন্ধু বীতের

সঙ্গে তার শকটের জন্য উদ্যানে অপেক্ষা করছে, চালককে সেখানে শকট আনতে সে বলেছে। বসন্তসেনা ভুল করে এই শকটেই আরোহণ করে, সে তার ভুল সেই মুহূর্তে বুঝতে পারে না এবং অন্যেরাও তার উপস্থিতি জানতে পারে না। শকর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পায়, তখন নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়:

শকর—সখা, শকট এসে গিয়েছে।

বীত—তুমি কি করে জানলে?

শকর—তুমি কি একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ না, যেন কোনো শূকর নাসিকাধ্বনি করছে?

বীত—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, শকট এসে গিয়েছে।

শকর—(চালককে) ওহে, পুত্র স্থাবরক, তুমি এসে পৌঁছেছ?

চালক—হ্যাঁ, প্রভু, আমি এসে পৌঁছেছি।

শকর—শকটও এসে পৌঁছেছে?

চালক—হ্যাঁ, প্রভু, শকটও এসে পৌঁছেছে।

শকর—বলদরাও এসে পৌঁছেছে।

চালক—হ্যাঁ, প্রভু, বলদরাও এসে পৌঁছেছে।

শকর—তুমি নিজেও এসে পৌঁছেছ?

চালক—(হাস্য করে) হ্যাঁ, প্রভু, আমি নিজেও এসে পৌঁছেছি।

শকর—তা হলে শকট নিয়ে এসো।

চালক—কোথায় পথ?

শকর—এখানে, প্রাচীরের এই ফাটলের মধ্য দিয়ে।

চালক—প্রভু, বলদরা মারা যাবে, শকট ভেঙে যাবে এবং আমিও মরে যাব।

শকর—তুমি কি জানো না আমি রাজার শ্যালক। বলদরা যদি

মারা যায়, তা হলে আমি আর-এক জোড়া বলদ কিনব, শকট যদি ভেঙে যায়, তা হলে আমি আর-একটা শকট তৈরি করাব এবং তুমি যদি মারা যাও, তা হলে আমি আর-একজন চালক রাখব।

অবশেষে শকট উদ্যানের ভিতরে আসে, শকটের মধ্যে বসন্ত-সেনাকে দেখা যায়, শকর তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ভড়ং দেখায়, বসন্তসেনা তাকে পদাঘাত করে এবং শকর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে মনস্থ করে। সে তার বন্ধু বীতকে সেই কাজ করতে বলে, কিন্তু বীত অসম্মত হয়। তখন 'ও এক ধর্মবিশ্বাসী মূঢ় বৃদ্ধ' এই কথা ব'লে শকর শকট-চালকের দিকে ফেরে:

শকর—হে পুত্র, আমি তোমাকে সোনার বলয় দেব।

চালক—আমি তা পরব।

শকর—আমি তোমাকে সোনার আসন দেব।

চালক—আমি তার উপর বসব।

শকর—আমি তোমাকে আমার সমস্ত উচ্ছিষ্টান্ন দেব।

চালক—আমি তা খাব।

শকর—আমি তোমাকে সমস্ত ভৃত্যের সর্দার ক'রে দেব।

চালক—আমি সর্দার হব।

শকর—তা হলে আমি যা বলি তাই করো।

চালক—অন্যায় কাজ ছাড়া সবই করব।

শকর—অন্যায়ের কথা বোলো না (আক্ষরিক, অন্যায়ের কোনো গন্ধও নেই)।

চালক—বলুন তা হলে।

শকর—এই বসন্তসেনাকে হত্যা করো।

চালক—প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন। দুটি শকট নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটায় এই মহীয়সী রমণীকে এই পাপিষ্ঠ এখানে নিয়ে এসেছে।

শকর—ছাখ গোলাম, আমি কি তোর প্রভু নই?

চালক—হ্যাঁ, আপনি আমার প্রভু, কিন্তু আমার দেহের, আমার চরিত্রের নয়। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার ভয় করছে।

শকর—আমার ভৃত্য হয়ে তোর কিসের ভয়?

চালক—পরলোকের ভয়, প্রভু।

শকর—পরলোক? সেটা আবার কি?

চালক—ভালো ও মন্দ কাজের পরিণতি।

শকর—ভালো কাজের পরিণতি কি?

চালক—ধনসম্পদ ইত্যাদি, প্রভু যেমন উপভোগ করছেন।

শকর—···আর মন্দ কাজের?

চালক—আমার মতো অবস্থা, অপরের উচ্ছিষ্টান্নে বেঁচে থাকা। আমি অন্যায় কাজ করব না।

শকর—তুই বসন্তসেনাকে হত্যা করবি না? করবি না? (উৎকট স্বরে চীৎকার করতে করতে সে চালককে নির্দয় ভাবে প্রহার করে)।

দ্বিতীয় অঙ্কে একটি পথদৃশ্য আছে। তিন ব্যক্তি— জুয়াড়ী, মথুর এবং সংবাহক— সেখানে জুয়া খেলছে। শেষোক্ত ব্যক্তি হেরে গিয়েছে, কিন্তু হারের টাকা দেওয়ার সাধ্য তার নেই।

মথুর—ওরে জোচ্চোর, তুই কি জানিস না আমি হলাম বুদ্ধিমান মথুর? তুই আমাকে ঠকাতে পারবি না। তুই হেরে গিয়েছিস। আমাকে পুরো টাকা দে।

সংবাহক—কিন্তু কোথা থেকে আমি টাকা পাব?

মথুর—তোর বাবাকে বিক্রি ক'রে পয়সা দে।

সংবাহক—আমার বাবা নেই।

মথুর—তোর মাকে বিক্রি ক'রে পয়সা দে।

সংবাহক—আমার মাও নেই।

মথুর—তা হলে তোকে বিক্রি ক'রে পয়সা দে।

সংবাহক—ঠিক আছে। তা হলে আমাকে বড় রাস্তায় নিয়ে চলো।

মথুর—এসো।

অতঃপর তারা বড় রাস্তায় আসে। সংবাহক পথিকদের বলে তাকে কিনে নিতে। ইত্যবসরে আর-এক বসমায়েশ, দর্দুরক, সেখানে উপস্থিত হয়। সে মধ্যস্থতা করতে চেয়ে মথুরকে বলে:

দর্দুরক—এখন আমার কথা শোনো। তুমি ওকে আরও দশ মুদ্রা দাও। তোমার সঙ্গে ও ফের খেলবে।

মথুর—তারপর কি হবে?

দর্দুরক—ও যদি জেতে, তোমাকে টাকা দেবে।

মথুর—আর যদি না জেতে, তা হলে?

দর্দুরক—তা হলে তোমাকে টাকা দেবে না।

মথুর—এরকম কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না?…আমি কোনো কিছুকে ভর করি না। ভাগ, তুই একটা বদমাশ।

দর্দুরক—তুই কাকে বদমাশ বললি?

মথুর—তোকে।

দর্দুরক—তোর বাবা বদমাশ (সে সংবাহককে পালিয়ে যেতে ইঙ্গিত করে)।

মথুর—ওরে বেশ্যাপুত্র! তুই কি কেবল ঐ ভাবে জুয়া খেলিস?

দর্দুরক—হ্যাঁ, কেবল ঐ ভাবে।

মথুর—এই সংবাহক! আমাকে প্রথমে টাকা দে।

সংবাহক—আমি তোমাকে আজ টাকা দেব। কোনো দিন নিশ্চয় আমি তোমাকে টাকা দেব। (মথুর তাকে টানে)।

দর্দুরক—তুই ওটা অন্য জায়গায় করতে পারিস, কিন্তু আমার সামনে নয়। (অতঃপর মারামারি শুরু হয়)।

সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম আর নেই। এ জাতীয় নাটক নিয়ে কেউ বিব্রত হয়ে ভাবে না কে তার লেখক এবং কখন তা লেখা হয়েছে। চারুদত্তের আখ্যান নিশ্চয় প্রাচীন যুগ থেকে জনপ্রিয় ছিল। যে তেরোটি নাটক ভাসের রচনা ব'লে নির্দেশ করা হয়, তাদের একটির নাম 'চারুদত্ত'। তার মাত্র চারটি অঙ্ক, এবং নায়ক ও নায়িকার মিলন তাতে নেই। ভাস কি একটি অসম্পূর্ণ নাটক লিখেছিলেন? কিন্তু ঐ চারটি অঙ্ক প্রায় আক্ষরিকভাবে 'মৃচ্ছকটিক'-এর প্রথম চার অঙ্কে পাওয়া যায়। তবে ঐ অসম্পূর্ণ নাটকে জুয়াড়ীর দৃশ্যটি নেই। 'মৃচ্ছকটিক' যিনিই লিখে থাকুন কেন, তিনি যে কালিদাসের আরও নিকটবর্তী এবং কালিদাসের পরে জন্মান, এটাই বেশি সম্ভব। কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতি এবং বিশাখদত্ত সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগের প্রতিনিধি। তাঁদের হাতে থিয়েটার এক জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

এটা ঠিক যে, সংস্কৃত নাটক তাঁদের পরেও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত লেখা হতে থাকে। কিন্তু সেগুলি প্রধানত কালিদাস বা ভবভূতির অনুকরণে অথবা সাহিত্যিক কেরামতি হিসেবে লেখা হয়। মাত্র একজন আছেন যাঁর সম্বন্ধে কিছু প্রশংসার কথা বলা

যায়। তিনি হলেন সপ্তম শতাব্দীর রাজা শ্রীহর্ষ। তিনি তিনটি নাটক লেখেন : 'প্রিয়দর্শিকা', 'রত্নাবলী' এবং 'নাগানন্দ'। প্রথম দুটি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' দ্বারা প্রভাবিত, এবং এ দুটির মধ্যেও পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই শুধু চরিত্রগুলির নাম ছাড়া। শ্রীহর্ষের একমাত্র গুণ হল এই যে, তিনি তাঁর নাটকগুলিকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়যোগ্য ক'রে রচনা করেন। কিন্তু 'নাগানন্দ' সে দিক থেকেও আগ্রহোদ্দীপক নয়। গ্রন্থকারের যে নাট্য-ক্ষমতা ছিল, তা তাঁর বৌদ্ধধর্ম সমর্থনের উদ্দেশ্যের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। মনে হয়, ভবভূতিও পরবর্তী নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছেন। কারণ আমরা ক্রমেই বেশি সংখ্যায় 'রামায়ণ'-ভিত্তিক নাটক দেখতে পাই, যেমন দিঙনাগের 'কুন্দমালা', মুরারির (নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ) 'অনর্গ-রাঘব', জয়দেবের (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) 'প্রসন্ন-রাঘব', সুভট-এর (দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) 'দূতাঙ্গদ' ইত্যাদি। প্রাকৃত নাটক এমন যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় নি, যা থেকে যুক্তিসংগতভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃত নাটক সংস্কৃত নাটককে হটিয়ে দিয়েছিল। যে একটি প্রাকৃত নাটক সুপরিচিত, রাজশেখর-রচিত সেই 'কর্পূরমঞ্জরী' এত স্থূল রসিকতায় এবং এত জাদুবিদ্যাগত ও অনাটকীয় সংলাপে পূর্ণ যে তার উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া যায় না। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে, তিনি এ নাটক প্রাকৃতে লিখেছেন এই কারণে যে, প্রাকৃত ভাষা কোমল এবং সংস্কৃত কর্কশ। স্পষ্টতই তিনি কোনো নাটকীয় গুণ দাবি করতে চান নি। নাটকের অধঃপতনের প্রকৃষ্ট (অথবা নিকৃষ্ট) উদাহরণ দেখা যায় জনৈক কৃষ্ণমিশ্র যাতি রচিত 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকে। এটা কোনো নাটকই নয়, বিভিন্ন দর্শন-

মতবাদ সম্বন্ধে সংলাপের আকারে এক বক্তৃতা। এতে বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণাকে চরিত্র ক'রে ব্যক্তিসত্তা আরোপ করা হয়েছে, যেমন বিবেচনা রাজা, উপলব্ধি রানী, ঔদ্ধত্য দুর্বৃত্ত, উপনিষদ রমণী ইত্যাদি। যদি কারো সন্দেহ থেকে থাকে, তবে এই নাটকই আমাদের বলে দেয় যে, সংস্কৃত নাটক আর জীবিত নেই।

মঞ্চ এবং প্রযোজনা

এক

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'নাট্যশাস্ত্রে'র মতে নাটক মূলত এক শ্রাব্য-দৃশ্য শিল্প। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' বলেছেন যে, নাটক 'প্রয়োগ-প্রধান' অর্থাৎ অভিনীত হবার জন্য প্রধানত রচিত। সুতরাং আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে-সব সংস্কৃত নাটকের আলোচনা করেছি সেগুলি মঞ্চে প্রযোজিত হয়েছিল; নিছক পড়বার বা আবৃত্তি করবার জন্য সেগুলি রচিত হয় নি। কিভাবে সেগুলির প্রযোজনা করা হয়েছিল? রঙ্গমঞ্চ কি রকম ছিল? বিভিন্ন ধরনের ঘটনা দেখাবার জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা হত? কী ধরনের মঞ্চ-সরঞ্জাম (যদি কিছু থেকে থাকে) ব্যবহার করা হত? কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কি প্রযোজনা-পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল? প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটার সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা পেতে হলে এই সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে।

ভরত-উল্লেখিত তিন প্রকার নাট্যগৃহের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। 'নাট্যগৃহ' শব্দটি আমাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, কারণ আমরা বর্তমান কালের ছাদ-ঢাকা নাট্যগৃহে

অভ্যস্ত। দানবেরা আগেকার এক অভিনয়কালে যে ধরনের হাঙ্গামা করেছিল তার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করাই ছিল 'নাট্যগৃহ' স্থাপনের প্রধান কারণ। কিভাবে প্রতিকার করা হয়েছিল ? দেওয়াল এবং ছাদ-ওয়ালা শক্ত ঘর তৈরি ক'রে নয়। 'নাট্যশাস্ত্র'ই আমাদের বলে যে, বিভিন্ন দিকে প্রহরীরূপে বিভিন্ন দেবতাকে স্থাপন করা হয়। দেবতার মতো নিশ্চিত আশ্রয় কোন্ দেওয়ালই বা দিতে পারে ? উপরন্তু ছিল সেই ধ্বজদণ্ড যা দিয়ে দানবদের ঘায়েল করা হয়েছিল (যে কারণে তার নাম 'জর্জর' অর্থাৎ যা পিষ্ট করে)। বলা যায়, সেটাই ছিল প্রহরী-সর্দার। প্রত্যেক নাট্যপ্রযোজনার প্রারম্ভে তাঁদের আরাধনা ক'রে প্রার্থনা জানানো হত তাঁরা যেন নিজের নিজের জায়গায় থাকেন এবং তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করেন। যদি কোনো নাট্যগৃহ তার শক্ত কাঠামো দিয়ে রক্ষা করতে পারত, তা হলে এই বিশদ ধর্মানুষ্ঠানের আর প্রয়োজন হত না। প্রকৃত-পক্ষে, ভরত তাঁর দ্বিতীয় নাট্য-প্রযোজনার জন্য নাট্যগৃহের এক বর্ণনা দিয়েছেন। যে-স্থান তিনি নির্বাচন করেন, তা ছিল 'হিমালয়ের সানুদেশে, তার চারদিকে পাহাড় এবং শিখর ; স্থানটি আম্রবৃক্ষে পূর্ণ এবং উপত্যকায় নির্ঝরিণী প্রবাহিত।' (চতুর্থ পরিঃ—9)।

প্রাচীনকালে নাটক যে মুক্তাকাশের নিচে বেষ্টনীর মধ্যে অভিনীত হত, সেটা আর-এক কারণে স্পষ্ট। দিনের কোন্ সময়ে নাটক অভিনয় করা হবে, 'নাট্যশাস্ত্র' অন্যান্য জিনিষের মধ্যে তারও উল্লেখ করেছে :

> যা (নাটক) শ্রবণসুখকর এবং উত্তম আচরণের প্রশংসাত্মক,
> তা দিনের প্রথমভাগে অভিনীত হবে ;

যা মহৎ চরিত্রাবলী প্রদর্শন করে, যা ধ্বনি এবং মহৎ ও বীরত্ব ব্যঞ্জক কার্যকলাপে পূর্ণ, তা অপরাহ্ণে অভিনীত হবে ;

সংগীত নৃত্য ও বাদ্যবাদন সমন্বিত এবং প্রেমকাহিনী-বিষয়ক কৈশিকী শ্রেণীর নাটক সন্ধ্যাকালে অভিনীত হবে ;

যা চরিত্রমাহাত্ম্য-বিষয়ক এবং যাতে প্রধান আবেগ হল আর্তি, তা প্রত্যূষকালে অভিনীত হবে, এরূপ নাটক নিদ্রা বিতাড়িত করে ;

মধ্যাহ্নে বা মধ্যরাত্রিতে অথবা গোধূলির সময়ে বা নৈশাহারের সময়ে কোনো নাটক অভিনয় করা উচিত নয় (xxvii, 80-85)।

মধ্যাহ্নের তন্দ্রা এবং রাত্রির নিদ্রা সম্বন্ধে বাহ্যত এতে বিবেচনা দেখানো হয়েছে বটে, কিন্তু স্পষ্টতই আসল কারণ হল আলোর অসুবিধা। ঐ একই কারণে ছাদ ও দেওয়াল -সমন্বিত নাট্যগৃহের ব্যবহার বাদ দেওয়া হয়। মুক্তাকাশের নিচে অভিনয়ের ঐতিহ্য জনগণের থিয়েটারে বরাবর চলে এসেছে, এমন-কি, কালক্রমে যখন টর্চের আলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে তখনও। শুধু রঙ্গমঞ্চই টর্চের আলো দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে, কিন্তু শ্রোতা-দর্শকেরা বসেছে আকাশের নিচে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, নাটক প্রায় সব সময়ই অভিনীত হত, হয় মন্দির-প্রাঙ্গণে নয় প্রাসাদ-অঙ্গনে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও শ্রোতৃমণ্ডলী যে মুক্তাকাশের নিচে বসত, এটাই বেশি সম্ভব। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকে বহির্দৃশ্য কেবলমাত্র উদ্যানে স্থাপিত (ভবভূতির নাটকে শ্মশানদৃশ্য এবং শূদ্রকের নাটকে পথদৃশ্য অতি অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে)। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি

যে, প্রাসাদ-অনুষ্ঠানগুলিও মুক্তস্থানে হত। তাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ এইসব অভিনয় কোনো ঋতু-উৎসবকালে অথবা রাজার কোনো সাফল্য উপলক্ষ্যে অভিনীত হত। এই রকম বিশেষ উপলক্ষ্যের কারণে দর্শক-সমাগম নিশ্চয় খুব বিরাট হত।

দুই

নাটক অভিনয় খোলা জায়গার ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে-কোনো খোলা জায়গায় দর্শক-শ্রোতারা ব'সে পড়ত এবং অভিনয়ও সেইভাবে করা হত। 'নাট্যগৃহ নির্মাণ' দ্বারা ভরত অট্টালিকা নির্মাণ বোঝান নি, বোঝাতে চেয়েছেন অন্য কিছু। তাঁর মতে 'নির্মাণের' পূর্বে একটা উপযুক্ত জায়গা বাছতে হবে। বাছবার একটা কারণ আছে। নাটকটি কোন্ শ্রেণীর, তার উপর নির্ভর করে নাট্যগৃহের আকার ও আয়তন কেমন হবে, তা ছাড়া, শ্রোতা-দর্শকদের সুবিধার বিশেষ ব্যবস্থাও তদনুযায়ী নির্ধারিত হয়। রঙ্গমঞ্চ, উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান সমস্ত অভিনেতা, তাঁদের অভিনয় —এ সমস্তই শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যেকটি লোকের দেখতে এবং শুনতে পাওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, জায়গাটি নাটকের ঘটনাবলীর পক্ষে এক উপযুক্ত বা অনুকূল পটভূমি হওয়া চাই। তৃতীয়ত, যদি আরও বেশি শোনবার থাকে, তা হলে জায়গাটি বাইরের কোলাহল থেকে দূরে হওয়া চাই, এবং যদি আরও বেশি দেখবার থাকে, তা হলে

দিনের কোন্ সময়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে সেই অনুসারে একটা বিশেষ দিকে রঙ্গমঞ্চ সামনে রেখে শ্রোতা-দর্শকদের বসতে হবে। স্থান নির্বাচিত হওয়ার পর তা রেখা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে; তার অর্ধেকটা হবে প্রেক্ষাগৃহ ('রঙ্গমণ্ডপ') এবং বাকী অর্ধেকটা রঙ্গমঞ্চ ('রঙ্গভূমি')। ভরতের বর্ণনা অনুসারে রঙ্গমঞ্চই হল প্রস্তুত করবার এবং নির্মাণ করবার জিনিষ। আমরা কার্যক্ষেত্রে কোনো সংস্কৃত নাটকের প্রযোজনা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারি নির্মাণ-বিষয়ে ভরতের বিশদ বিবরণের তাৎপর্য কি।

যদিও 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের রচনা বেশির ভাগ সময় অপরিচ্ছন্ন, অস্পষ্ট এবং অসংগতিপূর্ণ, তবু সযত্ন .পাঠের পর তা থেকে কয়েকটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায়। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের ব্যাপারটা এত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পরিবৃত, এত অবাস্তব কল্পনায় আবৃত যে, সত্যকার কোনো বক্তব্য ছিল কিনা এই সন্দেহ আমাদের মনে প্রায়ই দেখা দেয়। তবুও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ধারণা নিশ্চিন্তে গ্রহণ করা যায়। মাপজোকে কিছু আসে যায় না, কিন্তু তা বাদ দিলে যখন অর্ধেকটা জায়গা রঙ্গমঞ্চের জন্য নির্দিষ্ট হয় তখন 'নাট্যশাস্ত্র' আমাদের বলে যে, চার কোণে চারটি খুঁটি গাড়তে হবে। এগুলি অবশ্যই কাঠের খুঁটি, যেমন গ্রাম্য 'রঙ্গমঞ্চে' হয় ব'লে আমরা জানি। এই খুঁটিগুলির সাহায্যে কাঠের তক্তা দিয়ে একটি উঁচু মঞ্চ 'নির্মাণ' করতে হবে। এই কাঠের পাটাতন-ক্ষেত্রটিও দুই অর্ধভাগে বিভক্ত। সম্মুখার্ধ অর্থাৎ যে অর্ধাংশ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটতর, তাকে বলা হত 'রঙ্গপীঠ' এবং অন্য অর্ধাংশকে বলা হত 'রঙ্গশীর্ষ' 'রঙ্গশীর্ষের' পিছনে থাকবে 'নেপথ্য-গৃহ', যার ভিতর থেকে অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে। 'নেপথ্য-গৃহে'র, দুটি 'দরজা

থাকবে, একটি দিয়ে সরাসরি সম্মুখ-মঞ্চে যাওয়া যাবে। অন্যটি দিয়ে সরাসরি পশ্চাৎ-মঞ্চে। এই দুই দরজার মধ্যে অর্কেস্ট্রার ('কুতপ') বসার জায়গা। তবে মঞ্চ যে কাঠের তক্তা দিয়েই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বলা হয়েছে যে, পশ্চাৎ-মঞ্চ প্রস্তুত করতে 'নরম কালো মাটি'ও ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু একটা বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন: দুই ক্ষেত্রের মধ্যে ভেদটা যেন স্পষ্ট হয়। আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চাৎ-মঞ্চে উপবিষ্ট চরিত্রগুলিকে শ্রোতা-দর্শকেরা যেন সম্মুখ-মঞ্চের উপর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পায়। পরিশেষে, সম্মুখ-মঞ্চকে (শ্রোতৃমণ্ডলীর) বাঁয়ে ও ডাইনে দুই দিকেই প্রসারিত করতে হবে। প্রেক্ষাগৃহ হবে ইঁটের তৈরী আসনের এবং তা হবে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতো ('সোপানাকৃতি')।

সমস্ত চরিত্র মুখে রঙ লাগাত কিনা সেটা পরিষ্কার নয় (অবশ্য অভিনেত্রীরা ব্যতিক্রম, যেহেতু সেই কালেও 'সেরা' অভিনেত্রীরা মুখে রঙের প্রলেপ দিত)। কিন্তু পোষাক ও অলংকার দিয়ে মেক-আপের প্রচলন ছিল। এটার প্রয়োজন হত, কারণ পোষাক ও অলংকারের বৈচিত্র্য থেকে চরিত্রগুলির মধ্যে জাতিবর্ণ, সামাজিক মর্যাদা, প্রদেশ ও ধর্মের পার্থক্য বুঝতে পারা যেত। কোনো দৃশ্য-সজ্জা ব্যবহার করা হত বলে মনে হয় না, কারণ 'নাট্যশাস্ত্র' বলে যে, গাছ বা পাহাড় বা ঐরকম কোনো জিনিষ যথাসম্ভব বাস্তবভাবে দেখানো একটা 'ক্লান্তিকর ব্যাপার'। তবে কাপড় বা চামড়া দিয়ে তৈরী কিছু জিনিষ ব্যবহার করা হত, এবং গৃহপালিত পশুর ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল মনে হয়। সাধারণভাবে, দৃশ্যকে অভিনয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা ছিল অভিনেতারই দায়িত্ব। "হাত প্রসারিত

ক'রে এবং হাত মাথার উপরে তুলে উঁচু পাহাড় ও গাছের আভাস দেওয়া যেতে পারে ; পতাকার ভঙ্গিতে হাত ছড়িয়ে সমুদ্র বা প্রশস্ত হ্রদ ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে" (পঞ্চবিংশ পরিঃ—76-77)। যেহেতু ভরত "পশ্চাৎ-মঞ্চে উপবিষ্ট চরিত্রদের" কথা বলেছেন, সেই হেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে, কোনো পাথর বা বাক্স বা ঐ রকম কিছু সেখানে থাকত। সেটি বোধ হয় বহুবিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য এক সরঞ্জাম ছিল। সেটি পাহাড় বা বাড়ির ছাদ বা রাজার সিংহাসন ইত্যাদি হতে পারত।

এক দৃশ্য থেকে আর-এক দৃশ্য বা এক অঙ্ক থেকে আর-এক অঙ্ক পৃথক করার জন্য পর্দার ব্যবহার আমরা এখন যে রকম বুঝি, সেই ভাবে পর্দা ব্যবহার করা হত না। এটা ঠিক যে, কোনো ঘটনার বা অনুরূপ কোনো ব্যাপারের সমাপ্তি বোঝাবার জন্য নাট্যকার তাঁর নাটককে অঙ্কবিভক্ত করতেন। কিন্তু সেটা শ্রোতৃমণ্ডলীকে একটা সরল উপায়ে দেখানো হত। দেখানো হত রঙ্গমঞ্চ থেকে সমস্ত চরিত্রের প্রস্থান দ্বারা। তবে একটা অঙ্কের সমাপ্তির পর কোনো সময়ই বিরতি হত না বা সাময়িকভাবে অভিনয় বন্ধ হত না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিনা বিরতিতে অভিনয় চলত। কিন্তু আমাদের থিয়েটার যেহেতু স্থানের ঐক্য স্বীকার করত না, সেই হেতু একই অঙ্কের মধ্যে ঘটনাস্থলের পরিবর্তন হত। শ্রোতা-দর্শকদের সেই পরিবর্তন জানাবার একটা সহজ কৌশল ছিল। পরিবর্তনটা যদি এক বহির্দৃশ্য থেকে আর এক বহির্দৃশ্যে হত, তা হলে চরিত্রগুলি রঙ্গমঞ্চে বৃত্তাকারে ঘুরে যেত, তাতেই ঘটনাস্থল বদলে যেত। আর পরিবর্তন যদি বহির্দৃশ্য থেকে অভ্যন্তর-দৃশ্যে হত, তা হলে অভ্যন্তর-দৃশ্যটা পশ্চাৎ-মঞ্চে দেখানো হত। শুধু এই পরিবর্তনের ব্যাপারেই



চিত্র ৯—ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, প্রথম আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার যিনি থিয়েটারকে এক নতুন ব্রতে দীক্ষিত করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা সফল নাটকগুলির অন্যতম হ'ল 'সত্য হরিশ্চন্দ্র'।



চিত্র ১২—মারাঠী মঞ্চের পথিকৃৎ বিষ্ণুদাস ভাবে।

পর্দা ব্যবহার করা হত, যার নাম ছিল 'আপতি' বা 'যবনিকা' বা 'তিরস্করণী'। এটা স্থায়ী পর্দা ছিল না এবং রঙ্গমঞ্চের প্রসার ও উচ্চতা আচ্ছাদন করবার মতো বড়ও ছিল না। পর্দাটি ছিল ছোট, দুইজন লোক সেটি প্রসারিত করে নিয়ে আসত এবং দুই প্রান্ত ধরে থাকত। যে চরিত্রের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের কথা, সে এই পর্দার আড়ালে দরকার মতো হেঁটে আসত বা বসে পড়ত। আজও বহু প্রকার গ্রাম্য নাট্যাভিনয়ে এই উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। দৃশ্যে অথবা মঞ্চসজ্জায় আর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। কোনো চরিত্রের একটি প্রথম কাজ ছিল নতুন দৃশ্যটির বর্ণনা দেওয়া। সে কখনও তাকে বর্ণনা করত পুষ্প ও বৃক্ষশোভিত সুন্দর উদ্যান হিসেবে, কখনও বা চমৎকার কারুকার্যময় প্রাসাদের সংগীতকক্ষ হিসেবে বা প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য যে-কোনো ভাবে। শ্রোতৃমণ্ডলী এই বর্ণনা বিশ্বাস করত এবং যতক্ষণ ঐ দৃশ্যের অভিনয় চলত, ততক্ষণ কল্পনায় দৃশ্যটা ঐখানে বসিয়ে নিত। এই উপলক্ষ্যেই নাট্যকার বর্ণনা-বিষয়ে তাঁর কবি-ক্ষমতা বা কল্পনাশক্তি চরিতার্থ করতে পারতেন। নাটক যে সমাপ্ত হল তা বোঝা যেত যখন চরিত্রগুলি আর চরিত্র না থেকে অভিনেতা হিসেবে সকলে একসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে বেরিয়ে আসত এবং প্রার্থনা ক'রে শুভকামনা জানাত। একে বলা হত 'ভরতবাক্য' অর্থাৎ অভিনেতাদের (ভরত) উক্তি, চরিত্রদের নয়।

তিন

একটা দৃষ্টান্ত দিলে পরিষ্কার হবে কিভাবে একটা অঙ্ক তার ঘটনা-স্থলের পরিবর্তনসহ সেই কালের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র পঞ্চম অঙ্কটি নেওয়া যাক। এই অঙ্কে শকুন্তলা অনুগামীদের সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রাসাদে আসে এবং সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও রাজা তাকে বিবাহ করার কথা স্মরণ করতে পারেন না, তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে বিদায় ক'রে দেন। অঙ্কটা যখন আরম্ভ হয় তখন দুষ্যন্ত ব'সে আছেন এবং তাঁর বিদূষক বন্ধু তাঁর সঙ্গে রয়েছে। দুষ্যন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট ন'ন, কারণ কয়েক মুহূর্ত পরে তাঁর কঞ্চুকী বলে রাজা এইমাত্র তাঁর সিংহাসন ('ধর্মাসন') ছেড়ে উঠে এসেছেন। যাই হোক, অঙ্কটি যেহেতু এক উপবিষ্ট চরিত্র নিয়ে আরম্ভ হয়, সেই হেতু আমরা বুঝতে পারি একটি পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে, যার আড়ালে এসে তিনি উপবেশন করেছেন এবং বিদূষকও তার নিজের স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। যে দুজন পর্দাটা ধরে ছিল, তারা অতঃপর তা সরিয়ে নেয়, তখন উপরোক্ত দৃশ্যটি উন্মোচিত হয়। রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে একটা গান শোনা যায়, যার বক্রোক্তি হল এই যে, রাজার হারেমের যে মহিলা গান গাইছেন, রাজা তাঁকে অবহেলা করছেন। মহিলাকে শান্ত করবার জন্য রাজা বিদূষককে পাঠান। একা ব'সে রাজা গানটি সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন। ঐ গান তাঁর মনে অস্বস্তি জাগায়, যেন তাঁকে কোন্ এক পূর্ব

অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কথা ব'লে দুষ্যন্ত 'বিচলিত অবস্থায় থাকেন' ('পর্যাকুলস্তিষ্ঠতি')। এই মঞ্চ-নির্দেশনা যে কালিদাসের বুদ্ধি-কৌশলের নিদর্শন তা আমরা এখনই দেখব। এখন কঞ্চুকী প্রবেশ করে। উপবিষ্ট ব'লে রাজা রয়েছেন পশ্চাৎ-মঞ্চে। ভৃত্য-চরিত্র ব'লে কঞ্চুকী প্রবেশ করে সম্মুখ-মঞ্চে। সে রাজার সন্ধানে এসেছে, সুতরাং পরিক্রমা ক'রে সে রাজার উপস্থিতি টের পায়। তার দুই ছত্রের একটি উক্তি আছে, সেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুষ্যন্তকে চুপচাপ থাকতে হবে। এই কারণে কালিদাস তাঁর কৌশল প্রয়োগ ক'রে রাজাকে 'বিচলিত অবস্থায়' বসিয়ে রাখেন। অতঃপর কঞ্চুকী কাছে আসে এবং তাঁকে জানায় যে, স্ত্রীলোকসহ কয়েকজন তাপস কণ্বমুনির (শকুন্তলার পালক পিতা) কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছে। রাজা তাঁদের সঙ্গে অগ্নিগৃহে সাক্ষাৎ করবেন বলে মনস্থ করেন এবং প্রতিহারীকে বলেন তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে। অতঃপর আর-এক পরিক্রমা, যা থেকে বোঝা যায় রাজা অগ্নিগৃহে চলেছেন। রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে রাজার মহিমা কীর্তন করে দুই বৈতালিকের গান শোনা যায়, যা শুনে রাজা বলেন তাঁর ক্লান্তি এখন দূর হল। যখন তাঁর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় হেঁটে যাওয়ার ব্যাপার, তখন তিনি সম্মুখ-মঞ্চে থাকেন। সুতরাং আবার তিনি পরিক্রমা করেন, তারপর তাঁর প্রতিহারী বলে: "এখন আমরা অগ্নিগৃহে এসেছি, এই উচ্চাসন, আপনি আরোহণ করুন।" রাজা আবার পশ্চাৎ-মঞ্চে 'আরোহণ' করেন। এই 'আরোহণ'টা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 'নাট্যশাস্ত্র' বলে যে, পশ্চাৎ-মঞ্চ সম্মুখ-মঞ্চের চেয়ে উঁচু হবে, যাতে সেখানে উপবিষ্ট চরিত্রেরা শ্রোতা-দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সব চলাচলে দুষ্যন্ত রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ না ক'রে এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যান।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, অঙ্ক আরম্ভ হওয়ার সময় তিনি যে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেই আসনেই তিনি ফিরে এসেছেন।

আসন গ্রহণ করার সময়ও দুষ্মন্ত বলেন যে, তিনি উৎকণ্ঠিত বোধ করছেন। কারণ তিনি কল্পনা করতে পারছেন না আগন্তুক তপস্বীরা কী ধরনের অমঙ্গল-বার্তা জানাবার জন্য এসেছেন। অতঃপর শকুন্তলা, দুই শিষ্য এবং বর্ষীয়সী তপস্বিনী গৌতমী প্রবেশ করেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন রাজার কঞ্চুকী এবং পুরোহিত। এই ছয়জনই প্রথম কয়েক মিনিট সম্মুখ-মঞ্চে থাকবেন যতক্ষণ না আগন্তুকদের প্রত্যেকে কিছু বলেন। আগন্তুকদের মধ্যে গৌতমীই সর্বশেষে কথা বলেন ; অতঃপর নাট্যকার আমাদের জানান, গৌতমী মঞ্চ পরিক্রমণ করলেন, অর্থাৎ দৃশ্যান্তর ঘটল। সুতরাং পুরোহিত রাজার উপস্থিতি ঘোষণা করেন, তখন সকলে পশ্চাৎ-মঞ্চে যান এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকেন যখন রাজার চূড়ান্ত অস্বীকৃতির পর দুই শিষ্য এবং গৌতমী শকুন্তলাকে রেখে ফিরে যান। শকুন্তলা তাঁদের অনুগমন করবার চেষ্টা করে, কিন্তু একজন শিষ্য তাকে নিরস্ত করে। এখন এই তিন আগন্তুক আবার সম্মুখ-মঞ্চে যাচ্ছেন ; এই সময় পুরোহিত এক সমাধানের উপায় বলেন। তিনি বলেন যে, শকুন্তলাকে আপাতত রাজার হারেমে থাকবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। 'চক্রবর্তী' (সম্রাট) পুত্র লাভ করবেন ব'লে দুষ্যন্ত বর পেয়েছেন ; যদি শকুন্তলা চক্রবর্তীর সর্বলক্ষণযুক্ত সন্তানের জন্ম দেয়, তা হলে তাকে সসম্মানে সরকারীভাবে রাজার অন্তঃপুরে গ্রহণ করা হবে। আর যদি সেরকম সন্তান তার না জন্মায় তা হলে তার আশ্রয়

তার পিতৃগৃহ, যা বেশি দূরে নয়। রাজা সম্মত হলে শকুন্তলাকে নিয়ে পুরোহিত চলে যান, অন্য তিন জনও চলে যায়। আমাদের যদিও বলা হয় নি, তবু আমরা নিশ্চয়ই কল্পনা করে নেব যে, এই দুটি দল দুই ভিন্ন দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবে, কারণ শকুন্তলাকে নিয়ে পুরোহিত যাবেন প্রাসাদের ভিতরে এবং আগন্তুক তিনজন যাবেন প্রাসাদের বাইরে।

চার

দুই দল যে দুই পথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়, আমাদের উপরোক্ত অনুমান 'নাট্যশাস্ত্র' দ্বারা সমর্থিত হয়। রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন অভিনয়-ক্ষেত্র প্রসঙ্গে 'নাট্যশাস্ত্র' আর-এক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছে। এই ব্যবস্থা 'কক্ষ' শব্দটির দ্বারা নির্দেশিত। 'নাট্যশাস্ত্র' বলেছে, অভিনেতারা মঞ্চ পরিক্রমা ক'রে একটা 'কক্ষ' স্থাপন করে। রঙ্গ-মঞ্চে যখন বিভিন্ন দল থাকে, তখন প্রত্যেক দল প্রয়োজন হলে তার নিজের 'কক্ষ' স্থাপন করতে পারে। শুধু এইটা মনে রাখতে হবে যে, "যারা প্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে তারা কক্ষের 'ভিতরে' থাকে এবং যারা পরে প্রবেশ করে তারা থাকে কক্ষের 'বাইরে'।" (ত্রয়োদশ পরিঃ—9)। এই পরি-কল্পনাটা আরও ভালো ভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রথম অঙ্কে চরিত্রদের মঞ্চ-গতিবিধি পর্যালোচনা

করি। সূত্রধার এবং তার পত্নী 'নটী'কে নিয়ে এই প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়। তাদের গৃহের এক অনুষ্ঠানে কোন্ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করা যায়, সে বিষয়ে যখন তারা আলোচনারত, সেই সময় তারা দেখতে পায় বিদূষক তাদের দিকে আসছে ; তারা তাকে আমন্ত্রণ করে। কিন্তু বিদূষক রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য থেকেই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সূত্রধার যখন আর এক ব্রাহ্মণের খোঁজে চ'লে যায় তখন বিদূষক তার প্রত্যাখ্যানের কথাই বলতে বলতে প্রবেশ করে ; সে নায়ক চারুদত্তের সন্ধানরত। বিদূষক এখন সম্মুখ-মঞ্চে। অতঃপর সে পরিক্রমা করে, যার অর্থ সে আরও অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, কারণ এইভাবে চলার অব্যবহিত পরেই সে বলে : "এই-খানে আমি চারুদত্তকে দেখছি, সে গৃহদেবতাকে নৈবেদ্য অর্পণ করছে।" যেহেতু এই রকম নৈবেদ্য গৃহের প্রবেশদ্বারে দিতে হয় এবং নৈবেদ্য তখনও দেওয়া হয় নি, সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি সে সম্মুখদ্বার-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে রয়েছে। রঙ্গমঞ্চে চারুদত্তের প্রবেশ পর্দার আশ্রয়ে হবে, কারণ সে ভিতরে রয়েছে। কিন্তু সামনের দরজায় আসার বদলে সে মঞ্চ পরিক্রমা করে, যার অর্থ সে সামনের দরজা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, অতঃপর সে বসে। তখন বিদূষক তার কাছে যায় অর্থাৎ তার সঙ্গে মঞ্চক্ষেত্রের পিছনের অংশে মিলিত হয়। কিছু সংলাপের পর চারুদত্ত তার বন্ধুকে নৈবেদ্য নিয়ে যেতে বলে, কিন্তু বিদূষক অস্বীকার করে ; শুধু তাই নয়, সে চারুদত্তকে বলে : "তুমি নিজে তা করছ না কেন ?" চারুদত্ত বলে, সে নিজে তা করবে, কিন্তু তার আগে সে খানিকক্ষণ ধ্যান করবে ('সমাধি')। সুতরাং পূর্বের দৃষ্টান্তে দুষ্মন্তের মতো চারু-দত্ত রঙ্গমঞ্চেই থাকে, কিন্তু ধ্যানমগ্ন হয় (যেমন দুষ্যন্ত উৎকণ্ঠায় হন)।

ঠিক পর মুহূর্তে বসন্তসেনা প্রবেশ করে, শকর এবং তার দুই বয়স্য বীত ও চেত বসন্তসেনাকে পিছনে তাড়া করেছে। যে সম্মুখ-মঞ্চে এই চারজন প্রবেশ করে, প্রথম কয়েক মিনিট সেটা রাস্তার একটা অংশ হয়, যেখানে বসন্তসেনার পিছনে ঐ তিনজন ধাবমান। অতঃপর বসন্তসেনা চেঁচিয়ে তার চাকরদের ডাকে, এ থেকে আমরা নিশ্চয়ই ধরে নেব সে তার বাড়িতে পৌঁছেছে। কিন্তু কেউ দরজা খোলে না ব'লে সে ফেরে এবং এখন আবার তারা রাস্তায়। এক সময় শকর বলে যে, বসন্তসেনা কিছুকাল গরীব ব্রাহ্মণ চারুদত্তকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করেছিল এবং সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি খুব কাছে বাঁ দিকে। তার এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল ঐ দিক দিয়ে বসন্তসেনার পালানো বন্ধ করা। কিন্তু বসন্তসেনা এই খবরে খুশী হয় এবং এখন সেই দিকে ঘোরে যেখানে বিদূষক গিয়ে চারুদত্তর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বেশ অন্ধকার হয়েছে, বসন্তসেনা তার অলংকার খুলে ফেলে যাতে সেগুলির আওয়াজ পেয়ে তার অনুসরণকারীরা তার কাছে না আসতে পারে। সে যতক্ষণ মল খুলছে, ফুলের হার খুলছে এবং সব সময় দেওয়াল স্পর্শ করার চেষ্টা করছে, ততক্ষণে চারুদত্তর ধ্যান শেষ হয়েছে। সে বিদূষককে নৈবেদ্য নিয়ে যেতে বলে। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা স্পর্শ ক'রে বন্ধ দরজা টের পায়। বিদূষক অত্যন্ত অনিচ্ছায় রাজী হয়, কিন্তু একজন পরিচারিকার সাহায্য চায়। সে তাকে নৈবেদ্য এবং সেইসঙ্গে প্রদীপ নিতে বলে, ততক্ষণ সে দরজা খুলবে। যে মুহূর্তে সে দরজা খোলে, বাইরে অপেক্ষমানা বসন্তসেনা প্রদীপটা নিবিয়ে দেয়। বিদূষক তখন আর একটি প্রদীপ আনবার জন্য 'ভিতরে' যায়। ইত্যবসরে

সম্মুখ-মঞ্চে শকর এবং তার সঙ্গীরা বসন্তসেনাকে খুঁজছে এবং যখন বিদূষক আলো নিয়ে ফিরে আসে তার মধ্যেই তারা চারুদত্তর বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। সেখানে বুদ্ধিহীন শকর প্রথমে পরিচারিকাকে এবং পরে বিদূষককে বসন্তসেনা ব'লে ভুল করে। শকরের পক্ষ থেকে বীত ক্ষমা চায়; তারা যখন চ'লে যায় তখন ভিতরে চারুদত্ত বসন্তসেনাকে পরিচারিকা ব'লে ভুল করেছে। পরিশেষে, বিদূষক এবং পরিচারিকা চারুদত্তকে শকরের দুষ্কর্ম জানাবার জন্য ভিতরে আসে।

এটা দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত অঙ্কটিতে বরাবর রয়েছে (১) চারুদত্তর বাড়ির ভিতরের প্রাঙ্গণ, (২) বাড়ির সামনের রাস্তা, (৩) বসন্তসেনার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা, (৪) বসন্তসেনার বাড়ি, এবং (৫) যেখান থেকেই বসন্তসেনাকে অনুসরণ করা হয়ে থাক, দৃশ্য শুরুর জন্য তার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অংশ। 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী এইগুলি পাঁচটি 'কক্ষ' এবং শ্রোতা-দর্শকদের উপলব্ধির জন্য সহযোগীরূপে নাট্যকার এবং অভিনেতাদের এইসব কক্ষ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, পশ্চাৎ-মঞ্চের পিছনে 'নেপথ্য' অংশের দুটি দরজা থাকত, একটা দিয়ে যাওয়া যেত পশ্চাৎ-মঞ্চে, অন্যটা দিয়ে সম্মুখ-মঞ্চে। দুই ভিন্ন অভিনয়-ক্ষেত্র থকে নিষ্ক্রমণের পথ হিসেবে সম্ভবত এই দুটি দরজা ব্যবহার করা হত।

পাঁচ

"যারা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ করেছে ধরে নিতে হবে তারা 'ভিতরে' আছে এবং যারা পরে প্রবেশ করে, তারা 'বাইরে'।" নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর অর্থটা ঠিক কি? বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'-এর তৃতীয় অঙ্কটি একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, এর বিষয়বস্তু হল চাণক্যের পরিচালনায় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন, কিন্তু আরও বিশেষভাবে, চাণক্য কর্তৃক মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের অনুগত করার প্রয়াস। তৃতীয় অঙ্কে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত পরস্পরের সঙ্গে এক বিবাদের ভাণ করে। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর নাগরিকদের এক পূর্ণিমা উৎসব পালনের যে আদেশ দিয়েছেন, তাই নিয়ে বিবাদ। চাণক্য এই আদেশ খারিজ ক'রে দিয়েছেন। অঙ্কের আরম্ভে রাজার কঞ্চুকী প্রবেশ করে। প্রাসাদের অলিন্দে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্য প্রাসাদ-কর্মচারীদের নির্দেশ দিতে সে এসেছে, কারণ রাজা ঐ উচ্চস্থান থেকে উৎসব-দৃশ্য উপভোগ করতে চান। কঞ্চুকীর প্রবেশ সম্মুখ-মঞ্চে, সেটা এখন প্রাসাদের কোনো অংশের প্রতীক। কঞ্চুকী আমাদের বলে যে, সে জানতে পেরেছে রাজাদেশ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে, সে নাগরিকদের সতর্ক করে, প্রাসাদ-কর্মচারীরাও তাকে আশ্বাস দেয় যে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে। এর পর রাজার প্রবেশ ঘোষণা করা হয়। সম্ভবত তিনি যথারীতি পর্দার আড়ালে পশ্চাৎ-মঞ্চে প্রবেশ করেন। এক স্বগতোক্তির পর

রাজা কঞ্চুকীকে বলেন তাঁকে অলিন্দে নিয়ে যেতে। অতঃপর কঞ্চুকী মঞ্চ পরিক্রমা ক'রে বলে, "এই যে অলিন্দ। রাজা ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।" অতঃপর রাজা আরোহণ করেন, কিন্তু নাট্যকার ব'লে দেন রাজা আরোহণের ভঙ্গি করেন। অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চের উপর উচ্চতর কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে রাজা সত্যই আরোহণ করেন। তিনি যা করেন তা হল এই: তিনি উঁচু ক'রে পা উঠিয়ে উঠিয়ে পশ্চাৎ-মঞ্চের আর-এক অংশে হেঁটে যান, সে জায়গাটা অলিন্দের প্রতীক। কারণ যে মুহূর্তে তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়ান তখনই তিনি 'চারদিক অবলোকন' ক'রে বলেন: "শরৎ ঋতুর মহিমায় চারদিকের নিসর্গ-দৃশ্য কি মনোরম দেখাচ্ছে।" সমস্ত সময়টা তিনি দাঁড়িয়েই আছেন। ক্রমে তিনি জানতে পারেন যে, চাণক্য তাঁর আদেশ খারিজ ক'রে দিয়েছেন, তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিহারীকে বলেন তিনি বসতে চান। সুতরাং একটি আসন দেওয়া হয়। রাজা উপবেশন ক'রে প্রতিহারীকে বলেন তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। কঞ্চুকী চ'লে যায়।

তারপরেই মঞ্চনির্দেশনা সম্পর্কে এই বাক্যটি আছে: 'অতঃপর চাণক্যের প্রবেশ, তিনি নিজের বাড়িতে বসে আছেন, তাঁর মুখের ভাব উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ।' এই নির্দেশনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, চাণক্যের প্রবেশ পর্দার আড়াল থেকে পশ্চাৎ-মঞ্চে। কিন্তু তারপর যা ঘটে তা থেকে একটা আগ্রহোদ্দীপক বিষয় প্রকাশ পায়। দৃশ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই চাণক্যের এক সুদীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে। অতঃপর কঞ্চুকী পূর্বের মতো সম্মুখ-মঞ্চে পুনরায় প্রবেশ করে। সে তার অবাঞ্ছিত কাজ সম্বন্ধে পদ্যে খেদ প্রকাশ করে এবং চাকরি যে বাস্তবিক কুকুর-বৃত্তির সঙ্গে তুলনীয় এই অভিমত সমর্থন করে,

তারপর সে মঞ্চপরিক্রমা ক'রে বলে : "এই যে চাণক্যের বাড়ি। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা যাক।" এই কথা ব'লে সে প্রবেশ করে অর্থাৎ পশ্চাৎ-মঞ্চে যায়। সেখানে সে চাণক্যকে দেখে, তাঁর মহত্ত্বের সবিস্তার বর্ণনা করে এবং তাঁকে প্রণাম করে। চাণক্যকে সে রাজার বার্তা দেয় এবং তিনি কোথায় আছেন জানায়; চাণক্য উঠে দাঁড়িয়ে বলেন : "আমাকে সেখানে নিয়ে চলো"; অতঃপর তাঁরা উভয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করেন। কঞ্চুকীর পরের কথা থেকে আমরা জানতে পারি তাঁরা প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সে বলে : "এই যে অলিন্দ; আপনি ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।" চাণক্যও আরোহণের গতিভঙ্গি করেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে দেখতে পান এবং তাঁর নিকটে যান।

এই সমস্তটা সময় চন্দ্রগুপ্ত কোথায় ছিলেন? তিনি কি করছিলেন? তিনি যখন প্রথম উপবিষ্ট হন, তখন আমাদের বলা হয়েছিল তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই মুহূর্ত এবং তাঁর সকাশে মন্ত্রীর উপস্থিতি, রঙ্গমঞ্চে এই দুইয়ের মধ্যে অনেকখানি সময়ের ব্যবধান। এই সময়টা সর্বক্ষণ কি তিনি সেখানে শ্রোতা-দর্শকের চোখের সামনে শুধু বসেছিলেন? স্পষ্টতই তাই ছিলেন তিনি। প্রথম প্রবেশ করেছেন ব'লে ধরে নিতে হবে তিনি 'ভিতরে' আছেন, এ কথার দ্বারা 'নাট্যশাস্ত্র' এটাই বোঝাতে চেয়েছে। চাণক্যের উপস্থিতির আগে পর্যন্ত যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছে সেই সময়টা আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না ব'লে ধ'রে নিতে হবে, কারণ তিনি 'ভিতরে' আছেন। কঞ্চুকী এবং চাণক্য যখন উপস্থিত হন, তখন আমরা তাঁদের সঙ্গে 'ভিতরে' যাই এবং এক-মাত্র তখনই আমরা চন্দ্রগুপ্তকে আবার দেখতে পাই।

ছয়

ভরতবর্ষে 1000-1500 বছর আগেও নাট্যকলার কতখানি চর্চা হয়েছিল এবং থিয়েটার কতখানি সংগঠিত হয়েছিল তার একটা ধারণা পাঠকদের দেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত সহযোগে রঙ্গমঞ্চ ও প্রযোজনা সম্পর্কে এই বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আশ্চর্য লাগে যে, গত 400-500 বছরের মধ্যে তা কোনো চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। একটা কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মুসলমানদের ভারতবর্ষ জয় এই ধ্বংসকার্যের জন্য অনেকখানি দায়ী। ইংরেজ আগমনের পূর্বে কোনো বিদেশী আধিপত্য পল্লী-জীবনের স্তর পর্যন্ত পৌঁছয় নি ব'লে এটা অনুমান করতে পারা যায় যে, গ্রাম্য থিয়েটারে ঐতিহ্যটা বজায় ছিল। তবে সমাজের সংস্কৃতিবান অংশ থেকে নেতৃত্বের অভাবে সে-ঐতিহ্যের নিশ্চয় ক্রমাবনতি ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের নৃপতিদের মতো কিছু নৃপতি শিল্পকলার জন্য প্রভূত দান করেন এবং প্রচুর উৎসাহ জোগান। কিন্তু থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রাচীন উত্তরাধিকারকে বজায় রাখা এবং অনুকরণ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। তার প্রমাণও তেমন বেশি কিছু পাওয়া যায় না।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে নাটক যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার অন্তত একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়।

‘নাট্যশাস্ত্রে’ আমাদের বলা হয় যে, ভরত মুনি ব্রহ্মাকে জানান, নাটক, বিশেষত যাতে নৃত্য ও রম্য-কাহিনী আছে সেইরকম নাটক সফল হবে না যদি না স্ত্রীলোকের ভূমিকায় স্ত্রীলোকেরাই অভিনয় করে। তিনি বলেন, “স্ত্রীলোকদের (সাহায্য) ছাড়া পুরুষদের পক্ষে ঐসব ভূমিকায় ভালো অভিনয় করা অসম্ভব।” (প্রথম পরিঃ-46)। সেই কারণে ভগবান ব্রহ্মা অপ্সরা রমণী সৃষ্টি করলেন। কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশীয়’তে আমরা জানতে পারি, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতার জন্য ভরত যে নাটক প্রযোজনা করেন তাতে উর্বশী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই প্রথা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়, যদিও মন্দিরে নর্তকী রাখা হত। নাটকের ব্যাপারে আজ পর্যন্তও ভারতীয় থিয়েটারের প্রাচীনকাল থেকে যা করা হত তা করা সম্ভব হয় নি। এটা মুসলমানদের বিজয়ের প্রত্যক্ষ পরিণাম কিনা, এই প্রশ্ন মনে জাগে। যদিও সমাজে থিয়েটার তার স্থান হারায়, কিন্তু জনগণের নাট্যপ্রতিভা এক অসাধারণ উপায়ে বেঁচে থাকে ব’লে মনে হয়। ভারতীয় থিয়েটারের রাহুগ্রাসের সময়ই ভারতবর্ষে বেশ কয়েকজন সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় চৈতন্যদেব, দক্ষিণে (কর্ণাটক) পুরন্দরদাস, উত্তরে কবির, এঁরা যে শুধু ভক্তি-গীতের সুরকার ছিলেন তাই নয়, এঁরা রচয়িতাও ছিলেন, যাঁদের গানে আমরা নাটকীয় পরিস্থিতি ছাড়াও নাটকীয় সংলাপও প্রায়ই পাই। যে-শিল্প ‘হরিকথা’ ব’লে পরিচিত, তারও সৃষ্টি সম্ভবত তাঁদেরই প্রেরণায়। এই ‘হরিকথা’য় শুধু একজন শিল্পী নানান্‌শ্রেণীর শ্রোতাদের সমাবেশে গান, বর্ণনা, স্বরবৈচিত্র্য ও অভিনয় মারফত ভক্তিমূলক কাহিনী রূপায়িত করতেন। সে যাই হোক, এটা কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, যে-সমাজ ভাস, কালিদাস, ভবভূতি

প্রভৃতির মতো নাট্যকারদের এবং 'নাট্যশাস্ত্রে'র গ্রন্থকারকে জন্ম দিয়েছিল, সেই সমাজ নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পাঁচ-ছয় শতাব্দী নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। আবার যবনিকা ওঠে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কিন্তু তখন আমরা যা দেখি তাতে মনে হয় যেন বুড়ো অভিনেতারা মঞ্চে উঠে আমতা আমতা করছে —পার্ট মুখস্থ নেই এবং এবার কী করতে হবে সে সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট নয়।

মধ্যরঙ্গ

এক

প্রাচীন ভারতীয় থিয়েটারের পর্যালোচনার অর্থই হল সংস্কৃত নাটকের পর্যালোচনা। পূর্বের পরিচ্ছদে তা দেখা গেল। সংস্কৃত নাটকের অধঃপতনকাল থেকে গত শতাব্দীতে আধুনিক নাটকের অভ্যুত্থান-কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে নাটক সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়। এ কথা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেন। কেউ কেউ এই অন্ধকারকালকে এমন নিশ্ছিদ্র মনে করেন যে, তাঁদের মতে আধুনিক ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি সম্পূর্ণত না হলেও প্রধানত পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব থেকে। মুসলমান শাসন যে এই ধারণাকে বেশ সমর্থন করে, পূর্ব পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ করেছি।

সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয় দশম শতাব্দীতেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ কথা ঠিক যে, তারপরও কিছু পণ্ডিত (তাঁরা যতটা পণ্ডিত ততটা নাট্যকার ন'ন) সংস্কৃতে নাটক লেখেন। কিন্তু সংস্কৃত বহুদিন আগে থেকেই জনসাধারণের ভাষা আর ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে তা 'অপভ্রংশ' নামে বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত উপভাষায় পরিণতি লাভ করেছিল। প্রত্যেক 'অপভ্রংশ' আধুনিক ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা হিসেবে শীঘ্রই একটা আকার নেয়, যার চূড়ান্তরূপ

আমরা পাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে। জনসাধারণের এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি তখনও সুদূর, যদিও কয়েকটিতে প্রথম সাহিত্য আত্ম-প্রকাশ করে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এর পাশে দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাগুলির অবস্থা অন্যরকম। দক্ষিণ-ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয় নি, তারা শুধু সংস্কৃত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নবম শতাব্দীতেই তাদের নিজস্ব সাহিত্য ছিল। এই অবস্থায় আমরা যখন বলি দশম থেকে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো ভারতীয় নাটক ছিল না। তখন আমরা শুধু বোঝাতে চাই যে, কোনো লিখিত নাটক ছিল না। তা থাকা সম্ভব ছিল না। একদিকে, সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাগুলি এত বিকাশ লাভ করে নি যে সেই ভাষাগুলিতে সাহিত্য রচিত হতে পারত ; অন্যদিকে দ্রাবিড় অর্থাৎ দক্ষিণী ভাষাগুলি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃত নাটক দ্বারা এত প্রভাবিত ছিল যে, তারা নিজস্ব নাটক সৃষ্টি করতে পারে নি।

তবে লিখিত নাটক না থাকার মানে এই নয় যে, থিয়েটার ছিল না। যে থিয়েটার এক হাজার বছরেরও বেশি কাল জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের এক আধার ছিল এবং শিক্ষার মাধ্যম ছিল, সেই থিয়েটার হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। বৌদ্ধধর্মের পূর্ণবিকাশকালেও, এমন-কি, যখন সম্রাট অশোক নাট্যানুষ্ঠান নিষিদ্ধ ক'রে দেন (তাঁর এক শিলালিপিতে তিনি বলেছেন 'সমাজো না কত্তবেবা' অর্থাৎ নাট্য-প্রমোদ সংগঠিত করা চলবে না), তখনও ভারতীয় থিয়েটার জীবিত ছিল এবং অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল। অতএব মুসলমান আধিপত্যের কাছে তার পরাজয় স্বীকার করার কোনো কারণ ছিল না, আর প্রথম আমলে মুসলমান আধিপত্য তো উপমহাদেশের উত্তর-মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চলের বাইরে বিস্তৃত ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে 'নাট্যশাস্ত্রে'র প্রভাবে নাট্যশিল্পীরা এক বিশেষ জাতিগত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। এমন-কি, 'নাট্যশাস্ত্র' থেকেও আমরা জানতে পারি যে, ভরতের পুত্রদের এই অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বার বার নিম্নজাতিকুলে জন্মগ্রহণ করবে। নিম্নই হোক বা উচ্চই হোক, চারণেরা দশম শতাব্দীর মধ্যেই এক বংশানুক্রমিক নাট্যশিল্পী শ্রেণীর লোক হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বিদেশী বা দেশীয় কোনো বিজেতাই জাতিবর্ণগত আনুগত্য ধ্বংস করতে সমর্থ হয় নি। প্রাচীনকালে সেটা একরকম অসম্ভবই ছিল, কারণ জাতির অর্থ ছিল একটা বংশানুক্রমিক বৃত্তি, জীবিকানির্বাহের একটা উপায়। একদিকে চারণ-জাতি এবং অন্যদিকে মহাকাব্যগুলির (প্রাচীন বীরগাথা) জনপ্রিয়তা, এই দুইয়ের সমন্বয়ে থিয়েটার স্থায়ীভাবে শিকড় গেড়েছিল।

দুই

আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পাই যে প্রায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই উনবিংশ শতাব্দীর আগে নাটক ছিল পদ্যে। সুপরিণত গদ্যশৈলীর অভাব এই পরিস্থিতির আংশিক কারণ। কিন্তু প্রধান কারণ মনে হয়, দশম শতাব্দীর মধ্যে পেশাদার চারণ-জাতির উদ্ভব। এই চারণেরা সূতদের অর্থাৎ

মহাকাব্য-যুগের ভাটদের বংশধর। তারা প্রচলিত কাহিনীগুলি আবৃত্তি করত। পরে রাজারা এবং কালক্রমে স্থানীয় অভিজাতেরা তাদের পৃষ্ঠপোষক হন। এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তাদের আবৃত্তির বিষয়গুলি সংখ্যায় বেড়ে যেত। প্রচলিত বীরগাথা ছাড়াও চারণেরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মহিমা অথবা তাঁদের পিতৃপুরুষের মহিমা (প্রায়ই কাল্পনিক) কীর্তন করত। বলতে গেলে এই চারণেরাই ছিল আমাদের থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। এ কথা পুর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। চারণ প্রথমে ছিল একক, ক্রমে সে আর দু'জনকে তার সঙ্গে নিল (তাদের বলা হত কুশ এবং লব, অর্থাৎ যে-দু'জনকে কবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ আবৃত্তির জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই দুই আদি আবৃত্তিকারকের নাম)। এই দু'জন কাহিনীর সংলাপ অংশ আবৃত্তি করত। প্রথম যুগের এই আবৃত্তি অভিনয়ের বা মঞ্চ-অনুষ্ঠানের আকার নেয় যা আমরা ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকে দেখতে পাই। তবে মূল আবৃত্তির রূপ নিশ্চয় টিঁকে ছিল, কারণ তার মধ্যে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার সর্বপ্রকার উপাদান ছিল। সাধারণ মানুষের মনে সংস্কৃত ভাষার আবেদন বা স্বীকৃতি যখন লুপ্ত হয়ে গেল, তারপরও আবৃত্তির আঙ্গিক তার পক্ষে আকর্ষণের বস্তু হয়ে রইল এবং চারণ জাতি যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তা আমাদের থিয়েটারের সমগ্র গঠনকে বদ্‌লে দিল।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হত হয় প্রাসাদ-সীমানার মধ্যে নয় মন্দির-প্রাঙ্গণে, তাও আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন রাজার আনন্দের উপলক্ষ্য বা দেবতার উৎসব। কিন্তু পেশাদার চারণের পক্ষে বিশেষ উপলক্ষ্য অথবা উৎসবের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকা কঠিন ছিল। তাকে প্রত্যেক দিনই জীবিকা

অর্জন করতে হত। সুতরাং তার কাছে প্রত্যেক দিনই হত একটা উপলক্ষ্য, অবশ্য জ্যোতিষী যদি অনুমোদন করতেন। সে কোনো শহরে বা গ্রামে যেত। সেখানে হয় জনসাধারণ নয় স্থানীয় অভিজাত তার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেন। প্রাসাদ-কক্ষ তার জুটত না, হয়তো কোনো উপযুক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণও সে পেত না। সুতরাং সে অনুষ্ঠান করত চৌরাস্তায় কোনো মঞ্চে অথবা কোনো খোলা জায়গায়। শুধু এটাই তো চিরাচরিত প্রথা থেকে এক অগ্রগতি।

কল্পনা করা যাক, চারণ জনপ্রিয় মহাকাব্য-রামায়ণের কাহিনী বর্ণনার অনুষ্ঠান করছে। রচনা সংস্কৃতে। যদিও আখ্যান শ্রোতৃ-মণ্ডলীর জানা, তবু যারা সংস্কৃত সম্বন্ধে অজ্ঞ তারা অনেক আগ্রহোদ্দীপক বিবরণ ধরতে পারবে না। চারণ শিক্ষালাভ করেছে নিজের পরিবারে এবং ধরে নেওয়া হয় সে মূল রচনা বুঝতে এবং আবৃত্তি করতে সক্ষম। কিন্তু তাকে এমন একটা পদ্ধতি ঠিক করতে হবে যার দ্বারা তার শ্রোতৃমণ্ডলী বিষয়টা বুঝতে পারবে এবং উপভোগ করতে পারবে। সুতরাং সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার যা করে সেও তাই করে। সংস্কৃত নাটকে প্রথম দৃশ্যে সূত্রধারের সঙ্গে সাধারণত এক নারী চরিত্র থাকে, যার নাম নটী। তার সঙ্গে এক সংলাপে সূত্রধার নাটকের সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে নটীকে গান গাইতে ও নাচতে অনুরোধ করে, যাতে শ্রোতৃমণ্ডলীর ঠিক মেজাজ তৈরী হয়। বিশেষ দক্ষতা-সম্পন্না এই নটীই পরবর্তীকালে চারণকে তার অনুষ্ঠানে সাহায্য করে। চারণ যখন গান করে, তখন সে নাচে এবং তার দৃষ্টি, ভাবভঙ্গি এবং চলাফেরা দিয়ে সে শুধু যে অনুষ্ঠিত কাহিনীর ক্রিয়াকলাপ রূপায়িত করে তাই নয়, চরিত্রদের অনুভূতিও

ব্যক্ত করে। এটা নিছক ভাবভঙ্গি অনুকরণ নয়, পরন্তু এক সম্পূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাখ্যা। কোনো চরিত্রের আনন্দ কয়েকটি কথায় বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু সেই আনন্দ এখানে প্রকাশ করা হবে দৃষ্টি, ভাবভঙ্গি ও নানান্ চলাফেরার মাধ্যমে। এই ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকনাট্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক সুমার্জিত ভারতনাট্যম্ নৃত্য পর্যন্ত চ'লে এসেছে। নাট্যানুষ্ঠানের এই রূপই গ্রাম্য নাটককে সারারাত্রির অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। মালায়ালাম ভাষায় একটা নাট্যরূপ আছে যাকে বলা হয় 'ওলবা পানবাকুত্তু'। এই নাট্যরূপে রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনী একচল্লিশ দিন ধ'রে দেখানো হয়। নৃত্যনাট্যের উদ্ভব ও প্রসার এমন এক দৃষ্টান্ত যার উল্লেখ ক'রে বলা যায় লিখিত নাটকের অভাবই আমাদের থিয়েটারের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে।

তিন

উপরে যে-ধরনের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়া হল, তা আর-একদিক থেকে ভারতীয় থিয়েটারের অগ্রগতির পক্ষে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এ যাবৎ প্রাসাদ-সীমানায় বা মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রোতা-দর্শকদের দেখানো হত শুধু ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক। মন্দির-প্রাঙ্গণের নাট্যাভিনয় ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। এটা ঠিক যে, ভরতের মতানুযায়ী নাটক হ'ল যুগপৎ শিক্ষা এবং চিত্তবিনোদন। কিন্তু নাটককে সমস্ত জাতিবর্ণের

অধিগম্য পঞ্চম বেদ করার যে সঙ্কল্প ভরত করেছিলেন, তা সত্ত্বেও এটা প্রত্যাশা করা যেত না যে অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে সংস্কৃত নাটক শিক্ষার উৎস হবে। স্পষ্টতই, এই মানুষদের কাছে থিয়েটার ছিল সম্পূর্ণরূপে চিত্তবিনোদনের উপায়। উপরে যে-ধরনের নৃত্য-অনুষ্ঠান বর্ণিত হল, সেটাই অশিক্ষিতদের কাছে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বস্তুকে এমন এক আকারে নিয়ে এসেছিল যার মারফত তারা তার অর্থ উপলব্ধি করতেও সমর্থ হত মনে হয়। এই চারণেরা (যাদের নাটকে বলা হয় 'সূত্রধার', কোনো কোনো পল্লী-নাটকে বলা হয় 'ভাগবত' এবং নৃত্য-নাট্যে বলা হয় 'নাট্টুবর') অশিক্ষিত মনে মহাকাব্যের কাহিনী সম্বন্ধে এক অকৃত্রিম আগ্রহ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পল্লী-মঞ্চ যে বিকাশ লাভ করেছিল, এই ঘটনাই তার মূলে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

চারণ প্রতিষ্ঠান আর-একটি পরিণতির জন্যও দায়ী, যার ফলে থিয়েটার জীবিত থাকতে তো পারেই, উপরন্তু তার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, এমন-কি, নিশ্চয়তাও সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে রাজারা এবং অভিজাতেরা ভাটদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটেরা অথবা হর্ষের মতো যে রাজা কালিদাস ও বাণ প্রভৃতি কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি রাজকীয় আনুকূল্য দ্বারা কবি-ভাটদের উৎসাহ দিতেন কিনা সন্দেহ। হর্ষের পরে দশম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। ভাটদের খুব সৌভাগ্য যে, রাজার কোনো অভাব ছিল না। খ্যাতনামা কোনো ভাটের পক্ষে এমন একজন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল যিনি চাইতেন তাঁকে পৌরাণিক বীর-নায়কদের মহিমান্বিত বংশধর-রূপে গানের মধ্যে বন্দনা করা হোক। আরও সৌভাগ্যের বিষয়,

এই রাজাদের কেউ কেউ যথার্থই শিল্প-অনুরাগী ছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, দশম শতাব্দীতে চোল রাজা রাজেশ্বরের এক শিলালেখ থেকে আমরা 'রাজা রাজেশ্বর নাড়গম' নামক এক নাট্যাভিনয়ের কথা জানতে পারি। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার কথা, কোন্ ব্যক্তি তা প্রযোজনা করেছিল এবং তাতে অভিনয় করেছিল, বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের কথা— এই সব তথ্য ঐ শিলালেখ থেকে আমরা পাই। কখনও কখনও মন্দিরগাত্রে ভাস্করদের খোদাই করা অভিনয়-দৃশ্য, সংগীতজ্ঞ এবং তাঁদের বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যভঙ্গিমা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। চারণেরা যে নটী বা নর্তকীকে উপস্থিত করেছিল, সে কখনও কখনও এক অদ্ভুত ধরনের আনুকূল্য লাভ করত, যেমন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আমলে আমরা দেখতে পাই। একজন উৎকৃষ্ট নর্তকীকে তার শিক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য প্রায়ই রাজার অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া হত। এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, রাজার তার দেহের উপর অধিকার থাকত। রাজার আশ্রয় ছিল তার শিল্পের পক্ষে পার্থিব সমস্যার দ্বারা ব্যাহত না হয়ে অগ্রগতির একমাত্র উপায়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে নাট্যশিল্পের অধোগতি ঘটত, অথবা তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হত।

ভারতীয় থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা আর-একভাবে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। উপরে বর্ণিত নৃত্যনাট্য ততটা নৃত্য অথবা নাট্য ছিল না যতটা ছিল অপরিচিতকে পরিচিত করবার এক সহজ মাধ্যম। এটা যদি নীরব ভাবভঙ্গি-চলাফেরার মধ্য দিয়ে সফলভাবে করা গিয়ে থাকে, তা হলে জনসাধারণের নিজেদের ভাষার মারফত করা আরও কত সহজ হবে? নতুন মাধ্যমের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা চারণদের ছিল। তারা যে

নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করেছিল, তা ছাড়াও সংস্কৃত নাটকও জনসাধারণের বোধগম্য ক'রে উপস্থিত করা সম্ভব ছিল। সেই দ্বাদশ শতাব্দীতেও আমরা দেখি বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁর সভাকবি জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' প্রযোজনায় পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এটা এক নতুন ব্যাপার। 'গীতগোবিন্দ' নাটকীয় সংলাপ-সম্বলিত বীর-গাথা ছিল না। তা কৃষ্ণ ও রাধার অসামান্য প্রেম, বিরহ ও মিলনের কাহিনী। তাতে রয়েছেন কথক, রাধার সখী যিনি পরস্পরের বার্তা পৌঁছে দেন এবং রয়েছে সুরেলা আবৃত্তি। নৃত্য এবং ভঙ্গি (মুদ্রা) দিয়ে বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করা এবং অনেক বর্ণনা যৌথ সংগীতে রূপায়িত করা সম্ভব ছিল! চারণ-আঙ্গিক এখন ধ্রুপদী পদ্ধতিতে এক ধ্রুপদী বিষয়বস্তুতে প্রয়োগ করা হ'ল।

অন্য কয়েকজন রাজা যে অন্য-এক আঙ্গিক উদ্ভাবনে সহায়তা করেন তারও দৃষ্টান্ত আমরা পাই। যোধপুরের রাজা সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' অনুবাদ করেন। এটাই হিন্দিতে প্রথম নাটক ব'লে মনে করা হয়। বোধ হয় এই অনুবাদেরই পরিণামে এ নাটকের পাঞ্জাবী অনুবাদ হয় (1789 খ্রীস্টাব্দ)। এমন-কি, তার অনেক আগেই (চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দী) এই একই নাটক দুইজন সভাকবি তেলুগু ভাষায় অনুবাদ করেন। প্রায় ঐ একই সময়ে উড়িষ্যায় রাজা প্রতাপরুদ্র সংস্কৃত নাটক 'বেণী সংহারম্' ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি নাটককে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা হয় সাধারণ মানুষের স্বতন্ত্র ভাষার মারফত, নয় ভাবভঙ্গির সর্বজনীন ভাষার মারফত।

চার

যদিও রাজনৈতিকভাবে অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী ছিল ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের কাল, তবু আশ্চর্যের বিষয় সমগ্র দেশ তখন এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের বলিষ্ঠ চেতনায় স্পন্দিত হচ্ছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা হর্ষ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, এই সঙ্গেই বৌদ্ধ-ধর্ম শেষ বিদায় নেয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দী তা এতটা সক্রিয় ছিল যে তার প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আচার-অনুষ্ঠানের বৈদিক ঐতিহ্যের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শঙ্করাচার্য। তিনি জীবন সম্বন্ধে এবং পৃথিবীতে মানবিক অস্তিত্বের লক্ষ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এক বেগবান নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চার করেন। যে-অদ্বৈতবাদ তিনি প্রচার করেন, তার দার্শনিক রূপ যাই হোক, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে একমাত্র সর্বজনীন সত্তা বা ঈশ্বর বিদ্যমান এই কথা ঘোষণা ক'রে তিনি ব্যক্তির মনে এক আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেন। তাঁর মায়াবাদ অন্তত প্রথম দিকে ব্যক্তিকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন ক'রে তোলে নি, বরং কার্যত তাকে পরমের জন্য প্রয়াসী হতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর ধর্মোপদেশের এই দিকটা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধ'রে ভক্তিবাদকে অনুপ্রাণিত করে এবং সমগ্র উপমহাদেশ— দক্ষিণে



১৩—ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে সূত্রধার। এই সুপ্রাচীন চরিত্রটি চমৎকার অভিনেতা এবং প্রযোজক-কর্মাধ্যক্ষও বটে। উপরের ছবিতে কিরলোসকর নাটকমণ্ডলীর তিনজন সূত্রধারকে দেখা যাচ্ছে।



চিত্র ১৬—নৃত্যনাট্য 'শ্রম ও যন্ত্র'-এ উদয়শংকর। এ নৃত্যনাট্য ১৯৩৯ সালে তাঁরই প
চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাসবেশ্বর থেকে উত্তরে কবির পর্যন্ত— সাধুসন্তদের গীত এবং উপদেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। প্রায় প্রত্যেক ভাষাগত অঞ্চলে যে সেই চার-পাঁচ শতাব্দী ধ'রে বহু সাধুসন্তের আবির্ভাব হয়েছিল তা নেহাৎ আপাতিক যোগাযোগ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু।

ভক্তিবাদ এবং শৈব ও বৈষ্ণব ধারার অভ্যুদয় থিয়েটারকে দুই ভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন রাজাকে তা মন্দির-নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মন্দিরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার অর্থ শুধু 'রঙ্গালয়ের' ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নয়, তার অর্থ নৃত্য ও নাট্য-শিল্পকে প্রত্যক্ষ উৎসাহ দান। অনেক ক্ষেত্রে শুধু নর্তকীদের নয়, সূত্রধারদেরও এই সব মন্দিরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত করা হত; তাদের কাজ ছিল নৃত্য এবং নাট্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। সেই সময়কার প্রত্যেকটি স্থাপত্য-কর্ম নাট্যশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। একটি সম্পূর্ণ নাট্য অনুষ্ঠানকে সমস্ত খুঁটিনাটি সুদ্ধ মন্দির-গাত্রে খোদাই করায় তার নিদর্শন। প্রায়ই স্বয়ং রাজা (নৃত্য) নাটক রচনা করতেন এমন-কি, নাট্যানুষ্ঠানিক পরিকল্পনাও করতেন। প্রাচীনকালের মতো মন্দির-প্রাঙ্গণ আবার নাট্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। চারণ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে ভ্রাম্যমাণ অভিনেতাদলের সৃষ্টি হয়েছিল; এই সব দল বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেবতাকে নাট্যানুষ্ঠানের রূপে তাদের 'অর্ঘ্য' দিতে পারত। তা ছাড়া, এ-সব অনুষ্ঠান এমন ভাষায় হত যা জনসাধারণের বোধগম্য।

ভক্তিবাদের পুনরুত্থানই প্রধানত এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূলে।

'ভক্তরা' (সন্ত) গান গেয়ে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরাসরি জনসাধারণকে অবগত করাতেন এবং স্বভাবতই তাঁরা জনসাধারণের ভাষাতেই তা করতেন। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে, অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যের সূত্রপাত হয় এই সব সন্তদের গীত ও উপদেশেই। 'ভক্ত' শুধু গান গাইতেন না, উল্লসিত আবেশে নৃত্যও করতেন। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৃত্য ও গীত পরিণত হয় গোষ্ঠী-নৃত্যে ও গোষ্ঠী-গীতে। কী বিষয়ে গান গাইতেন তিনি? প্রধানত কোনো দেবতার জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত 'ভাগবৎ' মহাকাব্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস ছিল। সন্ত তথা ব্যক্তি এবং ভগবানের মধ্যে কোনো মধ্যস্থ আর থাকল না, যার ফলে প্রায়ই গীত রূপান্তরিত হত সংলাপে। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর মতো সন্তদের রচনাতেও আমরা বার বার পাই রাধা (ব্যক্তিসত্তা) এবং কৃষ্ণের (বিশ্বজনীন দেবতা) মধ্যে কথোপকথন। যদি এই রকম গীত চারণদের উপযুক্ত উপকরণ জুগিয়ে থাকে, তা হলে সেটা আশ্চর্যের নয়। একটা দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এইরকম গীতের নাটকীয় গুণ সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারব। পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ত পুরন্দর দাস কর্ণাটক অঞ্চলে বাস করতেন এবং গান গাইতেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতে এক জনপ্রিয় সন্ত। তিনি কানাড়া ভাষায় তাঁর গানগুলি রচনা করেন। আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল। এটি আরম্ভ হয় বিবরণে এবং পরিণত হয় সংলাপে।

গোকুলে এক গোপিনী দুধ ফেরি করছিল। সে সুচারু ভঙ্গিতে দুধের কলস মাথায় নিয়ে চলেছিল। লাবণ্যবতী

মেয়েটি বলছিল : "কে নেবে দুধ ? যে কিনতে চায় তাকেই আমি বিক্রি করব।"

মেয়েটি প্রাণোচ্ছল এবং বুদ্ধিমতী। তার গায়ের রং সোনালি। তার পরনে ছিল সাদা পোষাক। তার কালো চুল সে তেল দিয়ে মসৃণ করেছিল, আঁখিপক্ষ কাজল দিয়ে করেছিল কালো। তার দাঁতগুলি ক্ষুদ্র ও সুন্দর, তার চলার ঠমক রাজহংসীর মতো ; বেশ আত্মসচেতনভাবে পা ফেলে সে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলছিল।

বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর কপালের মাঝখানে আঁকা ছিল একটি ক্ষুদ্র তিলক এবং তাঁর হাতে ছিল মুক্তাখচিত একটি বাঁশি। গোপিনীকে দেখতে পেয়ে তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।

এবং তিনি বললেন : "কে তোমাকে নগরের মধ্যে আসতে দিল ? শুল্ক দাও, তারপর অগ্রসর হও। সাবধান, তুমি যদি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করো, তা হলে আমি তোমার পীনোন্নত বক্ষে আঘাত করব।

গোপিনী গর্জে উঠল : "আমাকে আঘাত করবার তুমি কে ? আমাকে তুমি কী মনে করেছ ? আমি রানীর কাছে নালিশ করব এবং তোমাকে যাতে শিকল দিয়ে বাঁধা হয় তার ব্যবস্থা করব। ভালো চাও তো চুপচাপ স'রে পড়ো।"

"আমি যা চাই তা না নিয়ে স'রে পড়বার লোক আমি নই। ভালো চাও তো যা বলছি তাড়াতাড়ি করো। নাহলে আমি তোমার সরু কোমরে জড়ানো কাপড় খুলে নেব এবং তোমাকে আয়ত্ত করব।"

"তুমি গায়ের জোর দেখিয়ে আমাকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা কোরো না। তোমার কলকৌশল খাটাতে এসো না। বরং তুমি চ'লে যাও, নিজেকে শুধু শুধু হয়রান কোরো না কিংবা চোট খেয়ো না। চ'লে যাও।"

"ও ভাবে চ'লে যাওয়া আমার স্বভাবই নয়। তোমাকে পাবার জন্যই আমি এসেছি। আজেবাজে কথা ছাড়ো। এসো, আমার পাশে বোসো।"

"আমাকে জবরদস্তি ক'রে টানাটানি কোরো না। মনে রেখো আমার স্বামী আছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাও। তুমি আমার দেবরের মতো।"

"অজ্ঞ নারী! আমি তোমার দেবর, এমন কথা বোলো না। তোমার রক্ষাকর্তা কারা এবং ক'জন? দেবর বটে! তুমি কি জানো না আমি আমার নিজের মাতুলকে (কংস) বধ করেছি?"

চারণরা যে চিত্রনাট্য প্রবর্তন করে তা থেকে এ দৃষ্টান্ত আরও দু-এক ধাপ অগ্রসর। এখানকার এই যে সংলাপ তা একা চারণ আবৃত্তি করতে পারে না অথবা কেবল নৃত্য দিয়ে তা রূপায়িত করা যায় না। সংলাপের যোগসূত্র হিসেবে 'তিনি বললেন' 'মেয়েটি বলল' ছাড়া কথকের আর কিছু বলার নেই। অন্য ধরনের আবৃত্তিতে কথক এইরকম কিছু বলতে পারেন, "মেয়েটির কথা শুনে তিনি চতুর হাসি হেসে তার পথ আটকাবার জন্য হাত বাড়ালেন এবং বললেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিবরণও নৃত্যে রূপায়িত হতে পারে এবং অন্য চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তে সংলাপ যতই এগিয়ে চলে ততই তা ক্ষিপ্রতর হয়, শুধু

তাই নয় আরও সরস হয়, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সংলাপ পূর্ণভাবে উপভোগের জন্য কথক ছাড়াও দুইজন অভিনেতাকে ঐ দুটি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পৌরাণিক উল্লেখগুলি বাদ দিলে সংলাপটি নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হয় (গোপিনী শ্রীকৃষ্ণকে তার দেবর বলেছে এবং তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, এই সব সম্পর্কের জন্য তিনি আদৌ ভাবিত ন'ন। কারণ সকলেই জানে তিনি তাঁর মামাকেও বধ করেছেন। অতঃপর মেয়েটি অন্যান্য সম্পর্কের কথা তুলে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তার যথোপযুক্ত উত্তর দেন।)

তুমি আমার সন্তান।
না, আমি তোমার সন্তানের পিতা।
তুমি আমার পিতা।
আমি তোমার পিতার জামাতা।
তুমি আমার ভ্রাতা।
আমি তোমার ভ্রাতার ভগ্নীপতি।
আমি যতই মিনতি করি না, তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছ না।
আমি কেন আর বৃথা বাক্যব্যয় করব? কঠিন হৃদয়, দুষ্ট-
মতি ধৃষ্ট নরপিশাচ, বলো তুমি কে?

এই শেষ নয়। ঈশ্বরের দশ অবতারের উল্লেখ করা হয় এবং প্রত্যেককে একে একে বিদ্রূপ করা হয়। একজন হিন্দুর কাছে ঐ সব বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে অসংগতির কিছু নেই, কারণ প্রত্যেকের কাছে ভগবানই সব। 'ভক্ত' তথা ব্যক্তির স্বাধীনতা হল স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা, যা শ্রোতাকে আনন্দিত করে। তা ছাড়া, নাট্যরূপ হিসেবে ধরলে এ এক নতুন

নাটকের প্রারম্ভ। এ নাটক রূপায়ণ-রীতিতে, ভাষায় এবং বিষয়-বস্তুতে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নিঃসংশয়ে বলা যায়, এখানেই আধুনিক ভারতীয় নাটকের আরম্ভ।

পাঁচ

ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয় থেকে আধুনিক ভারতীয় নাটকের অভ্যুদয় পর্যন্ত পাঁচ-ছয় শতাব্দীকাল দেখানো হল আধুনিক ভারতীয় নাটকের উজ্জ্বল প্রত্যূষরূপে, অন্ধকার যুগরূপে নয় যা সাধারণভাবে মনে করা হয়। জাত-পেশাদার চারণরাই প্রথম জনসাধারণের অবোধ্য ভাষায় লেখা নাটকের জায়গায় এক নৃত্য-নাট্যের আঙ্গিক প্রবর্তন করে। এই আঙ্গিকের পরিণামে এক নতুন শ্রেণীর শিল্পীর উদ্ভব হয়, তারা নটী অর্থাৎ নর্তকী। নৃত্য-নাট্যের জনপ্রিয়তার ফলে শিল্পী-প্রেমিক রাজারা নতুন রচনা লিখতে এবং সেইসঙ্গে নটী শ্রেণীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে উৎসাহিত হন। শৈব ও বৈষ্ণব ধারার এবং সাধারণভাবে ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন এই আঙ্গিককে শুধু যে নতুন উপকরণ জুগিয়েছিল তাই নয়। জনসাধারণের ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তন ক'রে নাটককে একটা স্থায়ী আকৃতিও দিয়েছিল। এখন থেকে ধ্রুপদী নাটকের ক্ষেত্রে যেমন ছিল তেমনি সংলাপও (কিন্তু নিজের ভাষায়) শিক্ষা দিতে ও চিত্ত বিনোদন করতে সমর্থ হ'ল। উপরন্তু ধার্মিক

পুনরুজ্জীবন বেশ কিছু মন্দির-নির্মাণে রাজাদের অনুপ্রাণিত করে, যার ফলে নাট্য-তৎপরতা আরও উৎসাহ পায়। সুতরাং বলা যায়, চারণেরা, রাজারা এবং সন্তেরা আধুনিক ভারতীয় নাট্যের গোড়া-পত্তন করেন।

বর্তমান পণ্ডিতদের বিবরণ এবং আধুনিক ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা শুনতে পাই যে, আসামে অসমীয়া নাটক বাস্তবিক আরম্ভ হয় বৈষ্ণব যুগে। গুরু এবং শিষ্য শ্রীশঙ্করদেব এবং শ্রীমাধবদেব মূল সংস্কৃতের উপর ভিত্তি ক'রে নাটক লেখেন। বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণ এবং তাঁর শৈশব সম্পর্কে 'ভাগবৎ'-বিবৃত কাহিনী। নাটকগুলি ছিল একাঙ্কিকা এবং তাদের বলা হত 'অঙ্কীয় নাট'। সংগীত ও নৃত্য তাতে ছিল। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার তাতে ছিলেন, যিনি অভিনয় ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করতেন। গানগুলি ছিল প্রধানত প্রার্থনা ; এবং একক নাচ ও যৌথ নাচ ছিল বিভিন্ন প্রকারের। প্রায় সেই একই সময়ে (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে) আর এক সন্ত, চৈতন্যদেব, বাংলাদেশে নাটকের অনুপ্রেরণা নিয়ে আসেন। 'রুক্মিণী-হরণ' নামক নাটকে তিনি নিজে নাকি নায়িকা রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এখানেও কৃষ্ণের উপাখ্যানই হল নাটকের বিষয়বস্তু। প্রযোজনাটা ছিল চারণ-আঙ্গিকের, বাংলাদেশে যার নাম দাঁড়ায় 'যাত্রা'। অন্য কথায়, এ নাটক অভিনীত হত খোলা জায়গায় এবং কোনো তৈরী মঞ্চ বা দৃশ্য বা পর্দা থাকত না। সংগীত ও নৃত্য ছিল বেশি, সংলাপ ও ক্রিয়া ছিল কম। নটী শ্রেণীর উদ্ভব সম্পর্কে যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এতেও সেইরকমই হয় ; স্ত্রী-

ভূমিকায় অভিনয় করতে আরম্ভ করে নটীরা, যাদের বলা হত দেবদাসী। এই নারীশিল্পীদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক প্রথমে ছিলেন রাজারা, কিন্তু ক্রমে যখন অধিকতর সংখ্যায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল তখন পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়াল রাজাদের বদলে ঐ-সব মন্দির। থিয়েটারের পক্ষে এটা এক শুভ ঘটনা, কারণ সেই সময় রাজপদ ছিল খুবই অনিশ্চিত। ঐ একই বৈষ্ণব আন্দোলন হিন্দি অঞ্চলেও নাটকের অনুপ্রেরণা দিয়েছে মনে হয়। আমরা জানি যে, পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব আন্দোলনকে ভিত্তি ক'রে এক বর্ধিষ্ণু রাজকীয় থিয়েটার বিদ্যমান ছিল এবং মিথিলা ও বুন্দেলখণ্ডের নৃপতিদের মতো নৃপতিরা তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, উড়িষ্যায়, তামিলনাড়ুতে এবং কেরালায় এবং হিন্দি অঞ্চলের কোনো কোনো এলাকায় শাসক নৃপতিরা এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং তাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা তো করতেনই, উপরন্তু চারণদের জন্য রচনাও করতেন। এই চারণেরা অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বৈতালিক জাতি কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষভাবে ভাষা-নাট্যের প্রাথমিক রূপ সৃষ্টি করে। চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি চারণেরা —যাদের কাশ্মীরে বলা হত ভাঁড়— সাধারণ গ্রামবাসীদের জন্য নাটক প্রবর্তন করে। আমরা যদি তাতে কৃষ্ণ-কাহিনী না পাই, তার কারণ সম্ভবত এই যে, সেই সময় কাশ্মীর মুসললান আক্রমণ কারীদের পদানত হয়েছিল। পাঞ্জাবেও নাটকের প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় জনসমক্ষে নাটকীয় কাব্যের আবৃত্তিতে। আবৃত্তি-কারকদের বলা হত 'যোগী'। এই প্রথম আমরা এক নতুন জিনিষের সাক্ষাৎ পেলাম। কারণ, এই যোগীরা ছিল ব্রাহ্মণ কথক। অন্য কথায় বলা যায়, চারণেরা আর নিম্নজাতির লোক নয়। এটা

সম্ভব যে, ভরতের পুত্রদের মতো এই ব্রাহ্মণেরাও তাদের জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দ্বারা সমাজচ্যুত হয়। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ ভক্তিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখি আবৃত্তিকারকেরা জাতিগত শ্রেণীবিন্যাসে ধাপে ধাপে উপরে উঠছে। অবশেষে দক্ষিণে, যথা অন্ধ্রে, কর্ণাটকে ও মহারাষ্ট্রে আমরা দেখতে পাই তারা ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এক উচ্চস্থান অধিকার করেছে। এটা সম্ভব হয়েছিল এক নতুন ধরনের আবৃত্তির উদ্ভবের ফলে। এ আবৃত্তি একদিকে যেমন চারণ নৃত্য-নাট্য থেকে তফাত, অন্যদিকে তেমন 'যাত্রা' থেকেও তফাত। একে বলা হত 'কালক্ষেপ' বা 'হরিকথা' বা 'কীর্তন'।

এখনও পর্যন্ত প্রচলিত জনপ্রিয় 'হরিকথা' একক ব্যক্তির অনুষ্ঠান। কোনো মঞ্চ নেই, কোনো দৃশ্য নেই, কোনো অঙ্গসজ্জা নেই। সাধারণতঃ এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় কোনো মন্দির-প্রাঙ্গণে অথবা কোনো ধনীগৃহের বৃহৎ কক্ষে। প্রবেশ অবারিত। যে-কোনো সামাজিক ('স্পৃশ্য') জাতির লোককে ঢুকতে দেওয়া হয়, বিশেষত মন্দির-প্রাঙ্গণে। 'হরিকথা'-শিল্পী (যাকে 'কীর্তনকার' বলেও অভিহিত করা হয়) পায়ে ঘুঙুর পরে এবং তাল রাখার জন্য এক-জোড়া মন্দিরা ব্যবহার করে। (সময়ে সময়ে সে কেবল এক হাতেই দুটি মন্দিরা বাজায়) নাট্য-অনুষ্ঠানে যেমন করা হয়, তেমনই আরম্ভে নানান্ দেবতার বন্দনা করা হয়, তারপর নাটকের সূত্রধারের মতোই শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানায় কোন্ কাহিনী এবং কাহিনীর কোন্ অংশ সে আবৃত্তি করবে এবং পরিশেষে কাহিনীর অবতারণা করে। শিল্পী সম্বন্ধে সব চেয়ে আগ্রহের বিষয় এই যে, সে পৌরাণিক কাহিনীতে যেমন সুপণ্ডিত, তেমন গানে, নাচে ও অভিনয়ে পারদর্শী। অঙ্গভঙ্গি ও স্বরবৈচিত্র্যের সাহায্যে সে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করে। সে সঙ্গে

সঙ্গে সংলাপ তৈরী করে, সে নৃত্যের দ্বারা ঘটনা বা দৃশ্যের সমাপ্তি বুঝিয়ে দেয়, সে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি দেয় এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং সব শেষে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের বাণী প্রচার করে। একলা একজন 'হরিকথা'-শিল্পী সমস্ত রাত শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহ ও মনোযোগ আকৃষ্ট রাখতে সক্ষম। ভারতবর্ষে প্রত্যেক শিল্প এবং প্রত্যেক প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, 'হরিকথা'র ক্ষেত্রেও তেমন ঘটেছে। হরিকথা-শিল্পীরাও একটা সামাজিক জাতিতে পরিণতিলাভ করেছে। তার ফলে নাটকীয় শিল্প এবং প্রতিভা পুরুষানুক্রমিকভাবে অগ্রসর হয়েছে। হরিকথা-আবৃত্তি পুণ্যলাভের এক উপায়, এই ধারণা ক্রমে সৃষ্টি হয়; সম্ভবত এই ধারণা সৃষ্টির মূলে একদিকে ভক্তিবাদ এবং অন্যদিকে 'হরিকথা'র ব্রাহ্মণ শিল্পী। যেহেতু বিষয়বস্তু ছিল কৃষ্ণের কাহিনী (যেমন 'ভাগবতে' এবং পরে 'মহাভারতে') এবং কালক্রমে 'রামায়ণে'র রামের, সেই হেতু 'হরিকথা'র অনুষ্ঠান চলত একাধিক দিন, কখনও এক সপ্তাহ, কখনও এক পক্ষকাল, কখনও বা এক মাস ধ'রে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমগ্র কাহিনী সমাপ্ত করা হত এবং শেষ দিন শিল্পীকে অর্ঘ্য দেওয়া হ'ত।

ভারতীয় নাটকের প্রারম্ভে চারণ, সন্ত এবং হরিকথা-শিল্পীর প্রভাব সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ দেওয়া হল তাতে একটা বিচিত্র জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী চারণেরা; অসমীয়া, বাংলা ও হিন্দি অঞ্চলে বৈষ্ণব সন্তরা; অন্ধ্রে, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটকে হরিকথা-শিল্পীরা; এবং কেরালায় ও তামিল-নাড়ুতে প্রত্যক্ষ রাজকীয় প্রভাব। এই চারটি বিভাগের প্রত্যেকটি পরস্পর সংলগ্ন ভাষাগত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। যদিও বাইরের কার্য-

কারক শক্তি পৃথক, কিন্তু অন্তর্বস্তু একই, যথা 'ভাগবতে'র কাহিনী (কিংবা কখনও কখনও প্রাচীন বীরগাথা), নৃত্য এবং সংগীত, সংস্কৃতের প্রভাব কিন্তু জনসাধারণের ভাষা-ব্যবহার এবং সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক। ঠিক এই সব উপাদান নিয়েই লোকনাট্য তৈরী হয়। 'ভক্তি'-গোষ্ঠীর নাটক শুধু যে এই সব উপাদান লোকনাট্যের হাতে তুলে দিয়েছিল তাই নয়, এটাও দেখিয়েছিল যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ অত্যাবশ্যক। চারণ, হরিকথা-শিল্পী এবং সূত্রধার ছিল যোগসূত্র। এই ভিত্তির উপর ভারতবর্ষের লোকমঞ্চ নির্মিত হয়। এ এক দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বিশাল সৌধ; এবং পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব আঞ্চলিক যে-সব পার্থক্য লক্ষিত হয় সেগুলি একই অট্টালিকার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নয়।

লোকমঞ্চ

এক

ভক্তি যুগ যে-মঞ্চ প্রবর্তন করেছিল সেটাই লোকমঞ্চের সূচনা, এমন ধারণা সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যদিও ভারতীয় লোকমঞ্চ কী তা বুঝতে চেষ্টা করার আগে এ কথাটা স্পষ্ট করা দরকার। পঞ্চদশ শতাব্দীর উল্লেখ করলে তাকে ভারতীয় লোকমঞ্চের জন্মকাল না ব'লে বলা উচিত পুনরুজ্জীবন কাল। এ গ্রন্থের আগের অংশে আমরা বলেছি যে, লোকমঞ্চ নিশ্চয় স্মরণাতীত কাল থেকে ছিল। 'নাট্যশাস্ত্র' শুধু যে তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে তাই নয়, এই অভিযোগও করেছে যে, তাতে প্রচুর গ্রাম্যতা ('গ্রাম্যধর্ম') এবং অজ্ঞতা আছে এবং জ্ঞান বা শিক্ষার কিছু নেই। প্রধানত এই কারণেই ভরত 'নাট্যশাস্ত্র' রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং নাটকের দশটি রূপ ('দশ রূপক') স্বীকার করে মঞ্চাভিনয়ের ব্যাপারে কী করা উচিত ও কী করা অনুচিত তার নির্দেশ দেন। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের বর্ধিষ্ণু মর্যাদা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে লোক-মঞ্চ তার দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হয় যে, মহাকাব্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করতে আরম্ভ করে এবং সূত্রধার ও বিদূষকের মতো চরিত্র প্রবর্তন করে। তবু প্রমোদের উপাদানই নিশ্চয় তাতে প্রধান ছিল,

যার ফলে বহুল পরিমাণে সেই বস্তু থেকে গেল যাকে ভরত এবং তাঁর মতাবলম্বীরা বলতেন ইতর বা গ্রাম্য। সংস্কৃত নাটকের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে লোকমঞ্চের পক্ষে তার আগেকার রূপে ফিরে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। একদিকে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় এবং অন্য দিকে কোনো জীবনযাত্রা-বিধি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে সামাজিক জীবনের কোনো নৈতিক মান আর থাকল না। যে কয়টি প্রাকৃত নাটক পাওয়া যায় তাতে তো বটেই, এমন-কি, সংস্কৃত নাটকেও আমরা এই অবস্থার প্রতিফলন দেখতে পাই। যেমন, 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে' গ্রন্থকার বলেন ব্রাহ্মণেরা সুরাপানে এবং বেশ্যা সংসর্গে রাত কাটান এবং দিনের বেলায় "সর্বজ্ঞ, যাজ্ঞিক, ব্রহ্মবিদ তপস্বী" ব'লে পরিচিত হন। (দুই-1)। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতিও তাঁর একই অশ্রদ্ধা। এক বৌদ্ধচরিত্র ঘোষণা করে : "আমি শত বুদ্ধের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমি যখন আমার বক্ষে এক কাপালিকীর বিশাল স্তন চেপে ধরেছিলাম তখন যে-আনন্দ আমি অনুভব করেছি তেমন আনন্দ জীবনে কখনও অনুভব করি নি" (তিন-18)। এইরকম সমাজে লোকমঞ্চ যদি তার আদি মান আবার প্রবর্তন করে, তা হলে তা আশ্চর্য তো নয়ই, এমন-কি,তা ক্ষমার্হ। নাটকে সর্বসাকুল্যে যা থাকত তা হল নাচ, অনেকগুলি গান ও কিছু সংলাপ। কোনো কাহিনী তাতে থাকত না। গান ও সংলাপের বিষয়বস্তু কী ছিল তা কল্পনা করা কঠিন নয়। সতেজ, উজ্জ্বল মৌলিক ইতরতা আজ পর্যন্তও লোকমঞ্চের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যরূপে টিকে আছে। অবশ্য ভরতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত 'শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানেরা' লোকমঞ্চকে তার স্থূলতার জন্য নিন্দা করেছেন। এমন-কি, যাঁরা নাকি ভারতীয় থিয়েটারের ঐতিহাসিক

পর্যালোচনায় রত তাঁরাও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে তত বলেন না যত বলেন তার আপত্তিজনক লক্ষণগুলি সম্বন্ধে। এক সমালোচক বলেছেন : "গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণীর অভব্য নাটক আছে। অভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গি অশ্লীল। গীতগুলিতে কাব্য নেই এবং সংলাপে গন্ধ নেই। নৃত্যগুলি নিছক ভ্যাঙচানির চেষ্টা। আর সব চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যাপার হল এই যে, গ্রাম্য শ্রোতা-দর্শকেরা তা পছন্দ করে এবং উপভোগ করে।" সমালোচকের "নিকৃষ্ট ব্যাপার"টি কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে থিয়েটারের ইতিহাস-রচয়িতার কাছে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যাপার। কালিদাস যেমন বলেছেন, "নাটক বিভিন্ন রুচির মানুষের জন্য এক প্রমোদ-অনুষ্ঠান।" কালিদাস যা বোঝাতে চান তা আসলে দুটি পৃথক বস্তু : ১. নাটক এক প্রমোদ-অনুষ্ঠান, এবং ২. নাটক সমস্ত রুচিকে পরিতৃপ্তি করতে চায়। প্রথম বস্তুটির পক্ষে নাটক এক, কিন্তু দ্বিতীয়টির পক্ষে তার রূপ বিবিধভাবে পরিবর্তিত হয়। লোকমঞ্চের উদ্ভব হয়েছে, কারণ লোকে তা উপভোগ করে ; লোকে তা উপভোগ করে, কারণ এই সেই মাধ্যম যা তারা জানে। আমরা যাকে ইতরতা বলি তা লোকমঞ্চের মূল বৈশিষ্ট্য নয় এবং তা শ্রোতৃমণ্ডলীর অভিজ্ঞতায় ইতরতাও নয়। এ মঞ্চ তারাই তাদের জন্য সৃষ্টি করেছিল। তাদের অভিজ্ঞতার, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর এবং তাদের জীবনযাপনের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সম্ভবত তারা ইতরতাকে ইতরতা হিসেবে উপভোগ করে না, উপভোগ করে তার পিছনের শিল্প এবং চাতুর্যকে। তারা যে তাই করত, তা প্রমাণিত হয় যখন পরে তারা মহাকাব্য-কাহিনীর প্রভাবে আসে। মহাভারতের নায়কদের বীরত্ব-গাথা এবং রামায়ণের নায়ক রামের মহৎ জীবন ভারতবর্ষের সর্বত্র লোকমঞ্চে দারুণ আগ্রহের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

শ্রোতৃমণ্ডলী শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল। এই কারণেই চারণেরা বৃহত্তর সংখ্যায় দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের অভিঘাত এতটা নিবিড় হয় নি যার ফলে কোনো গভীর বা স্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রাসাদে এবং মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রযোজিত সংস্কৃত নাটক সাধারণ গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে বহু দূরে থাকত। কিন্তু চারণেরা সর্বত্র, যে-কোনো স্থানে যেতে পারত। চারণেরা প্রযোজনার অনাড়ম্বর পদ্ধতিও দেখায়, উপরন্তু তারা নৃত্যে এমন এক মাধ্যম সৃষ্টি করে যা শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভাষার অজ্ঞতা ভুলিয়ে দেয়। লোকমঞ্চের শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মনে যে নাটকীয় আগ্রহ জীবন্ত রাখা হয়েছিল, তা নতুন নাট্য আঙ্গিকের বীজ বপনের প্রস্তুত ক্ষেত্ররূপে প্রতিপন্ন হয়। নাটকের পুনরুজ্জীবন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দুই

ভারতীয় ইতিহাসের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য জন-জীবনে খুব সামান্য ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। যে শতাব্দীগুলির আমরা আলোচনা করছি সেই সব শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ক্রমাগত বেশি সংখ্যক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল, রাজারা যে-কোনো কারণে অথবা অকারণেই একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, পুরাতনেরা অদৃশ্য হতেন এবং

নতুনদের আবির্ভাব হত এবং প্রত্যেকে নিজেকে সম্রাট বা চক্রবর্তী ঘোষণা করা সত্ত্বেও একে অপরকে তাঁর অধীন ব'লে দাবি করতেন। এমনকি হর্ষ পর্যন্ত যখন বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাস্থিত সমগ্র অঞ্চলে একক কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হন, তখন শঙ্করাচার্য তাঁর দর্শন নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকেই অভিযান করেন এবং এই দুই অংশেই তাঁর আধ্যাত্মিক আধিপত্য স্থাপন করেন। জনগণের জীবন ও মনোভাবের এই বিশেষত্বের জন্যই আমরা সমগ্র দেশে ভারতীয় থিয়েটারের অগ্রগতিতে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখতে পাই, যদিও এই সময়টাতে বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি (দক্ষিণের চারটি ছাড়া) তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশলাভ করছিল। কিন্তু দক্ষিণের ভাষাগুলির ক্ষেত্রেও উত্তরের সেই একই সংস্কৃত ভাষা তাদের সাহিত্য ও জনসংস্কৃতির বিকাশকে প্রভাবিত করে। শুধু নাগরিক নয়, গ্রাম্য থিয়েটার সম্পর্কেও এটা দেখা যায়। এই কারণেই শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সর্বত্র থিয়েটার যে শুধু পরিবর্তিত হয় তাই নয়, পরিবর্তিত হয় একই ধাঁচে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাংলা নাটক 'রুক্মিণী হরণ' এবং তেলেগু 'ভামাকল্প' উভয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণু) জীবন-বিষয়ক এবং উভয়েরই সৃষ্টি একই প্রভাব থেকে।

আমরা যখন ভারতীয় থিয়েটারের একটা বিশেষ যুগের কথা বলি, তখন এটা যেন ধ'রে না নেওয়া হয় যে, ঐ সম্পর্কে উল্লেখিত সব কিছু শুধু ঐ যুগেই ঘটেছিল। তেমনই, আমরা যখন বলি যে, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' লোকমঞ্চকে প্রভাবিত করেছিল, তখন আমরা এ কথা বোঝাতে চাই না যে, ভরতের পরে লোকমঞ্চ তার পুরোনো রূপ সম্পূর্ণ বর্জন করেছিল অথবা এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

আমরা যখন চারণ-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবের কথা, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম এবং হরিকথা-শিল্পের প্রভাবের কথা বলি, তখন এটা মনে করলে ভুল হবে যে, ঐ প্রভাবগুলি পরপর ঐ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল অথবা ঐ সব শতাব্দীতে তারা লোকমঞ্চের রূপ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। রাজনৈতিক সত্তা সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের আত্মবিকাশের নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়; শুধু তাই নয়, তাদের এই বিকাশ-ধারা পরস্পর থেকে পৃথক। চারণ এবং বৈষ্ণবেরা ছাড়া সাধারণভাবে জনগণ এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে কদাচিৎ ভ্রমণ করত। বিদ্বানদের সংস্কৃত ভাষা ছাড়া সংযোগের আর কোনো সাধারণ মাধ্যম ছিল না। সেই কারণেই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিলুপ্ত হওয়ার অনেক পর পর্যন্তও সংস্কৃতে লেখার রেওয়াজটা প্রচলিত ছিল। অতএব আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত এবং অপরিমেয় অশিক্ষিত, উভয়েরই চিত্তবিনোদনের মাধ্যম যে নাটক তার ধারা সমগ্র দেশের সর্বত্র একই পথরেখা ধ'রে অগ্রসর হয়েছিল। এমন-কি, দক্ষিণের যে ভাষাসমূহ উত্তরের (ইন্দো-আর্য) ভাষাসমূহের শত শত বছর আগে বিকাশলাভ করেছিল, সেই সব ভাষাতেও এই যুগে লিখিত কোনো নাটক পাওয়া যায় না। তার অর্থ এই নয় যে, থিয়েটার বিলুপ্ত হয়েছিল। প্রথমত, সংস্কৃতে লেখার কারণ কম ছিল। তা ছাড়া, লেখারই প্রয়োজন প্রায় ছিল না। চারণরা যদি মহাকাব্য-গাথা গান করেন, তা হলে শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাষায় তা রূপান্তরিত করার দরকার হয় না, কারণ সমস্ত অর্থ নাচের মারফৎ প্রকাশ করা হয়। সন্তদের ক্ষেত্রে, ভাষা যদি সংস্কৃত হতও (যেমন 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক

এক নাটকে, যেটি নাকি চৈতন্যদেবের প্রেরণায় জনৈক রামানন্দ রায় লিখেছিলেন), তবু বৈষ্ণব মতবাদের ব্যাখ্যা ও প্রচার শ্রোতৃমণ্ডলীর ভাষায় করা যেত; না করা হলেও কিছু যেত আসত না, কারণ নৃত্য ও গীতই 'ভক্তি' ভাব জাগ্রত করত, যা ছিল এক-মাত্র উদ্দেশ্য। কেবল 'হরিকথা'র ক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতে হয় যে, জনসাধারণের ভাষাই ছিল মাধ্যম। কিন্তু এখানেও রচনাগুলি ছিল প্রচলিত প্রাচীন রচনা (সংস্কৃত) এবং শিল্পী তার ভাষ্য করতেন। পরিশেষে, আমরা ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেব এই কারণে যে তখনকার দিনে লেখাটা ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমের ব্যাপার এবং অনুলিপি করা ছিল সারাজীবনের এক কাজ। কত নিকৃষ্ট বস্তু থেকে যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি জানি না।

কালক্রমে আঞ্চলিক পার্থক্যগুলির আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সমস্ত আঞ্চলিক লোকমঞ্চে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বর্তমানে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান ভারতীয় লোকমঞ্চের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই ধারণা ঠিক হয় যদি আমরা স্বীকার ক'রে নিই যে, সারা রাত্রির অনুষ্ঠান তার মৌলিক বা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয়, পরন্তু চারণ-ভক্তি-হরিকথা যুগেরই প্রভাবের ফল। আবৃত্তি, নৃত্য ও ভ্রাম্যমাণ বৈতালিক থাকলে সারা রাত্রির অনুষ্ঠান হওয়া স্বাভাবিক, সম্ভবত প্রয়োজনও এবং নিশ্চয় অপরিহার্য যদি প্রতিভাশালিনী নর্তকীরা অংশ গ্রহণ করে। সন্ত এবং হরিকথার ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ছিল। ভক্তিবাদের প্রসারের কোনো এক অধ্যায়ে সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে বিনিদ্র থাকা পুণ্যকর্ম ব'লে বিবেচিত হ'ত। এটা নিশ্চয় লোকমঞ্চকে প্রভাবিত করেছিল। এ কথা বলা

ঠিক হবে না যে, এই ব্যাপার সব সময়েই ছিল। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক নিশ্চয়ই এ ধরনের কোনো রেওয়াজের ইঙ্গিত দেয় না। ঐতিহ্য এবং বিশেষজ্ঞেরা এর বিরুদ্ধেই ছিলেন মনে হয়। আলোচ্য যুগে এই রেওয়াজের প্রবর্তনে একজন পরবর্তী কালের সমালোচক মনে হয় ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেন :

> যাম-মাত্র-সমাপ্যম্ যৎ তন-নাট্যম রাগবর্ধনম্ দীর্ঘম্ বিরাগ-জনকম্ অতো নাট্যম্ বিবর্জয়েৎ।
>
> [শুধু সেই নাট্যানুষ্ঠানই আগ্রহ ধরে রাখতে পারে (রাগ-বর্ধন) যা তিন ঘণ্টার (যাম) মধ্যে শেষ করা যায়। তার চেয়ে দীর্ঘতর অনুষ্ঠান অনাগ্রহ (বিরাগ) সঞ্চার করবে ; অতএব তা পরিহার করা উচিত।]

বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রভাবে লোকমঞ্চে আর এক নতুন প্রবণতা দেখা দেয়। প্রথম আমল থেকে দুই মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ লোকনাটকের বিষয়বস্তুর প্রধান উৎস ছিল। কালক্রমে এই দুই মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা বিভিন্ন অঞ্চলের কবি ও সন্তদের ঐগুলি আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে অনুপ্রাণিত করে। প্রায়শই সেগুলি অনুবাদ না হয়ে হত ভাবানুসরণ ; সেই সব ভাবানুসরণে শুধু বর্ণনা ও খুঁটিনাটি বিষয় নয়, এমন-কি সংলাপগুলিও হত কবির সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মূল কাহিনীর টীকাভাষ্য। এই সব আঞ্চলিক রচনা সুবিধাজনক অভিনয়-লেখন প্রবর্তন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক রচনা ছন্দবদ্ধ হ'ত এবং প্রাচীন আমল থেকে লোক-নাটক প্রধানত গীতিনাট্য ছিল। আঞ্চলিক অনুবাদ থেকে যে সব অংশ সন্নিবিষ্ট করা হ'ত সেগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় এবং সেগুলির অর্থ উপলব্ধি প্রয়োজন হ'ত।

গ্রাম্য শিল্পীরা ছিল নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত (এখনও পর্যন্ত অবস্থা তাই), সেই জন্য অংশগুলির আবৃত্তি বা গান একজন সাহিত্যিক ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার হয়ে দাঁড়ায়। যেমন চারণ গান গাইত এবং তার ভাষ্য হিসেবে নর্তকী নাচত, তেমনি সাহিত্যিক-নেতা গান গাইত এবং অভিনেতারা নাচত। এমন-কি, সংলাপের ক্ষেত্রেও পিছনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি আবৃত্তি করত এবং অভিনেতারা 'ভাষণে'র মেজাজ ও অর্থের পক্ষে উপযোগী অঙ্গভঙ্গি করত। যে ব্যক্তি সমগ্র রচনাটি শুধু গান করে, তাকে কোনো কোনো অঞ্চলে বলা হয় 'ভাগবত'। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভাগবত শব্দটির মূল অর্থ ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগামী। এই 'পশ্চাৎ-মঞ্চের কোরাস' ভারতীয় লোকমঞ্চের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আর এক দিক দিয়েও এক নতুন বিশেষত্ব প্রবর্তন করা হয়। এক্ষেত্রেও একমাত্র বৈষ্ণববাদই তার মূলে। এতাবৎকাল বিষয়-বস্তু ছিল হয় মহাভারত থেকে নেওয়া বীর-কাহিনী, নয় রামায়ণের নায়ক রামের চরিত্রের অনুরূপ আদর্শ আচরণ প্রচারের কাহিনী। কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তিবাদের অভ্যুদয় ও প্রসারের পর কৃষ্ণের কাহিনী, তাঁর শৈশব, তাঁর প্রতি রাধার প্রেম এবং সাধারণভাবে তাঁর প্রণয়লীলা লোকমঞ্চের খুব জনপ্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। রঙ্গ-মঞ্চের বিকাশ এবং সমাজ-জীবনে রঙ্গমঞ্চের স্থানের পক্ষে এর তাৎপর্য অসাধারণ। এই প্রথম ধ্রুপদী ধাঁচের আদিরসাত্মক আবেগ জনমঞ্চে প্রবর্তন করা হল। অংশত এটা ছিল প্রথম আমলের স্থূলতা এবং আপেক্ষিক ইতরতার বিশোধন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, একদিকে রাম এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের কাহিনী এবং অন্যদিকে কৃষ্ণ ও তাঁর প্রণয়লীলা, এ দুয়ের মধ্যে

এক মৌলিক পার্থক্য ছিল। রাম এক আদর্শ চরিত্র, মহাভারতের নায়কেরা অতিমানব। যদিও তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধা অধিকার করতেন, তবু যে ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম তাঁরা আমাদের মধ্যে অনিবার্য ভাবে জাগ্রত করতেন, তা ঐ সব চরিত্র এবং আমাদের অর্থাৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক দূরত্বের সৃষ্টি করত। কিন্তু কৃষ্ণ রামের মতো অবতার হলেও অন্যছাঁচে তৈরী ছিলেন। তাঁর 'লীলা' তাঁকে এক প্রিয় মানুষে পরিণত করেছিল। তিনি ভালোবাসেন এবং প্রবঞ্চনা করেন, হাসেন এবং জ্বালাতন করেন, মন জয়ের জন্য তোষামোদ করেন, ফল লাভের জন্য প্রতারণা করেন এবং সাধারণ মানুষ যা কিছু করে সবই করেন। একদিক থেকে কৃষ্ণ-নাটকগুলিকে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রথম সামাজিক নাটক বলা যায়। যাকে তিনি ভালোবাসেন সেই রুক্মিণীকে নিয়ে তিনি পলায়নই করুন কিংবা তাঁর দ্বিতীয় পত্নী সত্যভামাকে তিনি প্রবঞ্চনাই করুন (এ প্রবঞ্চনা অবশ্য ক্ষ্যাপানোর জন্য তামাসা ছাড়া কিছু নয়), তিনি সাধারণ যুবকেরই প্রতিনিধিস্থানীয়, এবং তাঁর পত্নীদের নিয়ে তাঁর তামাসা যে সমস্যা সৃষ্টি করে, তা যে-কোনো বিবাহিত মানুষের সমস্যার অনুরূপ। এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে কৃষ্ণ এবং তাঁর দুই পত্নীর কাহিনী লোকমঞ্চে দেখা না যায়। ঐ রকমই জনপ্রিয় হল সেই সব কাহিনী যাতে কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে 'রাস্তার প্রেমিকের' মতো আচরণ করেন। আগের পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি গানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনী ছাড়াও, ঐতিহ্য অনুসারে কৃষ্ণ এক রাখাল, তিনি গোরু চরাতে চরাতে বাঁশি বাজান এবং গোপিনীদের ও রাখাল-বন্ধুদের সঙ্গে নাচেন। এই ঐতিহ্যের জন্য লোকমঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠ-গীতি ও যৌথ নৃত্যে সমৃদ্ধ হয়।

বৈষ্ণব সন্তরা সংস্কৃতে পণ্ডিতও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুরে বাঁধা নৃত্যনাট্য হিসেবে অভিনীত প্রাচীনতম কৃষ্ণ-কাহিনী হল সংস্কৃতে লেখা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। সন্তদের সংস্কৃত-জ্ঞান সংস্কৃতে প্রাচীনতম নাট্যকলা-বিধি 'নাট্যশাস্ত্র'-এর নিয়ম অনুসারে নাটক লিখতে তাঁদের প্রভাবিত করে। কোনো গ্রাম্য নাটক 'পূর্বরঙ্গ' ছাড়া আরম্ভ হত না, অর্থাৎ প্রথমেই বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করা হত। সংস্কৃত 'নাট্যশাস্ত্রের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও বৈষ্ণব নাটক এবং হরিকথা-শিল্পের প্রভাবে লোকমঞ্চ ভারতের বিধিবিধান জেনেছিল। দেবতাদের আরাধনা থেকে আরম্ভ ক'রে চরিত্রগুলির বিশিষ্ট অঙ্গসজ্জা পর্যন্ত সব বিষয়ে লোকমঞ্চ আজও 'নাট্যশাস্ত্র'বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে থাকে। অনুষ্ঠানের এই ব্যবহারিক সংগঠন, মনে হয়, এই সময়ই প্রবর্তিত হয়েছিল, কারণ যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব লোকের কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক নাটকগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল ব'লে গ্রাম্য শ্রোতা-দর্শকরা বার বার এই অনুষ্ঠানগুলি দেখার সুযোগ পেত। আগেকার সংস্কৃত নাটকগুলি, মন্দির-প্রাঙ্গণেই প্রযোজিত হোক অথবা প্রাসাদে, জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকত এবং এত কম হত যে, তার প্রভাব জনসাধারণের উপর পড়ত না। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমের জন্যও কোনো নিবিড় আগ্রহ সৃষ্টি হত না।

পরিশেষে, এই যুগে সমগ্র ভারতীয় লোকমঞ্চের ক্ষেত্রে আর একটি যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ কথা ইতিপূর্বে বার বার বলা হয়েছে যে, প্রাচীন কালে নাটক হয় প্রাসাদে নয় মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হত এবং তাও উৎসব বা অন্য কোনো বিশেষ উপলক্ষে। কিন্তু চারণ-ঐতিহ্য

এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রবর্তন করে। চারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত, সুতরাং তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য কোনো প্রাসাদ অথবা প্রাঙ্গণ-সমন্বিত মন্দির অপেক্ষা করত না। কোনো দেবতার সম্মানে উৎসব বা বিশেষ কোনো উপলক্ষ পাবার প্রত্যাশাও সে সব সময় করতে পারত না। যে-কোনো স্থান এবং যে-কোনো দিন, যা তার শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে সুবিধাজনক হত তার পক্ষেও তাই উপযোগী ছিল। কিন্তু এ বিষয়েও কিছু বাধা ছিল। শস্য বোনা বা শস্য কাটার ঋতুতে সে শ্রোতা পাবার প্রত্যাশা প্রায় করতেই পারত না। বর্ষার সময়েও ছাদের নিচে তার শ্রোতৃমণ্ডলীর বসার ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ধর্মের আবহাওয়া থাকায় বৈষ্ণব নাটক বা হরিকথা মন্দির-প্রাঙ্গণে না হলেও কোনো ধর্মানুরাগী পৃষ্ঠ-পোষকের গৃহে স্থান পেতে পারত; কিন্তু চারণের সে সুবিধা ছিল না। এই সব কারণে গ্রামের রাস্তার মোড় বা খোলা কোনো জায়গা মঞ্চের স্থান হয়ে দাঁড়ায়। শস্য কাটার পর থেকে নতুন শস্য বোনা পর্যন্ত কয়েক মাস এই অনুষ্ঠানের কাল ব'লে স্বীকৃত হয়। এই রেওয়াজ লোকমঞ্চ বিকাশে সাহায্য করে। যে সব স্থান ও উপলক্ষের বিধান ছিল, তা বাদ দিয়েই অন্য স্থান ও অন্য উপলক্ষে এখন নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হল।

তিন

পূর্বে বর্ণিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আঞ্চলিক লোকমঞ্চগুলি তাদের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এমন-কি, একই অঞ্চলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। জীবনযাপনের অবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাইরের প্রভাব এবং এই রকম অন্যান্য কারণে বিশেষ অঞ্চলের লোকমঞ্চকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে বা গুণে মণ্ডিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি গাঙ্গেয় উপত্যকায় রামের আদর্শ জীবন এবং কৃষ্ণের প্রণয়লীলা লোকনাট্যের প্রচলিত বিষয়বস্তু হয়ে থাকে, তা হলে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের যে প্রান্তসীমায় মানুষকে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের মধ্যে পার্বত্য ভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হত, সেখানে স্বভাবতই মহাকাব্যের নায়কদের এবং দেবদানবদের সংগ্রাম ও বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ এবং অনুরূপ সব ঘটনা লোকমঞ্চে স্থান পায়। উত্তরের 'লীলা' নাটক এবং পশ্চিম উপকূলের 'যক্ষগান' বা 'বায়ালতা' ঐ অঞ্চলগুলির লোকমঞ্চের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

প্রত্যেকটির একটি ক'রে দৃষ্টান্ত নিয়ে তার বিশেষত্বগুলি বুঝবার চেষ্টা করা যাক। অনুমান করা হয়, পশ্চিম উপকূলের 'যক্ষগান' (অল্পবিস্তর কর্ণাটকের কানাড়া অঞ্চলে সীমাবদ্ধ) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে। তারিখটা তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা

বৈষ্ণববাদের পুনরুজ্জীবনের যুগে ঐ শিল্পটির জন্ম সূচিত করে। 'যক্ষগান' নাটকের বিষয়বস্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই মহাভারত, রামায়ণ এবং ভাগবত থেকে নির্বাচিত। যে সব ঘটনায় যুদ্ধ আছে সেগুলিই বেশি পছন্দ করা হয়। অনুষ্ঠানের এক অদ্ভুত কার্যক্রম থেকে বৈষ্ণব প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হল মঞ্চে দুই চরিত্রের আবির্ভাব, যাদের উল্লেখ করা হয় অনুষ্ঠান-শেষে এক গানের মধ্যে। এই চরিত্র দুটির নাম হল রাম এবং কৃষ্ণ অথবা দুই রাখাল। এ রাম হলেন কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম, রামায়ণের নায়ক ন'ন। এঁরা আসেন অনুষ্ঠান দেখতে এবং যখন অনুষ্ঠান শেষ হয় তখন তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। এ দুটি চরিত্রের উপস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা কী তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়, তবে এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, এই রেওয়াজ আমাদের একভাবে ব'লে দেয় যে, 'যক্ষগান' বৈষ্ণব নাটকের অনুবর্তী হয়ে জন্ম নেয়।

যক্ষগান সারারাত্রির অনুষ্ঠান। এ নিয়মটা নির্ভুলভাবেই পালন করা হয়। যদি কোনোক্রমে নির্বাচিত ঘটনা আগেই শেষ হয়ে যায়, তা হলে আর একটি ঘটনা আরম্ভ করা হয়; তবে যদি নতুন ঘটনা সূর্যোদয়ের আগে শেষ না হবার মতো হয়, তা হলে তা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করা হয়; অনুষ্ঠান সূর্যোদয়ের সঙ্গেই সমাপ্ত হওয়া চাই। কোনো বিশেষ রঙ্গমঞ্চ থাকে না। চার কোণে চারটি খুঁটি পুঁতে একটি মঞ্চ তৈরী করা হয়। শ্রোতারা চারদিকে খোলা জায়গায় বসতে পারে। মঞ্চের এক প্রান্তে যন্ত্রীদের সঙ্গে ভাগবত বসে। পূর্বেকার ধ্রুপদী রঙ্গমঞ্চে যেমন থাকত, তেমনি একটি উল্টোনো বাক্স বা নিচু বেদী মঞ্চের একমাত্র সরঞ্জাম। এটি

রাজার জন্য সিংহাসনরূপে অথবা অন্য যে-কোনো চরিত্রের জন্য আসনরূপে ব্যবহৃত হয়। তবে অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হল ভাগবত। চরিত্রেরা যখন প্রথম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, তখন তারা শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে পিছন ফিরে ভাগবতকে প্রণাম করে। সাধারণত তাদের প্রবেশ করতে হয় ভাগবতের বাঁ দিক থেকে এবং প্রস্থান করতে হয় ভাগবতের ডান দিক দিয়ে। প্রেক্ষাগৃহের মতো অভিনয়-মঞ্চও খোলা আকাশের নিচে।

এই লোকনাট্যরূপ যে-অঞ্চলের, সেখানে জনসাধারণের ভাষা দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর এক শাখা থেকে উদ্ভূত, অথচ এতে নাট্যকলা-বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের অর্থাৎ 'নাট্যশাস্ত্রে'র বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে অনুসরণ করা হয়। এটাই আশ্চর্য। নাটক আরম্ভ হবার আগে সাজঘরেই 'পূর্বরঙ্গ' বা দেবতাদের প্রাথমিক আরাধনা আরম্ভ হয়ে যায়। যাঁর বিশেষ ক্ষমতা হল বাধা-বিপত্তি অপসারিত করা, সেই গণেশ দেবতার পূজা করা হয়। পোষাক এবং অঙ্গসজ্জার জিনিষপত্র তাঁর কাছে নিবেদন করা হয় তাঁর আশীর্বাদের জন্য। অতঃপর ভাগবতকে এবং যন্ত্রীদের নিদর্শনরূপে উপঢৌকন দেওয়া হয়। এখন অভিনেতারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত।

নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে ভাগবতের দিকে একবার ভালো-ভাবে তাকানো যাক, বুঝে নেওয়া যাক অনুষ্ঠানে তার ভূমিকাটি কী। সে চারণের লোক-সংস্করণ। আধুনিক ভাষায় সে একাধারে প্রযোজক ও পরিচালক। সেই সঙ্গে সে চিরাচরিত প্রথার ব্রাহ্মণ গুরু, যে বিদ্বান এবং মহাকাব্য, পুরাণ, ভাগবত (কাব্য) এবং 'নাট্যশাস্ত্রে' সুপণ্ডিত। সেই জন্যই নাটকের চরিত্রেরা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশ ক'রে তাকে প্রণাম করে। একমাত্র সে-ই রচনা আবৃত্তি

করে, গানগুলি গায় এবং নৃত্যের ছন্দ নির্দেশ করে। সে চরিত্রগুলির পরিচয় দান করে, তাদের স্বগতোক্তির উত্তর দেয় এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়। কোনো চরিত্র যদি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন না হয়, তা হলে ভাগবত তার পরিচয় দান করে না, তবে শ্রোতৃমণ্ডলীর সুবিধার জন্য জিজ্ঞাসা করে সে কে, তার প্রবেশের কারণ কী···ইত্যাদি। অন্য কথায়, ভাগবতের চরিত্র যেন সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারেরই অনুরূপ। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ধ্রুপদী নাটকে সূত্রধার শুধু আরম্ভে রঙ্গমঞ্চে দেখা দেয়। কিন্তু আমরা অন্য প্রসঙ্গে দেখেছি, আরও প্রাচীন কালের সূত্রধারেরা ঠিক 'যক্ষগানে'র ভাগবতের মতোই ছিল। 'যক্ষগানে'র আর এক চরিত্র আরও আগ্রহোদ্দীপক। তার নাম হণুম নায়ক বা কোড়াঙ্গী। সে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতিনিধি, যথার্থই প্রতিনিধি। তার পোষাক পর্যন্ত সমসাময়িক কালের, তা কাহিনীর যুগের নয় বা ঐতিহ্যানুগ নয়। তার বাক্যের কর্তৃত্ব তার নিজের হাতে, অর্থাৎ সে অবান্তর বিষয়েও বলতে পারে। তার প্রধান কাজ হল শ্রোতা-দর্শকদের হাসানো (তাকে সাধারণত বলা হয় 'হাস্যগর')। সে প্রধান চরিত্রগুলির প্রবেশ ঘোষণা করে এবং তাদের বর্ণনা দেয়। সে এক দৃশ্যকে আর এক দৃশ্যের সঙ্গে, এক ঘটনাকে আর এক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে এবং, তা ছাড়া, সে সংবাদবাহক প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রের কাজও করে। 'যক্ষগান' মঞ্চে এই 'কোড়াঙ্গী'র স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক দেব-আরাধনার পর সেই প্রথম মঞ্চে প্রবেশ করে। এবং সমস্ত অনুষ্ঠানকাল সে মঞ্চে থাকে। বলা যায় 'কোড়াঙ্গী' চরিত্রের উৎপত্তি সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্র থেকে। সংস্কৃত নাটকে প্রস্তাবনায় বা প্রাথমিক দৃশ্যে সূত্রধারের সঙ্গে বিদূষকও রঙ্গমঞ্চে

দেখা দিত। কিন্তু যে ব্যাপারটা বেশি আগ্রহের, সেটা হল এই যে, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক ধরতে গেলে শ্রোতৃমণ্ডলীর তরফ থেকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। যদিও সে ব্রাহ্মণ, তবু নাটকে তার ভাষা সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষা। তার একটা কাজ হল শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নায়ককে (যার সঙ্গে সে সব সময় থাকে) ব্যাখ্যা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি নায়ক বলে যে, তার হৃদয় পঞ্চশরের অর্থাৎ মদনের বাণে বিদ্ধ হয়ে শতধা হয়েছে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদূষক ব'লে ওঠে: "ও, তুমি বলছ তুমি নায়িকাকে অবিলম্বে চাও।" 'যক্ষগানে'র কোড়াঙ্গীকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের প্রত্যক্ষ উত্তরপুরুষরূপে দেখতে পাওয়া খুবই কৌতূহলের বিষয়।

এইভাবে ভাগবতের পরিচালনায় এবং বিদূষকের সক্রিয় সাহায্যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পুরো রচনাটাই কাব্য এবং সংগীত, যা একা ভাগবতই আবৃত্তি করেন বা গান করেন। অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত ঘটনাটি শ্রোতৃমণ্ডলীকে ব'লে দেওয়া হয়। কিন্তু নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে আবৃত্তি দ্বারা এবং ঢাকের আওয়াজ সহ প্রথমে প্রধান প্রধান চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়। এই পরিচয়দানের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। দু'জন লোক একটা কাপড় পর্দার মতো ধরে, তার ওপাশে চরিত্রটি আসে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে। অতঃপর নাচ হয়, নাচের সময় মাঝে মাঝে চরিত্রটি দুই হাতে পর্দাটা একটু নামিয়ে দেয় এবং প্রথমে নিজেকে পাশ থেকে দেখায়, পরে দর্শকদের সামনাসামনি দাঁড়ায়; তারপর সে পিছন দিকে স'রে যায় এবং পর্দার আড়ালে থেকে পর্দারই সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হয়। প্রত্যেক চরিত্রের জন্যই এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি

করা হয়। পরিশেষে, প্রথম দৃশ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত চরিত্র পর্দার পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় এবং তারপর পর্দাটি গুটিয়ে নিয়ে চ'লে যাওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত আমরা তাদের নাম জানি না; কিন্তু দৃশ্য আরম্ভ হলেই কোড়াঙ্গী নাম ঘোষণা করে এবং সেই চরিত্রটি যথোচিত নৃত্য ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, চরিত্রগুলির উপস্থাপনে নৃত্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং পরিচয়দান পর্ব অনেকক্ষণ ধ'রে চলে। এমন-কি, যখন নাটক আরম্ভ হয় এবং ভাগবত দু-এক ছত্র আবৃত্তি করে, সেই সময়ও কোনো একটি চরিত্র সুদীর্ঘ ভাষণে নির্বাচিত বিশেষ ঘটনাটি বিবৃত করে। এ এক দীর্ঘ মুখবন্ধ, এবং এই রকম দীর্ঘ স্বগতোক্তির সময় ভাগবত "হ্যাঁ,' 'হ্যাঁ', 'ও', 'ও' ইত্যাদি একমাত্রার শব্দে মন্তব্য করতে থাকে। এই সব নৃত্যের সতেজ ভঙ্গি প্রধানত যুদ্ধ ও বীরত্বের বিষয়বস্তুর পক্ষেই উপযোগী। প্রেম, দুঃখ, করুণা প্রভৃতি আবেগ যথেষ্টরূপে আদৌ প্রকাশিত হয় না। 'যক্ষগণ' আঙ্গিকে নারীচরিত্র খাপই খায় না বলা যায়। তাদের অঙ্গসজ্জাও রমণীয় নয়। কিন্তু পুরুষ চরিত্রের অঙ্গসজ্জা সুরম্য। দানবেরা, এমন-কি দেবতারাও তাদের সংহার-রূপে মুখোশ ধারণ করে। মাত্র একটি বিশেষত্ব আছে যা এই নৃত্য-রূপকে একটা নাটকীয় আকৃতি দেয়। তা হচ্ছে গদ্য-সংলাপ। এটা রচনার অংশ নয়। রচনা তো সমস্তটাই সংগীত, যা শুধু ভাগবতই গায়। এ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী-করা সংলাপ। এক এক অভিনেতার মুখে তা এক এক রকম হতে পারে, এমন-কি, এক অনুষ্ঠানে যা বলা হয় অন্য অনুষ্ঠানে তার বদল হতে পারে। কারণ সংলাপ লেখা থাকে না এবং তা মুখস্থও করা হয় না। সংলাপেই অভিনেতার ক্ষমতার যাচাই হয়।

অভিনেতা যদি নিজের চরিত্র এবং তার সামনের চরিত্র বুঝে থাকে এবং যদি সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, এমন-কি বিদ্বান হয়, তবেই শুধু সে ঠিকমতো সংলাপ ব্যবহার করতে পারে। যুক্তি, উদ্ধৃতি, প্রবাদ এবং উপযোগী শব্দ তার আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন।

পশ্চাৎ-যবনিকা বা অন্য কোনো পর্দা ব্যবহার করা হয় না। মঞ্চসজ্জা ব'লে কিছু নেই। আগেই যা বলা হয়েছে, আরম্ভে চরিত্রগুলির প্রবেশ ঘোষণার জন্য একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এমন-কি নাটকের মাঝখানেও প্রধান চরিত্রদের প্রবেশ সম্পর্কে ঐ রকম করা হয়। যেহেতু যুদ্ধ এই অনুষ্ঠানের এক বৈশিষ্ট্য, সেই হেতু কখনও কখনও মঞ্চে মৃত্যু দেখানো হয়, যা 'নাট্যশাস্ত্র'-বিধির বিরোধী। কিন্তু দরকার না হ'লে বস্ত্রখণ্ডটি তুলে ধরা হয় এবং 'মৃত' চরিত্র উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চ ছেড়ে চ'লে যায়। এই লোক-নাটকের সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ হল সুরম্য অঙ্গসজ্জা এবং বর্ণাঢ্য পোষাক। সবুজ, নীল ও লাল পোষাকের উপর সোনালি বক্ষস্ত্রাণ, বাজু এবং কণ্ঠহার পরা হয়। মাথায় থাকে উজ্জ্বল বর্ণের এক মুকুট, তাতে চকমকে পাথর বসানো এবং এক বিস্তৃত পাখার মতো তার আকার। নিম্নাঙ্গের বস্ত্র প্রায়ই ঝলমলে রঙের হয় এবং তাতে বিপরীত রঙের পাড় থাকে। দৈত্যেরা এবং প্রেতাত্মারা মুখোশ পরে, তার ফলে বিভীষিকা ও বীভৎসতার এক চমকপ্রদ ভাব সৃষ্টি হয়। গন্ধর্বদের মতো 'অর্ধ-মানবিক' চরিত্রগুলি চোখের নিচে লাল বা কালো পেন্সিলের রেখা টেনে দৃষ্টিতে এক বিশেষ ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মনে হয়, বিভিন্ন চরিত্রের অঙ্গসজ্জা এবং পোষাক কেমন হবে তার সুনির্দিষ্ট বিধান ঐতিহ্যে রয়েছে।

'যক্ষগান' বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল, কারণ তা নৃত্য ও

আবৃত্তি-প্রধান এক বিশেষ ধরনের লোক-নাটক তো বটেই, উপরন্তু তাতে একদিকে লক্ষ্য করা যায় 'নাট্যশাস্ত্রে'র গভীর প্রভাব এবং অন্যদিকে 'নাট্যশাস্ত্রের'ও আগের যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য, যা ভাগবত এবং কোড়াঙ্গী চরিত্রে বিদ্যমান। ইতিপূর্বেই বলেছি, এই নাট্যরূপটি প্রধানত কর্ণাটকের উপকূল অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তার অন্য নাম 'বায়ালতা', এই নামে বেশ পরিবর্তিত আকারে তা দেখতে পাওয়া যায় মালভূমিতে (পশ্চিম উপকূলীয় রূপ থেকে তা অন্য রকম, তাকে সেজন্য 'মুদালা-পায়া'ও বলা হয় অর্থাৎ পূবের রীতি)। প্রথমত, 'যক্ষগান' ধরনের কোনো ভাগবত নেই, যদিও মঞ্চে একজন নেতা সহ একদল গায়ক থাকে। ভাগবতের মতো একমাত্র এই দলই আখ্যানভাগ এবং গীতিগুলি গান করে। 'যক্ষগণে'র বিশেষ ঢোলটি এতে থাকে না। বস্তুত, মন্দিরা ছাড়া আর কোনো যন্ত্র থাকে না। সংলাপ থাকে (যা প্রায়ই লিখিত), অভিনেতারা এই সংলাপ শুধু বলে। গায়কদলের নেতা ভাগবতের মতো ঐ স্বগতোক্তিগুলি চলার সময় মাঝে মাঝে মন্তব্য করে। পোষাক 'যক্ষগানে'র মতো জমকালো নয়, কিন্তু রাজা ও দেবতারা মুকুট ছাড়াও পাখার আকৃতির বাজু পরেন (আক্ষরিক অর্থে তার নাম হল 'বাহুমুকুট')। পৌরাণিক কাহিনীতে সমস্যা সমাধানের জন্য একটা ব্যাপার থাকে যাকে বলা যায় দৈব শক্তির মধ্যস্থতা। সংশ্লিষ্ট চরিত্র সাজঘর বা মঞ্চের দিক থেকে প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে সামনের দিক থেকে এবং বেশ দূর থেকে। ঢোলের বাজনা এবং মশালের আলো সহ এই শোভাযাত্রা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং চরিত্রটি দুই পায়ে লাফ দিয়ে মঞ্চে ওঠে (মঞ্চটি চার-পাঁচ ফুটের কম উঁচু নয়) এবং নেচেই চলে। নাটকের

শেষাংশে এটা হয়; এর দ্বারা এক রোমাঞ্চকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয় এবং এই অট্টরোলে নিশ্চয় প্রত্যেক দর্শক-শ্রোতা ঘুম ভেঙে উঠে বসে। এই নাট্যরূপের একটা সুবিধা এই যে, নাচ কমিয়ে একে সামাজিক আখ্যানেরও উপযোগী ক'রে নেওয়া যায়, এবং প্রায়শই স্থানীয় জনশ্রুতি বা ঘটনাকে নাট্যে রূপায়িত করা হয়। সমস্ত লোক-নাটকের মতো এতেও কোনো পর্দা এবং কোনো মঞ্চ-সজ্জা থাকে না এবং অভিনেতা মুখে ব'লে অথবা পরিক্রমা ক'রে দৃশ্য পরিবর্তন জানিয়ে দেন। 'যক্ষগানে'র মতো একজন কোড়াঙ্গী থাকে, কিন্তু সে সূত্রধার ও বিদূষক এই দুই ভূমিকাকে সম্মিলিত ক'রে এতে অভিনয় করে। প্রবেশ করা মাত্র প্রত্যেক চরিত্রকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়, এবং সে জমকালো ভাষায় সবিস্তার বিবরণ দেয়।

একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম উপকূলে আধুনিক কেরালা রাজ্যে ঐ রকমই বিখ্যাত এক নৃত্য-নাট্য আছে। তার নাম 'কথাকলি'। 'যক্ষগানে'র চেয়েও তা প্রাচীন। এ নৃত্য-নাট্যের মূল ভাবনা কোনো কাহিনী বা বিষয়ের রূপায়ণ ততটা নয় যতটা বীর-ভাব অর্থাৎ সাহস বা যোদ্ধ-মনোভঙ্গির প্রকাশ। শোনা যায়, বহুদূর দ্বিতীয় শতাব্দীতেই 'চাক্কিয়ার' নামক এক জাতি (সমাজের) এক ধরনের নাটক করত, যাকে বলা হত 'কুড্ডিয়ট্টম'। এ নাট্যরূপে নাটক তেমন থাকত না, যেমন থাকত 'মুদ্রা' সহযোগে বিভিন্ন আবেগের প্রকাশ। কবি, পণ্ডিত এবং রাজারা তাকে ক্রমে আরও 'উন্নত' করেন, এবং বোধহয় জনসাধারণের মেজাজের উপযোগী ব'লে যোদ্ধৃ-মনোভাব বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। 'যক্ষগানে'র সঙ্গে একটা পার্থক্য এই যে, এতে গানগুলি থাকে সাধারণত সংস্কৃত ভাষায়,

জনসাধারণের ভাষায় নয়। আশ্চর্যের বিষয়, যোদ্ধৃ-মনোভাব সত্ত্বেও 'কথাকলি' শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে ধর্মভাব জাগরণের সহায়ক ব'লে মনে করা হয়। এর বিষয়গুলি সাধারণত 'মহাভারত' থেকে নির্বাচন করা হয়। নৃত্যগুলিদ্বারা বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করা হয় এবং মুদ্রাগুলিদ্বারা তাদের অর্থ। মস্তকাবরণ বা মুকুট দেখতে অনেকটা দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরচূড়ার মতো, এ বাদে তা 'যক্ষগানে'র মুকুটের মতোই জমকালো ও বর্ণাঢ্য। 'কথাকলি'র বিকাশ ঘটে কবি, পণ্ডিত এবং রাজাদের হাতে এবং সম্পাদনরীতি সম্পর্কে তার বিশদ বিধিবিধান আছে। 'যক্ষগানে'র ক্ষেত্রে এরকম হয় নি। আমরা শুনতে পাই, সম্পূর্ণ সংস্কৃত নাটকও শুধু নৃত্য ও মুদ্রার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত। 'যক্ষগানে'র সঙ্গে 'কথাকলি'ও আজ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তো বটেই, এমন-কি অন্যান্য দেশেও গিয়ে পৌঁছেছে।

তেলুগু ভাষাভাষী অন্ধ্র অঞ্চলে 'হরিকথা'র অনুসরণে 'ভামা-কলাপম' নামক একটি অনুষ্ঠান জনপ্রিয় নৃত্য-নাট্যে বিকাশ লাভ করেছে। কাহিনীর বিষয় হল কৃষ্ণ এবং তাঁর কনিষ্ঠা (আদরিণী ?) পত্নী সত্যভামা। আবৃত্তিমূলক সংগীত ছাড়াও এতে প্রচুর নৃত্য আছে, যা বিভিন্ন আবেগকে প্রকাশ করে। এই জনপ্রিয় কাহিনী এক বিশিষ্ট নাটকীয় রূপে পরিণতি লাভ করে, জনপ্রিয়তার কারণও তার বিষয়। কৃষ্ণের সমস্ত পত্নীর মধ্যে সত্যভামাই সবচেয়ে ঈর্ষা-পরায়ণ, ক্ষণক্রোধী এবং কলহপ্রবণ। সেই সঙ্গে সে কৃষ্ণকেও তীব্র ভাবে ভালোবাসে। এই পরিস্থিতির জন্য বেশ সজীব ও হাস্য-রসাশ্রিত সংলাপ তৈরী হয়। মঞ্চে একটি তৃতীয়, বরং বলা যায় কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে। সে হল দূত। এ চরিত্রটি সংস্কৃত 'গীত-গোবিন্দে' রাধার সখীর মতো। এই দূত শুধু যে একজনের কাছ

থেকে অন্যজনের কাছে বার্তা বহন করে তাই নয়, যথেষ্ট রঙ্গ-রসিকতারও জোগান দেয়। 'যক্ষগান'ও এই অঞ্চলের আর এক ধরনের লোক-নাট্য, কিন্তু আমরা এখানে তা পুতুল-নাচ হিসেবেও পাই। পুতুল-নাচনদারকে বলা হয় সূত্রধার (আক্ষরিক অর্থ: যে সূতো ধরে থাকে); সে সংলাপ বাদে সমস্ত আবৃত্তির অংশটা একাই করে। সংলাপে কখনও কখনও আর একটি বা দুটি 'কণ্ঠ' তাকে সাহায্য করে। বিষয়বস্তু সাধারণত মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে নেওয়া হয়। 'যক্ষগান'কে অভিহিত করা হয় 'বায়ালতা' (মুক্তস্থানে অনুষ্ঠান) ব'লে। তাকে তেলুগুতে 'বীথি-নাটক'ও (রাস্তার নাট্যানুষ্ঠান) বলা হয়। 'বীথি-নাটকে' সংলাপ ছাড়াও থাকে কবিতা, গান এবং নাচ।

চার

উপরে যা বলা হল তাতে ঐ সব অঞ্চলের সব রকম লোকনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হল না। যেমন তেলুগু 'ভামা-কলাপমে'র সমতুল্য কান্নাড়া ভাষার (কর্ণাটক) এক লোক-নাট্য আছে যার নাম 'পারিজাত-আতা'। তেলুগু তার 'বারাকথা'য় পূর্বেকার আবৃত্তি-রূপ বজায় রেখেছে। এতে একজন নেতাকে সাহায্য করে, অন্য দুইজন যারা সংলাপ-অংশগুলি আবৃত্তি করে। এ ছাড়া আছে ছায়া-নাটক, পুতুল (কাঠ বা চামড়ায় তৈরী) নাচের অনুষ্ঠান এবং

অঙ্কিত চিত্রের অনুষ্ঠান, যাতে এক ভ্রাম্যমাণ বৈতালিক একটা বাক্সের মধ্যে ক'রে চিত্রগুলি বহন ক'রে নিয়ে চলে। আর আছে দেবতার বিশেষ পূজা বা কৃষি-উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠান ; পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তীর ঘটনা অবলম্বনে নিশ্চল মূক অভিনয়, যা শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়।

দক্ষিণের ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মতো উত্তরের অঞ্চলগুলিতেও আমরা এই যুগে লোকনাট্যের এক পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই। দক্ষিণের ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তরের এই সব ভাষার পার্থক্য এই যে এগুলি (বৈদিক) সংস্কৃত থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয়েছিল। অতএব এখানে সংস্কৃত মহাকাব্য এবং বৈদিক পুরাণের প্রভাব দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের নয়। বস্তুত, এই যুগেও সংস্কৃতে নাটক লেখা হত। বৈষ্ণবধর্ম ছিল ভক্তিধর্ম। শ্রোতৃমণ্ডলী যদি ভাষা বুঝতে নাও পারত, তবু সংগীত ও নৃত্য তাদের আকৃষ্ট করে রাখতে পারত। বেশির ভাগ সময় শ্রোতৃমণ্ডলী কাহিনীটি জানত। কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে কয়েকটি ভাষায় মূল সংস্কৃত থেকে মহাকাব্য এবং পুরাণ অনুবাদ করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যায় মহাভারতের এক ওড়িয়া অনুবাদ আছে বলে আমরা শুনেছি। সাধারণত, এগুলি অনুবাদ ততটা নয়, যতটা ভক্তিবাদ অনুসারে পুনর্লিখন। এই ভক্তিপ্রবণতার কারণেই আমরা এই যুগে নৃত্য-নাট্যের এমন প্রাধান্য দেখি। কিন্তু নৃত্যগুলি আঞ্চলিক ছিল। যেমন, উড়িষ্যায় নৃত্য-নাট্যের প্রাচীনতমরূপে আমরা পাই ছৌ নাচ। এই নাটককে বলা হয় 'দণ্ড-নট'। এতে নাচের মাধ্যমে শিব-পার্বতীর বিবাহ-কাহিনী বর্ণনা করা হয়। স্পষ্টতই, এটা ছিল এক ধরনের সমর-নৃত্য, যেহেতু শিব হলেন ধ্বংসের দেবতা। 'রঙ্গসভা' আর এক প্রকারের

লোক-নাট্য ; এতে কৃষ্ণের কাহিনী বলা হয়। 'পালা' নামে আর এক রকম লোক-নাট্য আছে, তার মাধ্যম নৃত্য ও আবৃত্তি।

কিন্তু যুদ্ধ, সমর-নৃত্য এবং বীরগাথা দক্ষিণে যেমন একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য, উত্তরে তা নয়। এর প্রধান কারণ এই যে, এ অঞ্চলে ভক্তিবাদই ছিল লোক-নাট্যের পক্ষে প্রেরণার প্রধান উৎস। শ্রীচৈতন্য (1486-1533 খ্রীস্টাব্দ) তৎকালে প্রচলিত লোকনাট্যের যাত্রা-আঙ্গিক গ্রহণ ক'রে তাকে দিয়েছিলেন এক নতুন শক্তি, এক নতুন আকর্ষণ এবং বিরাট খ্যাতি। জনসাধারণের কাছে ভক্তিবাদের প্রচার এবং জনসাধারণকে ভক্তিবাদে দীক্ষাদান ছিল তাঁর ব্রত। তিনি গান রচনা করতেন, বিতর্কের জন্য সংলাপ ব্যবহার করতেন এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তিনি নিজে এই সব যাত্রায় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যাত্রার আদি অর্থ হল শোভাযাত্রা (ধর্মীয়)। সাধারণত উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা হত এবং তাতে থাকত নর্তক, গায়ক এবং মূক অভিনেতা দল। এই ঘটনার জন্যই সম্ভবত কোনো এক অধ্যায়ে শব্দটির এক অর্থ দাঁড়ায় 'নাট্যাভিনয়'। যাত্রাভিনয়ে প্রধানত থাকত নাচ এবং গান ; এখন তাতে যুক্ত হল সংলাপ, তার মধ্য দিয়ে ভক্তিবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করার রেওয়াজ হল। প্রথমে এই সব যুক্তিতর্ক যথেষ্ট দীর্ঘ হত, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে গদ্য সংলাপকে গানের সঙ্গে যুক্ত করে একটা পরিবর্তন আনা হয়। তার আগে গদ্য-অংশ গানগুলির এক সুদীর্ঘ ভাষ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। দীর্ঘই হোক আর হ্রস্বই হোক, গদ্যের বাহনে বক্তব্য প্রকাশ এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার লোকনাট্যকে যাত্রাভিনয় প্রভাবিত করে।

কিন্তু বৈষ্ণবরা যে যাত্রাকে এত জনপ্রিয় করে তাও প্রথম আমলে প্রধানত আবৃত্তিমূলক ছিল। আমরা এখন নাটকীয় উপাদান বলতে যা বুঝি, তা ছিল একেবারে প্রারম্ভিক অবস্থায়। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মোপদেশ বা শিক্ষা প্রচার। প্রাথমিক অধ্যায়ে এটা করা হত মাঝে কিছু কিছু গান জুড়ে। অন্য অঞ্চলে 'হরিকথা' যেমন ছিল, এও ছিল তাই। কিন্তু যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব আবার নাট্যাভিনয়কে সংশ্লিষ্ট করল মন্দির এবং ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে। দক্ষিণ অঞ্চলে দেখা গেল থিয়েটার মন্দিরের উপর নির্ভর না ক'রে স্বাধীন হয়ে উঠছে। শুধু যে-ক্ষেত্রে কোনো ধর্মপ্রবণ রাজা মন্দির তৈরী করে শিল্পীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন, সেই ক্ষেত্রে তা মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হত। কিন্তু বৃত্তিভোগী অভিনেতাদল তাদের কর্মতৎপরতা কেবল মন্দিরেই সীমাবদ্ধ রাখত না। আগের যুগে উত্তর অঞ্চলেও আখ্যান-মূলক কবিতা নাট্যাভিনয়ে রূপান্তরিত হত এবং ভ্রাম্যমাণ বৈতালিকেরা যে-কোনো জায়গায় অনুষ্ঠান করত। আসামে 'ওজাপালি' নামে যে প্রাচীনতম নাট্যরূপ ছিল, তার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা এই রকমই ছিল ব'লে আমরা জেনেছি। প্রধান চরিত্র 'ওজা' কোনো পৌরাণিক কাহিনী আবৃত্তি করত এবং তারই মধ্যে মধ্যে অন্যদের সঙ্গে গদ্যে সংলাপ বলত। একটা সমগ্র দল সংগীতে ও নৃত্যে যোগ দিত। কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে 'ভাঁড়'রা ছিল ঐরকম ভ্রাম্যমাণ গায়ক-নর্তকের দল। কিন্তু আসামেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ও ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভে বৈষ্ণব যুগ এই লোক-প্রমোদের রূপে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। ঘটনা বর্ণনার পরিবর্তে ধর্মোপদেশ প্রচারই প্রধান হয়ে উঠল। এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন হতে থাকল। স্বভাবতই বিষয়গুলি কৃষ্ণ ও রামের কাহিনী থেকে নেওয়া

হত। প্রচারের প্রধান লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে এমন সব ঘটনাই নির্বাচন করা হত। শ্রীশঙ্করদেব এবং তাঁর শিষ্য মাধবদেব (ষোড়শ শতাব্দী) যে-সব নাটক লেখেন, তাদের কয়েকটির নাম থেকেই এটা বোঝা যায়, যথা—'রুক্মিণী-হরণ', 'কালীয়-দমন', 'পারিজাত-হরণ', 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম', 'শ্রীরাম-বিজয়' ইত্যাদি। লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, এই সাধুরা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়ায় তাঁদের নাটকগুলি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-বিধি অনুসারে রচনা করতেন। যদি আজ পর্যন্তও লোকনাট্য 'নাট্যশাস্ত্রে'র ঐতিহ্য পুরোপুরি অনুসরণ ক'রে এসে থাকে, তা হলে তার কৃতিত্ব বৈষ্ণবদের প্রাপ্য; তারা জনসাধারণের ভাষায় লিখত, কিন্তু লিখত 'নাট্যশাস্ত্র' অনুযায়ী।

পাঁচ

ভক্তিবাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে লোকনাট্যের সবচেয়ে বড় উপকার এই হল যে, জনসাধারণের সামাজিক জীবনে তার একটা স্থান হয়ে গেল। মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে থিয়েটার যখন তার নিজের জোরেই খোলা রাস্তার মোড়ে এল, তখন তা এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল। সাধুসন্তদের দেবতা কৃষ্ণ এবং রামের কাহিনীই শুধু বিষয়বস্তুর উৎস থাকল না। এই দেবতাদের কাহিনীর চেয়ে উপলক্ষ্যটাই থিয়েটারকে সক্রিয় ক'রে তুলল। দৃষ্টান্তস্বরূপ 50 বা 60 বছর আগে ফসলকাটার পর গ্রামে নাট্যানুষ্ঠান হওয়ার

প্রচলন ছিল। পরোক্ষভাবে তা ছিল কোনো এক অস্পষ্ট দেবতার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। সে-দেবতা হয়তো গ্রামের অধিষ্ঠাতা বা বৃষ্টির দেবতা বা হয়তো জননী বসুন্ধরা। আসল ব্যাপার এই যে, নাট্যানুষ্ঠানটাই এক ধর্মীয় অর্ঘ্য হয়ে দাঁড়াল। নাটকে কোনো ভূমিকার জন্য নির্বাচিত হওয়াকে মনে করা হত কোনো পুণ্যকর্মের পুরস্কার। প্রায়ই কোনো মায়ের একমাত্র ছেলে নাটকে ভূমিকা নিত। তার অভিনয়-ক্ষমতার জন্য সে এই কাজ পেত না, পেত এই কারণে যে, একাধিক পুত্র হারিয়ে তার মা দেবতার কাছে মানত করেছিল দেবতা যদি তাকে একটি দীর্ঘায়ু পুত্র দেন তা হলে গ্রামের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে সে তাকে দিয়ে একটা ভূমিকায় অভিনয় করাবে! বালকটি তখন নাটকের মহলার সময় উপোসও করত। অনুষ্ঠানটা হত সমগ্র গ্রামের এক যৌথ প্রয়াস। মেয়ে পুরুষ, বৃদ্ধ যুবক, বালক বালিকা সকলেই সাগ্রহে এই অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় থাকত। অনুষ্ঠানের দিনটা হয়ে যেত এক অঘোষিত ছুটির দিন। সন্ধ্যার মধ্যে প্রত্যেকেই তার ভালো কাপড়-চোপড় প'রে তৈরী হয়ে যেত। বৈষ্ণব নাটকগুলিই এই নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি সম্ভব করেছিল এবং এই আবহাওয়াই জনসাধারণের থিয়েটারকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আর একটা ব্যাপারও লোকনাট্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করেছিল। তা হল অভিনয়-শিল্পীদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। আমরা ইতিপূর্বেই দেবদাসীদের কথা উল্লেখ করেছি। কোনো মন্দিরে উৎসর্গ ক'রে এই নারী-শিল্পীদের জীবন-কর্মকে নির্বিঘ্ন করা হত। কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন শিল্পীদের একটা শ্রেণী হিসেবে রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করল সমাজ নিজেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তামিলনাড়ু

অঞ্চলে 'কুতাড়ি' নামে এক অভিনেতা-সম্প্রদায়ের কথা শোনা যায়। এরা ছিল সমাজেরই একটা জাত, এবং জাত সম্বন্ধে সেইকালের ধারণা অনুযায়ী অভিনয় এই সম্প্রদায়ের বংশপরম্পরাগত হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে এই জাতের প্রতি কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সমাজের উপর বর্তায়।

দেশের সর্বত্র লোকনাট্য কিন্তু এই যুগে 'নাট্যশাস্ত্রে'র একটি ঐতিহ্য উপেক্ষা করে। সে-ঐতিহ্য হল এই যে, নারী-ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় করবে। মুসলমান রাজত্ব এর জন্য দায়ী, এমন কথা বলতে পারি না। সুদূর দক্ষিণে তখনও মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেখানেও আমরা দেখি পুরুষরাই নারী-ভূমিকায় অভিনয় করছে, যেমন 'যক্ষগণে', 'কথাকলি'তে। মনে হয় আসল কারণ এই যে, এইসব শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে-নৃত্য, তা ছিল শক্তিব্যঞ্জক। বোধহয়, সাধুসন্তদের ধর্মীয় পটভূমিও অনুষ্ঠানে মেয়েদের সাহচর্য নিবারণ ক'রে থাকতে পারে। আমরা 'রুক্মিণী-হরণ' অনুষ্ঠানের উল্লেখ আগে করেছি, এই নাটকে নায়িকা রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয়করেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। দেবদাসীরা ছাড়া (উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে অভিনীত 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকে) অন্য স্ত্রীলোকরা নারী-ভূমিকায় অভিনয় করত না। শিল্পী ও অভিনেতৃদের একটা জাত উদ্ভূত হওয়ার পর তার প্রচলন হয়।

থিয়েটারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে এমন সব নাটক রচনা আরম্ভ হল যাদের বিষয়বস্তু মহাকাব্য বা পুরাণ থেকে সরাসরি নির্বাচিত নয় বা মহাকাব্য ও পুরাণ-কাহিনী অথবা ধর্মীয় কোনো কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ক্রমশ সংলাপের প্রবর্তন (কাব্যে এবং গদ্যে) নিশ্চয় সামাজিক বা সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে নাটক লেখায়

উৎসাহ জুগিয়েছে। যেমন আমরা শুনতে পাই পাঞ্জাবের ভ্রাম্যমাণ বৈতালিক 'ভাঁড়ে'রা আগ্রহোদ্দীপক সমসাময়িক ব্যাপারের শ্লেষাত্মক ভাষ্য ক'রে শ্রোতা-দর্শকদের আনন্দ দিত। কাশ্মীরের 'ভাঁড়ে'রা জন-সাধারণের চিত্তবিনোদন করত 'দরজা-পথের' অনুষ্ঠানের দ্বারা। এতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বা তাদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনা হত বিষয়বস্তু। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রের 'তামাশা' (যাতে লোক-নৃত্য, লোক-সংগীত এবং সংলাপ সবই থাকত) মানুষ এবং নীতিধর্ম সম্বন্ধে উপভোগ্য শ্লেষাত্মক অনুষ্ঠান জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করে। এ সবের পিছনের উদ্দেশ্য কিন্তু কোনোক্রমেই সাধুসন্তদের ধর্মীয় নাটকের বিপরীতমুখী নয়। শ্লেষের মধ্য দিয়ে শ্রোতা-দর্শকদের দেখিয়ে দেওয়া হত তাদের দোষত্রুটি এবং পরোক্ষভাবে তাদের বলা হত আরও সৎভাবে জীবন যাপন করতে। কর্ণাটকের সাধু কনক-দাসের একটি কাব্য-নাটক অত্যন্ত আগ্রহোদ্দীপক এক দৃষ্টান্ত। ঐ অঞ্চলের এক বিশেষ শস্যের সঙ্গে এটি সংশ্লিষ্ট। এই শস্যের নাম 'রাগি', এর রঙ কালো। সুতরাং অন্য শস্যেরা তাকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করে। অবশেষে, বিভিন্ন শস্যের মধ্যে তর্ক লেগে যায় কে সবচেয়ে ভালো। শেষপর্যন্ত ভগবান রামকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য ডাকা হয়। তিনি সকলকে দুই বছর মাটির নিচে লুকিয়ে থাকতে বলেন। দুই বছর শেষ হলে যখন তাদের খুঁড়ে বের করা হল তখন দেখা গেল 'রাগি' ছাড়া আর সব শস্য প'চে গিয়েছে। মন্তব্য সুস্পষ্ট। নাটকটির নাম 'রাম-ধান্য-নাটক' অর্থাৎ রাম এবং শস্যদের নাটক। এই নাটকটিতে মুখোশ ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা তাই ভাবি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পৌঁছে আমরা দেখি লোক-নাট্য সংস্কৃত

নাটককে হটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলেছে। মঞ্চের উদ্ভব হয়েছে যে-কোনো রাস্তার মোড়ে; একটা শ্রোতৃমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে; নর্তক, গায়ক এবং অভিনেতারা এক পেশাদার জাতে পরিণত হয়েছে; সাধুসন্তরা এবং 'হরিকথা'র শিল্পীরা তাকে 'নাট্যশাস্ত্রে'র পদ্ধতি-প্রকরণ দিয়েছে; এবং চিরাচরিত বিষয়বস্তু ছাড়া সমসাময়িক মানুষ ও জীবনযাত্রাও নাটকে স্থান পেয়েছে। আমরা একমাত্র এই অভিযোগ করতে পারি যে, সেই সময়কার কোনো নাটক লিখিতরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার আগেকার শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখার প্রয়োজনই বা কি ছিল? সংগীত, কবিতা এবং নৃত্য পুরুষানুক্রমে চ'লে আসত এবং গদ্য-ভাষ্যটা অভিনেতারা সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে নিতেন।

নতুন থিয়েটারের সন্ধানে

এক

মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় এবং আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের অভ্যুদয় প্রায় একসঙ্গেই ঘটেছিল। এটা নিছক সমকালীন ঘটনার এক আগ্রহোদ্দীপক কাকতালীয় যোগাযোগ নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। আমরা দেখেছি, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লোকনাট্যই সক্রিয় ও প্রগতিশীল ছিল। এক হাজার বছরের সুদীর্ঘ সময়ে আর কোনো কালিদাস বা ভবভূতি ভারতবর্ষে জন্মান নি। এটা ব্যাখ্যা করা সহজ, কিন্তু যুক্তিতর্কে সমর্থন করা কঠিন। সংস্কৃত ভাষার ভাঙন এবং পরিবর্তমান ধ্যানধারণা ও অগ্রগতির প্রবণতা প্রকাশ করতে পারে এমন কোনো ভাষার অনুপস্থিতি একটা কারণ হিসেবে ধরা যায়। দেশের বুদ্ধিজীবীরা করুণভাবে সংস্কৃতকে আঁকড়ে রইলেন এবং মোগলশক্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন ফার্সী আর আরবীর দিকে। জনসাধারণের ভাষায় যা-কিছু বলা হত বা লেখা হত, তার লক্ষ্য ছিল প্রধানত অশিক্ষিতেরা। বিদ্বানেরা ক্রমেই বেশি ক'রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তনে ও স্থাপনে ব্যাপৃত হলেন, এবং সংস্কৃত ভাষা তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হল। রাজাদের দরবারে কবি এবং লেখকেরা বেশি সম্মান পেতেন সংস্কৃত

এবং আঞ্চলিক ভাষায় তাঁদের জ্ঞানের জন্য। সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে শিল্প-বিষয়ে আগ্রহবোধ করতেন না। যে বিদ্যারণ্য এবং রামদাস বিজয়নগর এবং মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রেরণা দিয়েছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত অতীতের সমস্ত সাধুসন্তের চেয়ে রাজনীতিতে বেশি আগ্রহান্বিত ছিলেন, এ থেকেই অবস্থাটা কিরকম দাঁড়িয়েছিল বোঝা যায়। বিজয়নগর সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও পর্যন্ত বৈদিকগ্রন্থের ভাষ্য লিখবার জন্য একজন শঙ্করাচার্যকে খুঁজে পাওয়া সহজতর ছিল একজন কালিদাসকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে। বিভিন্ন ভাষার কবিদের সম্মান করা হত তাঁদের সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের জন্য এবং আঞ্চলিক ভাষায় সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য অনুবাদ করার জন্য। মনে হয়, ভক্তিবাদের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত লোকনাট্যের অভ্যুদয় এবং জন-প্রিয়তা যেন থিয়েটারকে 'নিম্নশ্রেণীর' জনসাধারণের শুধু এক অবসর-বিনোদন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অনুসন্ধানের ফলেও কোনো রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা আঞ্চলিক ভাষায় কোনো কবির নাটক এখনও আবিষ্কার করতে পারা যায় নি। বর্তমান লেখক প্রাচীনতম যে-দৃষ্টান্তের কথা জানেন, সেটি হল 1696 খ্রীস্টাব্দে একজন সেনা-নায়কের লেখা কান্নাড়া ভাষার এক নাটক। ঐ সেনানায়কের নাম সিঙ্গারার্য, তিনি সিকদেবার্য নামক এক ক্ষুদ্র নৃপতির অধীনে কাজ করতেন। নাটকটির নাম 'মিত্রাবিন্দগোবিন্দ'। এই অতি সাধারণ নাম সত্ত্বেও সেটি আসলে ছিল রাজা হর্ষের (প্রায় 630 খ্রীস্টাব্দ) সংস্কৃতে 'রত্নাবলী'র নিছক অনুবাদ। অনুবাদকর্মের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য নেই ; সেটা একটা বাঁধাধরা কার্যক্রম, যার খাতে সাহিত্য অগ্রসর হয়ে চলে। কিন্তু মূল গ্রন্থের নির্বাচন তাৎপর্যপূর্ণ হতে

পারে। এই যুগে ছুটি সংস্কৃত নাটক বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। কৃষ্ণমিশ্র যাতির 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটক বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী ও তেলুগুতে অনূদিত হয়েছে। অন্য নাটকটি হল 'চণ্ড-কৌশিক', এটি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নামে অসমীয়া, গুজরাটী, হিন্দী, কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী অনুবাদে পাওয়া যায়। 'হনুমান-নাটক' নামে একটি সংস্কৃত নাটক সেই 1630 খ্রীস্টাব্দেই পাঞ্জাবীতে অনূদিত হয়। এটা খুবই সম্ভব যে, অন্যান্য ভাষাতেও এইসব নাটকের অনুবাদ হয়েছিল, কারণ কতকগুলি ভাষায় আমরা মঞ্চে এই সব নাটকের সাক্ষাৎ পাই, যদিও লিখিত রূপে তাদের পাওয়া যায় না। এই সব সংস্কৃত নাটক যে শুধু অনেক পরের যুগে লেখা হয়েছিল তাই নয়, ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের তুলনায় এগুলির কোনো গুণই নেই। মনে হয় যেন এগুলি সেই সময়কার লোকনাট্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। এগুলি সংস্কৃতে লেখার কারণ, লেখকেরা সংস্কৃতের উপর তাঁদের দখল দেখাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং সেই সঙ্গে 'সাহিত্যিক কৌশল' প্রয়োগের কায়দা (প্রয়োগটা বেশির ভাগ সময় অপপ্রয়োগই হ'ত)। একটা চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রামের কাহিনী নিয়ে রচিত 'হনুমান-নাটকে' সীতা-স্বয়ম্বরের দৃশ্য আছে : হরধনুতে জ্যা রোপণের পরীক্ষাদ্বারা সীতা তাঁর পতি নির্বাচন করবেন। ছুর্মতি রাবণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে, কিন্তু তার শক্তি প্রদর্শনের আগে সে কন্যাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তবে তাকে প্রথমে ধনুতে জ্যা-রোপণ করতে বলা হয়। 'কন্যা' এবং 'ধনু' রাশিচক্রের বারোটি রাশির মধ্যে ছুটির নামও বটে। 'কন্যা' ষষ্ঠ এবং 'ধনু' নবম রাশি। সুতরাং রাবণ বলে 'ধনু'র আগে 'কন্যা'র আসা উচিত। তখন সে এই উত্তর পায় :

"নক্ষত্র-কুশলো ভবন্।"

'তুমি নক্ষত্র সম্বন্ধে কুশল (বিশেষজ্ঞ)।' কিন্তু ছত্রটির এই অর্থও হয়: 'তুমি কুশল ক্ষত্রিয় নও, ('ন' অর্থাৎ 'নও', 'ক্ষত্র-কুশল' অর্থাৎ 'যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ')। সংস্কৃত নাটক বহুদিন কোনো অর্থেই আর 'নাটক' ছিল না। লোকনাট্য যদি শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করতে এবং সেই সঙ্গে তাকে নৈতিক শিক্ষা দিতে চায়, তা হলে 'চণ্ড-কৌশিক' এবং 'হনুমান-নাটক' দিয়েই কাজ চলতে পারে। গ্রন্থকারের পক্ষে অন্যভাবে তার নৈপুণ্য প্রয়োগের প্রচুর সুযোগ থাকে। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে'র জনপ্রিয়তার কারণ সহজে বোঝা যায়। তা ছিল প্রত্যক্ষ নৈতিক উপদেশ প্রচার, কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রাম্য শ্রোতা-দর্শকদের রুচির উপযোগী রঙ্গরসিকতা জোগাতে সমর্থ। আগের পরিচ্ছেদে দুটি ছত্রে তা দেখানো হয়েছে।

দুই

অধঃপতনের যুগের সংস্কৃত নাটকের বিরুদ্ধে সফল প্রতিযোগিতার জন্য কালিদাস, ভবভূতি এবং তাঁদের সমধর্মীদের আরও প্রায় এক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে সমগ্র জাতির এবং জনসাধারণের ভবিষ্যৎ প্রভাবিত ক'রে বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটছিল। আওরঙ্গজেবের পর (1707 খ্রীস্টাব্দ) মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বণিকরূপে যে-সব ইওরোপীয়

এদেশে নামে, তাদের মধ্যে বৃটিশ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি সফল প্রতিযোগী হিসেবে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করল। তাদের লোভ এবং তৎকালীন স্থিতিহীন রাজনৈতিক অবস্থা, এই দু'য়ের সমন্বয় তাদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। ইওরোপে সাত বছরের যুদ্ধের পর বোঝা গেল যে ভারতবর্ষে অবশিষ্ট ইওরোপীয় শক্তি (ফ্রান্স) ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে আর গুরুতর বাধা হবে না। মারাঠা সাম্রাজ্যরূপে শেষ শক্তিশালী ভারতীয় প্রতিরোধ (অন্তত উত্তর-ভারতে) অন্তর্হিত হল যখন আহমদ শাহ্ আবদালি পানিপথে মারাঠা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করলেন। রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনী ছাড়াও বৃটিশ রাজ-কর্মচারীদল ভারতবর্ষে আস্তানা গাড়ল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজনে কোম্পানির ডিরেক্টররা ভারতীয়দের শিক্ষিত করতে এবং ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে বাধ্য হলেন।

ভারতবর্ষের মতো যে-দেশে সহস্রাধিক বছরের ঐতিহ্য অনুযায়ী জাতের দ্বারা চিহ্নিত না হলে কোনো মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে বৃটিশ আধিপত্যের ফলে বলতে গেলে দুটি নতুন জাতের সৃষ্টি হল। গাত্রবর্ণ ও সামাজিক প্রথার পার্থক্য এবং বিজিতের প্রতি বিজেতার স্বাভাবিক অবজ্ঞা বৃটিশ বাসিন্দাদের এক নতুন কিন্তু উচ্চতর 'অস্পৃশ্য' (ম্লেচ্ছ) জাতে পরিণত করল। সেই সঙ্গে নবশিক্ষিত ভারতীয়রাও অন্য ভারতীয়দের পরিপ্রেক্ষিতে আর এক 'অস্পৃশ্য' জাতে পরিণত হল। এক শতাব্দী ধ'রে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এই দুই নতুন 'জাতে'র মধ্যে নীরব সংগ্রামের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। শিক্ষিত ভারতীয়েরা

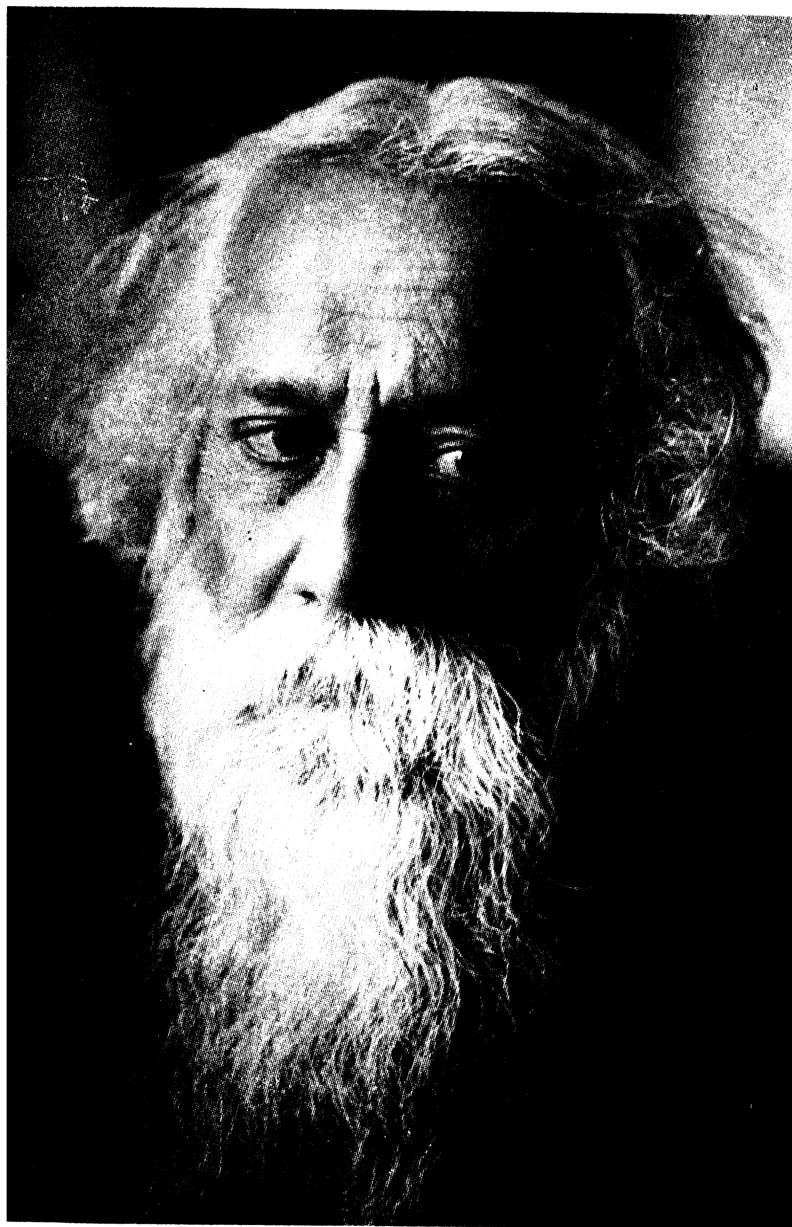
তাদের বিদেশী বিজেতাকে ভয় করত, তোষামোদ করত, ঘৃণা করত, শ্রদ্ধা করত, অনুকরণ করত এবং তার আজ্ঞা পালন করত। এই দুই দলের সংঘর্ষ থেকে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের জন্ম হয়।

কখন এবং কিভাবে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের বীজ বপন করা হয় তা সঠিকভাবে নির্দেশ করা কঠিন। তবে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে জমি তৈরী হচ্ছিল। নতুন শিক্ষার পিছু-পিছু দুটি জিনিষ আসে। একটি হল নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, ভারতীয়দের মধ্যে এমন এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব; অন্যটি হল এক নতুন শহুরে লোকসমষ্টির অভ্যুদয়। চিরাচরিত সাংস্কৃতিক জীবন থেকে বঞ্চিত অথচ বিজেতাদের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণে নিবৃত্ত এই নতুন শহুরে বাসিন্দারা এক ধরনের শূন্যতায় ভুগতে থাকে। বিদেশীরা শুধু কৌতূহলের নয় শ্রদ্ধারও পাত্র ছিল। তারা যে সংখ্যায় এত অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এত বেশি সংখ্যাকে পরাজিত করেছিল, এই ঘটনাটাই তারা যা-কিছু করত যা-কিছু ভাবত যে-ভাবে জীবন ধারণ করত, তাতে একটা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে। অনুকরণের ইচ্ছা অপরিহার্য ছিল। এই ইচ্ছাই অল্পদিনের মধ্যে এমন একটা কাজ করতে আমাদের উৎসাহিত করে যা আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ইংরেজরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক আগে বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করে। সুতরাং ভারতীয়দের নব-শিক্ষিত শ্রেণী বাংলাদেশেই প্রথম জন্ম নেয়। ভারতীয়দের কোনো কিছুর সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ইচ্ছা ইংরেজদের ছিল না এবং তারা অস্থায়ী 'ঔপনিবেশিক' ছিল ব'লে এখানে স্থায়ীভাবে বাস

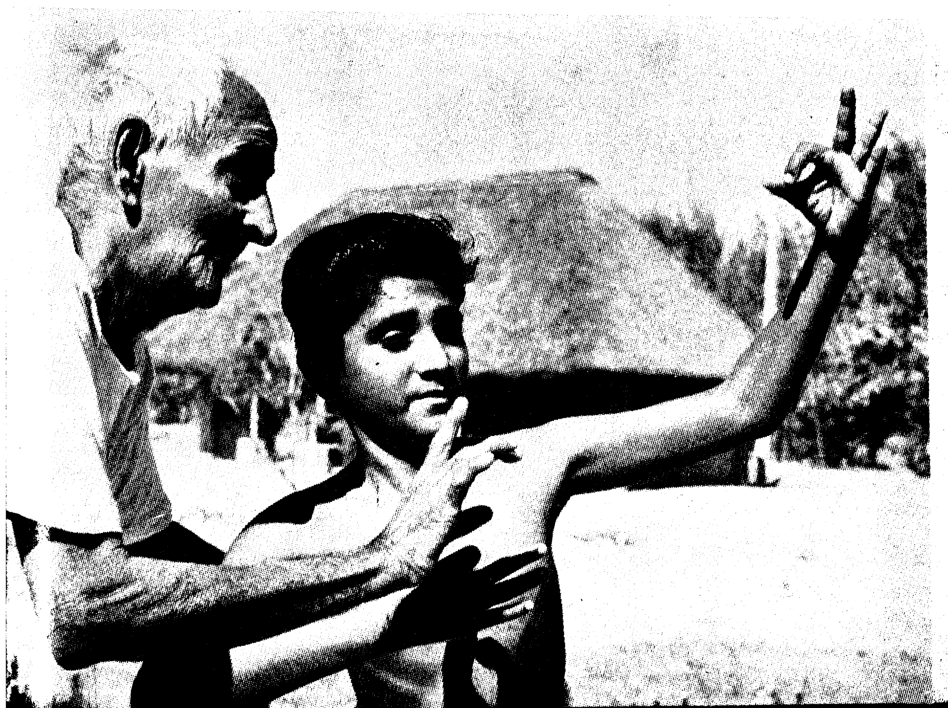


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন'-এর একটি দৃশ্য (শিষ্য জয়সিংহের আত্মোৎসর্গে স্তম্ভিত রঘুপতি। রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ)—১৮৯২।



চিত্র ১৮—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র ১৯—কথাকলি-গুরু কিশোর ছাত্রকে হস্ত-মুদ্রা শেখাচ্ছেন।





ক'রে পরিবার প্রতিপালনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ; এই কারণে 'দেশের' জন্য তাদের আকুলতা সব সময়ই প্রবল ছিল। এমন-কি, নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্যও তারা 'স্বদেশী' জিনিষের উপর নির্ভর করত। সুতরাং থিয়েটার সম্পর্কেও আমরা কল্পনা করতে পারি যে, তারা হয় নিজেরাই ইংরেজী নাটক অভিনয় করত, নয় 'দেশ' থেকে আগত কোনো অভিনেতৃ-দলের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত (অবশ্য এটা এত সহজ ছিল না যে ঘন ঘন হতে পারত)। স্বভাবতই, নব-শিক্ষিত ভারতীয়দের পক্ষেও এই সব অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল না। এর ফলে তাদের কৌতূহল আরো তীব্র হত এবং তারা পরোক্ষভাবেও ঐসব অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত সব কিছু জানার চেষ্টা করত। কি রকম নাটক দেখানো হত? কিভাবে অভিনয় করা হত? কোনো এক সময়ে তারা নিশ্চয় সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। অনুকরণের স্পৃহা তখন বাস্তবে রূপায়িত করার মতো প্রবল হয়ে ওঠে।

বিশেষভাবে নির্মিত এক শহুরে থিয়েটারে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত দুটি অভারতীয় কমেডির প্রথম প্রযোজনাকে এই পটভূমিতেই বুঝতে হবে। হেরাসিম লেবেডেফ নামক এক রুশ ভাগ্যান্বেষী এবং গোলকনাথ দাস ইংরেজী থেকে দুটি কমেডি অনুবাদ করেন, একটির নাম 'ডিসগাইজ', অন্যটির নাম 'লাভ্ ইজ দি বেস্ট ডক্টর'। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের পক্ষে 7 নভেম্বর 1795 এক ঐতিহাসিক দিন। ঐদিন উক্ত কমেডি দুটি প্রযোজিত হয়। লেবেডেফ যা করেছিলেন তা তাঁর ভারতীয় থিয়েটার-প্রীতির জন্য করেছিলেন, না তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষের জন্য, সে আলোচনা অনাবশ্যক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, তাঁর

উদ্যমের জন্য নাচগান ছাড়া এক নাটক, ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগহীন এক নাটক, এমন এক নাটক যা পরোক্ষভাবে হলেও উপদেশ ও নীতি প্রচারে প্রযুক্ত, শ্রোতৃমণ্ডলীর নজরে নিয়ে আসা হয়। দ্বিতীয়ত, নিছক বাঙালী শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দের জন্য কয়েকটি দেশীয় বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করা হয় এবং কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কয়েকটি কবিতা নেওয়া এবং তাতে স্বর দেওয়া হয়। নতুন আধুনিক ভারতীয় নাটক এইখানেই তার প্রথম আকার নেয়।

তিন

আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা থিয়েটার স্থাপনে লেবেডেফের প্রথম প্রয়াসের সাফল্য সত্ত্বেও পরবর্তী চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর 'নাটকীয়' কিছুই ঘটে নি। তবু একটা বিরাট আলোড়ন বাইরে ফেটে বেরোবার জন্য নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে টগবগ করছিল। আমরা দেখতে পাই, এই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধ'রে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার শুধু যে শিকড় গাড়ছে তাই নয়, এক বিরাট পদক্ষেপের জন্য শক্তি সংহত করছে। এই দুই পরিণতির মূলে ছিল দুইটি জিনিষ। একটি হল ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, যার ফলে আমরা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই এবং সেই সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের মহাকাব্য ও ধ্রুপদী নাটকের উত্তরাধিকারের প্রতি আনুগত্য পুনরুজ্জীবিত হয়। অন্য কারণটি হল এক নতুন

সামাজিক চেতনা, যা আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা ধর্মপ্রচারকের উৎসাহ নিয়ে জাগ্রত করেন। এই সংস্কারকদের বলা যায় আধুনিক ভারতবর্ষের ঋষি। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, সতী-দাহ এবং অনুরূপ অনেক প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালানো হয়। ভারতীয় রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের অনেক বছর আগেই সমাজ-সংস্কারকেরা ক্ষতিকর প্রথা ও রীতিনীতি এবং অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কারের শৃঙ্খলমোচনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ইংরেজীশিক্ষার ফলে পরিবর্তিত এবং পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গিই 1831 খ্রীস্টাব্দে প্রথম খাঁটি বাঙালী থিয়েটার— হিন্দু থিয়েটার— প্রতিষ্ঠার মূলে। এবারও বাংলাদেশেই এটা ঘটে। জনৈক প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর এই থিয়েটার স্থাপন করেন। এখানে ভারতীয়েরাই ইংরেজী নাটকের প্রযোজনা করেন। একটা নাটক ছিল শেক্স্‌-পীয়ারের ‘জুলিয়াস সীজার’ এবং অন্যটি ছিল ভবভূতির সংস্কৃত নাটক ‘উত্তর-রামচরিতে’র উইলসন-কৃত ইংরেজী অনুবাদ। পরবর্তী কয়েকবছর বহু থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং ইংরেজী নাটক অভিনয় করে। কাদের জন্য এইসব নাটক প্রযোজনা করা হয়? ইংরেজরা দেশীয় লোকদের এই সব নাট্যানুষ্ঠান দেখবার জন্য আসত, এটা কল্পনা করা অসম্ভব। আর ইংরেজী জানা ভারতীয়দের সংখ্যা নিশ্চয় এত ছিল না যে তাদের আনুকূল্যে এইসব থিয়েটার টিকে থাকতে পারত। অথচ এই ধরনের নাট্যানুষ্ঠান হত। এর তাৎপর্য স্পষ্ট। নতুন এক শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্ভব হচ্ছিল এবং নতুন এক থিয়েটারের জন্য সন্ধান শুরু হয়ে গিয়েছিল। বলা যায়, বিজেতাদের নাটকের উপর দাসমনোভাবসুলভ এই নির্ভরতার প্রতিক্রিয়ায়, আর-

এক ধরনের থিয়েটার স্থাপিত হয় 1833 খ্রীস্টাব্দে। সেখানে শুধু বাংলা নাটকেরই প্রযোজনা হত। কিন্তু লেবেডেফের থিয়েটার যেমন একটা রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয় নির্মাণের কথা ভেবেছিল, এই থিয়েটা ত ভাবে নি ; এই থিয়েটার তার নাটকগুলি জনৈক নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে মঞ্চস্থ করে।

প্রায় এই সময়েই মহারাষ্ট্রের দক্ষিণপ্রান্তে সাংলি নামক এক স্থানে ঐ রকমই এক ব্যাপার ঘটছিল। 1843 খ্রীস্টাব্দে সাংলির রাজা এক 'দশাবতার' (যক্ষগান) নাটকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নাটকের গঠনে মুগ্ধ হন, যদিও তার উপস্থাপনার স্থূল পদ্ধতিগুলি তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। জিনিষটা 'দেশীয়', কিন্তু যথেষ্ট উৎকৃষ্ট। রাজা যে-সব ইংরেজী নাটক নিশ্চয় দেখেছিলেন, চিত্ত-বিনোদন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একে তাদের সঙ্গে ভালোভাবেই তুলনা করা চলে। শিল্প-প্রীতির জন্যই হোক বা দেশাত্মবোধের জন্যই হোক বা বিদেশী বিজেতাদের পরোক্ষে খোঁচা দেবার ইচ্ছাতেই হোক, তিনি এই নাট্যরূপকে গ্রহণ ক'রে পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা তার উন্নতি সাধনের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি জনৈক বিষ্ণুদাস ভাবেকে এই কাজের ভার দেন এবং তাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। বিষ্ণুদাস 'সীতা স্বয়ম্বর' নামে এক পৌরাণিক নাটক প্রস্তুত করেন এবং 1843 খ্রীস্টাব্দে সপারিষদ রাজার সম্মুখে তা মঞ্চস্থ করেন।

> নাটকটির মঞ্চসজ্জা খুবই অনাড়ম্বর ছিল। একটি লাল কাপড়ের টুক্‌রো পিছনে টানানো হত, আর থাকত কয়েকটি কাঠের সরঞ্জাম। নাটকের আদ্যন্ত উপস্থিত থাকত সূত্রধার, তার সঙ্গে থাকত গায়ক এবং বাদক দল। পশ্চাৎ-যবনিকার সম্মুখে অভিনেতাদের ডানদিকে একটি কোণে ছিল তার স্থান।

দেবতাদের বন্দনা-গীতি দিয়ে নাটক আরম্ভ করা হত। প্রথমে প্রবেশ করত বিদূষক, তার উষ্ণীষে সবুজ পাতা বাঁধা থাকত, ফলে তাকে এক বন্যপ্রাণীর মতো দেখাত। বিদূষকের সঙ্গে সূত্রধার হাস্যোদ্দীপক উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হত এবং অনুষ্ঠানে তার সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করত। অতঃপর দেবতা গণপতি প্রবেশ করতেন এবং সূত্রধারকে আশ্বাস দিতেন যে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হবে। তার পর বিদ্যাদেবী সরস্বতী কাঠের ময়ূরের উপর নাচতে নাচতে প্রবেশ করতেন। গণপতি এবং সরস্বতীকে গন্ধর্ব ও কিন্নরেরা নৃত্যগীতে পরিতৃপ্ত করত। গণপতি এবং সরস্বতীর প্রস্থানের পর সূত্রধার কাহিনীর একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিত, তার পরই নাটক আরম্ভ হয়ে যেত। প্রত্যেক দৃশ্যের আরম্ভেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। যে-সব ঘটনা অভিনয় করা হবে সেগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে সূত্রধার একটি গান গাইত এবং অভিনেতারা সংলাপ বলত। সংলাপ আগে থেকে লিখে রাখা হত না, শুধু মোটামুটি ঠিক ক'রে রাখা হত। বিদূষক সহ কয়েকজন প্রধান অভিনেতাকে ধরাবাঁধা ছকের বাইরে যাবার বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হত।

অভিনেতাদের উপর সূত্রধারের সদাজাগ্রত প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকত। সে সংলাপ এবং গতিবিধির সম্পর্কে তাদের পরিচালিত করত। দানব ছাড়া অন্যসব চরিত্র দৃশ্যের আবহাওয়া অনুযায়ী গান গাইত। সূত্রধার এবং কোরাসের লোকেরা শুধু যে যন্ত্র বাজাত তাই নয়, গানেও প্রায়ই যোগ দিত। দানবদের প্রবেশ ছিল এক হট্টগোলের ব্যাপার,

সেই সঙ্গে দেখবার মতো দৃশ্যও বটে। মশালের আলো পড়লে লাল রঙ মাখানো অমানুষিক ঐ-সব চরিত্রের মুখগুলি হিংস্র দেখাত।

'মারাঠী থিয়েটার' 1843-1960, পপুলার বুক

সৌভাগ্যের বিষয় এই নাট্যানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানই মারাঠী থিয়েটারের রূপরেখার গোড়া পত্তন করে। 1925 সালে মারাঠী থিয়েটার তার গৌরবের শিখরে পৌঁছয়। বিদূষকের বাক্যের স্বাধীনতা এবং দানবদের রূপসজ্জা 'যক্ষগণে'র প্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু বিভিন্ন অভিনেতাদের গান গাওয়া ঐতিহ্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সরস্বতীর ময়ূর ; এই প্রথম শ্রোতৃমণ্ডলীর দেখবার জন্য কিছু প্রবর্তন করা হয়। অন্য দুটি ব্যাপারও লক্ষণীয়। ঐতিহ্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং অনুষ্ঠান করা হচ্ছে এক নির্বাচিত ও কৃত্রিম-মনোভাবাপন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে। পশ্চিমী থিয়েটারের সঙ্গে সংস্পর্শের প্রভাবে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নাটক লেখা হচ্ছিল, বিশেষভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীর নতুন শ্রেণীর কথা মনে রেখে। লেবেডেফের থিয়েটারে সুরেবাঁধা কবিতা এবং সাংলির নাট্যানুষ্ঠানে গান গাওয়া থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, এইসব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল এমন এক নাট্যরূপের উদ্ভাবন যার মধ্যে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতাকে সুষমভাবে যুক্ত করা যাবে।

ঐতিহ্য এবং আধুনিকতাকে সংযুক্ত করার এই চেষ্টা খুব আগ্রহোদ্দীপক। বাংলাদেশে লেবেডেফের থিয়েটার নতুন শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে উপযুক্ত নাটকের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শ্রোতৃমণ্ডলী

চাইছিল ভালো নাটক। অনুবাদ হোক বা মৌলিক হোক কিছু আসে যায় না, কিন্তু তা যেন চিরাচরিত নৃত্যগীতিভিত্তিক পৌরাণিক নাটক না হয়। নতুন ধারণা-ভাবনার আলোচনা চলছিল ; শিক্ষার ফলে তারা এমন সব বিষয়বস্তুতে আগ্রহবোধ করছিল যা তাদের নতুন মর্যাদাকে মূল্য দিতে পারে। ইংরেজীতে শেক্‌স্‌পীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্মানে অভিষিক্ত করে ; বাংলাতে শেক্‌স্‌পীয়ার আরও ভালো হবে, কারণ মূল ইংরেজীতে যা তারা বুঝতে অক্ষম, তারা তখন তা উপভোগ ও আলোচনা করতে পারবে। সুতরাং আমরা যখন 1852 খ্রীস্টাব্দে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' বাংলায় অনূদিত ও অভিনীত হ'তে দেখি, তখন বিস্মিত হই না। বাংলা নাম হয়েছিল 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' ; রূপান্তরিত করেছিলেন জনৈক হরচন্দ্র ঘোষ। এর একবছর আগে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত -লিখিত 'কীর্তিবিলাস' নামক একটি নাটক প্রযোজিত হয়। ইংরেজী ট্র্যাজিডির আদর্শে রচিত বাংলায় সেই প্রথম ট্র্যাজিডি। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক। এটি মঞ্চস্থ হয় 1857 খ্রীস্টাব্দে। তার আগে 1852 খ্রীস্টাব্দে তারাচরণ শিকদার লেখেন 'ভদ্রার্জুন', এ নাটক অভিনীত হয় নি। ইংরেজী আদর্শের প্রতি শিক্ষিতদের অনুরাগ নিশ্চয় অন্যদের মনে আমাদের নিজেদের ঐতিহ্যে যা উৎকৃষ্ট তার প্রতি সম্ভ্রম এবং তাকে আবার আশ্রয় করার মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এই শতাব্দীর পর এই প্রথম আমরা দেখি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' অসমীয়া ভাষায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে) এবং বাংলা ভাষায় (1857 সালে) অনূদিত হল। প্রায় ঐ একই সময়ে ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার' এবং কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়', এই দুটি সংস্কৃত

নাটকও বাংলায় অনূদিত হয়। নতুন ধরনের নাটক লেখার মূলে দ্বিতীয় যে একটা কারণ:ছিল তার উল্লেখ আমরা একটু আগে করেছি। কয়েকজন পণ্ডিত এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যে সমাজ-সংস্কার প্রচার করছিলেন, সেটাই হ'ল এই দ্বিতীয় কারণ। প্রথম যে-নাটকে এইসব নতুন ভাবনা-ধারণা প্রকাশ পায়, তা হ'ল এক বাংলা নাটক: 1854 খ্রীস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। বহুবিবাহ সমস্যা ছিল তার বিষয়বস্তু। তখনও সমাজসংস্কার আন্দোলন আধুনিক-শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অনতিবিলম্বে তা অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়ে এবং নাট্য-আন্দোলনকে পৃথক কিন্তু সতেজ-ধারায় অগ্রসর হ'তে অনুপ্রাণিত করে।

1853 সাল দুটি জিনিষের জন্য উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল 'ইন্দর সভা' নামক উর্দু নাটক। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র সভা-কবি আমানত এটি লেখেন। সমস্ত নাটকটাই পদ্যে, বিভিন্ন ছন্দের স্তবকে এবং গানে। লক্ষ্ণৌতে এই নাটক প্রযোজিত হয়। এটি একাধারে গীতিনাট্য এবং পরিচ্ছদ-নাট্য, যাতে পরীরা বিভিন্ন রঙের পোষাক প'রে আসে। কোনো বিষয়বস্তু ছিল না, কোনো বক্তব্যও ছিল না ; কিন্তু সুরেলা গান, এবং জমকালো দৃশ্যের এমন আবেদন ছিল যে, এই নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে অন্য অনেকেই তাদের নিজের নিজের 'ইন্দর সভা' লিখতে 'অনুপ্রাণিত' হয়। ঐ বছরের অন্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল প্রথম নাটকীয় ক্লাব পার্সী নাটক-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের উপর এই দুই ঘটনার অভিঘাত আরও দুই দশক পরে টের পাওয়া যায়।

চার

1857 খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজয় হয় রণক্ষেত্রে। কিন্তু জয় হয় জনসাধারণের, যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাতিত্ব জিনে নেয়। বৃটিশরাজের পুলিস যদি ভারতবর্ষকে প্রশাসনিক ঐক্য দিয়ে থাকে (যেমন বলা হয়), তা হলে বিনা অতিরঞ্জনে বলা যায় যে, ভারতীয় থিয়েটার জাতীয় ঐক্য গ'ড়ে তুলেছে। নইলে 1857-এর পর প্রায় দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র একই ধারায় নাট্যতৎপরতার প্রবল উৎসার ব্যাখ্যা করা যায় কি ক'রে? তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল এই যে, বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব বেশি সক্রিয় ছিল এবং তারাই এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। নাট্যকারেরা একদিকে প্রাচীন গৌরব-গাথায় ফিরে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে সমসাময়িক অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন। নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে এবং তারই পিছু পিছু তৈরি হচ্ছিল নাট্যালয়। বোম্বাইতে ভারতীয়দের নিজেদের চেষ্টায় একটি থিয়েটার ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছিল, তারপর অল্পদিনের মধ্যে অন্য আরও থিয়েটার নির্মিত হয়। 1872 সালে কলকাতায় সর্বসাধারণের এক থিয়েটার নির্মিত হয়। তার নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। মারাঠী নাটকের পথিকৃৎ বিষ্ণুদাস ভাবে বোম্বাইতে তখনকার একমাত্র নাট্যালয়ে এক ইংরেজী নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখেন; তিনি যা দেখেন

তাতে এত উৎসাহিত হন যে, 'রাজা গোপীচাঁদ' নামে একটি নাটক লিখে ফেলেন ; এ নাটক তিনি লেখেন মারাঠীতে নয়, হিন্দিতে, যাতে পার্সী, গুজরাটী, মুসলমান এবং অন্যান্য অ-মারাঠীরা তা দেখতে পারে। ভারতীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য একজন ভারতীয়ের লেখা নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় অনুষ্ঠানের এই ঘটনাকে বন্দনা ক'রে 'বম্বে টাইম্‌স্' (তখনও 'দি টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' হয় নি) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে। ঐ পত্রিকা বলে, "সমস্তটা এক বৈচিত্র্যের অনুষ্ঠান, যা খুব অল্পসংখ্যক ইয়োরোপীয়ই দেখতে পেরেছে এবং যা দেখবার সুযোগ তারা শীঘ্র নাও পেতে পারে, কারণ অনুষ্ঠানের সংখ্যা সীমিত থাকবে।" ('মারাঠী থিয়েটার', পৃঃ 5)। নাটকটির এক ব্যাখ্যামূলক সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে তৈরি করা হয়েছিল।

1858 সালে কলকাতায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে। সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী'র এক বাংলা অনুবাদ অভিনীত হয়। থিয়েটারের মালিকেরা অনুষ্ঠান দেখার জন্য ইংরেজদের আমন্ত্রণ করেন এবং নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ তাদের সরবরাহ করেন। ইংরেজী অনুবাদক ছিলেন বিশ্রুতকীর্তি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি নিজেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান দেখার পর তিনি আরও ভালো নাটকের প্রয়োজন অনুভব করেন। আরও ভালো? শুনে একটু আশ্চর্যই হতে হয়, কারণ মূল নাটকটি ('রত্নাবলী') বহুকাল ধ'রে এক উচ্চ শ্রেণীর নাটক হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। তার বাংলা অনুবাদকও ছিলেন জনৈক রামনারায়ণ, যিনি তার আগে কয়েকটি ভালো নাটক লিখেছিলেন। স্পষ্টতই, অসন্তোষের কারণ ছিল অন্য। আমরা সেই কারণ অনুমান ক'রে নিতে সাহস পাই যখন দেখি স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা' নামক এক নাটক লিখছেন। তার বিষয়বস্তু

পৌরাণিক, কিন্তু ভাষ্য পৃথক। তা জনসাধারণের নতুন মেজাজ এবং নতুন জাগরণের পক্ষে উপযোগী ছিল। এই ধরনের রচনা এই প্রথম কিনা সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। সমসাময়িক অবস্থায় প্রযোজ্য হতে পারে এমনভাবে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর ভাষ্য করার আকাঙ্ক্ষা পরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বহু নাট্যকারকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার ফলে শুধু যে কিছু ভালো নাটক লেখা হয়েছে তাই নয়, থিয়েটার আন্দোলন একটা নতুন গতিপথও পেয়েছে।

1857-এর যুদ্ধের পর বছর দশেকের মধ্যে অনেক নাটক লেখা হয়। একাধিক ভাষায় রচিত সেই সব নাটকের প্রত্যেকটির নামোল্লেখ ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাস ও অগ্রগতির এই বিবরণে সম্ভবও নয়, প্রাসঙ্গিকও নয়। কিন্তু এক বিশেষ কারণে দুটি নাটকের উল্লেখ করা উচিত। মারাঠীতে যা প্রথম মৌলিক নাটক ব'লে বিবেচিত, সেটি মঞ্চস্থ হয় 1860 খ্রীস্টাব্দে। এক পেশাদার দল বিভিন্ন স্থানে নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটি হল জনৈক বিনায়ক জনার্দন কীর্তনে রচিত 'থোর্লে মাধবরাও পেশোয়ে', বিষয়বস্তু আগ্রহোদ্দীপক, কারণ যে-রাজনৈতিক সঙ্কল্প 1857-এর যুদ্ধে পরাভূত হয়, তা এই ঐতিহাসিক নাটকে পরোক্ষে ব্যক্ত হয়। পেশোয়া সিংহাসনের দাবিদার নানা সাহেব 1857-এর অভ্যুত্থানের সংগঠয়িতাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জীবিত ব'লে বিবেচিত হলেও আত্মগোপন ক'রে ছিলেন এবং তাঁকে ধরার জন্য তাঁর মাথার উপর মূল্য ধার্য করা হয়েছিল। তবু এই নাটকে পেশোয়া-মহিমা স্মরণ করা হয়। ঐ একই বছর (1860) একটি বাংলা নাটক লিখিত ও প্রযোজিত হয় যা ভিতরের বিদ্রোহী মনোভাবকে ভাষা দেয়। কিন্তু তার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক নয়, সমসাময়িক। ভারতীয় শ্রমজীবীদের উপর ইয়ো-

রোপীয় নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার তার বিষয় (ঐ একই বিষয় অর্ধ শতাব্দী পরে ভারতের ভূমিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘটায়)। দীনবন্ধু মিত্র নাটকটি লেখেন এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি নাম দেন : নীলদর্পণ। বোধ হয় এক শ্রেণীর নাট্যকারদের উদ্ভব হচ্ছিল যাঁদের মতে নাটকের কাজ হল সামাজিক অবস্থাকে দর্পণের মতো প্রতিফলিত করা।

1857 থেকে 1870 পর্যন্ত শুধু যে লিখিত নাটকের সংখ্যাই বৃদ্ধি পায় তা নয়, আরও বেশি নাট্যানুষ্ঠানও করা হয়। নিম্নলিখিত কারণ ও অবস্থার জন্য এটা সম্ভব হয় : (1) নতুন নাটকের জন্য শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষা (অর্থাৎ আরও ভালো নাটক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার দৃষ্টান্ত) ; (2) বোম্বাই ও কলকাতার মতো শহরে নাট্যশালা নির্মাণ ; এবং (3) বিভিন্ন অভিনেতৃ-দলের উদ্ভব। মহারাষ্ট্রে সাংলির রাজা ও তাঁর অমাত্যরা বিষ্ণুদাস ভাবের প্রথম নাট্যানুষ্ঠানে যে প্রগতিবাদী উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তার ফলে বিষ্ণুদাস ভাবে অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সাফল্য আরও কয়েকজনকে তাদের নিজের অনুষ্ঠান করতে সাহসী করে। 1860 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় বারোটি নাটকীয় দল মহারাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরে নাট্যানুষ্ঠান করতে থাকে। অভিনেতা ছাড়াও এই সব দলকে নিজস্ব নাটকলেখক রাখতে হত। 1852 খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের পার্সীরা তাদের নিজেদের নাট্যসংস্থা পার্সী নাটকমণ্ডলী সংগঠন করে। এলফিনস্টোন ড্রামাটিক ক্লাব নামে একটি দলের উদ্ভব হয় 1867 খ্রীস্টাব্দে। বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজের ছাত্রদের উৎসাহে গঠিত এই দলটি প্রথম দিকে প্রধানত ইংরেজীতে শেক্স্পীয়ার এবং অন্যান্য ইংরেজী নাটক প্রযোজনা করে। 1867

খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় ভিক্টোরিয়া নাটকমণ্ডলী। এই সব দলের নাম থেকেই (ভিক্টোরিয়া, অ্যালফ্রেড, রিপন, এলফিনস্টোন, পার্সী ইত্যাদি) বোঝা যায় যে, বোম্বাইয়ের পার্সীরাই সেগুলি সংগঠনে বেশি সক্রিয় ছিল। ভারতীয় থিয়েটারের অগ্রগতির পরবর্তী অধ্যায়ের পক্ষে এই ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত, পার্সীরা অগ্রণী হওয়ার ফলে আরও একটি ভাষায় থিয়েটারের উদ্ভব হয়। সে ভাষা হল গুজরাটী। পার্সী নেতৃত্বের ফলে বোম্বাইতে আরও নাট্যশালা নির্মিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে বোম্বাইতে পার্সীদের নিবাস-অঞ্চলেই সমস্ত নাট্যালয় অবস্থিত ছিল এবং এই সেদিন পর্যন্তও অশিক্ষিত লোকেরা ঐ এলাকাকে বলত 'পিলা হাউস' (ইংরেজী 'প্লে-হাউস'-এর অপভ্রংশ)।

বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন নাট্যশালা নির্মাণ এবং বিভিন্ন নাট্য-দলের ভ্রাম্যমাণ তৎপরতা এমন এক বৈশিষ্ট্যের প্রবর্তন করে যা তখনও পর্যন্ত ভারতীয় থিয়েটারের পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের ঐতিহ্য অনুসারে রাজা অথবা ধনী ব্যক্তিরা ছিলেন নাট্যানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। এমন-কি জনসাধারণের জন্য প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত হয় মন্দির, নয় সমাজপতি, নয় সমগ্র গ্রাম। অভিনেতারা সমাজে এক বিশেষ জাত হিসেবে স্থান পেয়েছিল এবং সমাজ-জীবন ছিল বিভিন্ন জাতের এক মিলিত প্রয়াস। কিন্তু এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। নতুন অভিনেতারা আর বংশগত কোনো জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, তার প্রয়োজনও থাকল না। নাট্যশালা নির্মাণের একটা নিহিত অর্থ হল এই যে, ভাড়া দিতে হবে। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠান জনসাধারণের জন্য বলা হলেও প্রেক্ষা-গৃহের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শ্রোতৃমণ্ডলী নির্বাচন করা ছাড়া উপায়

রইল না। পরিশেষে, এক শহর থেকে অন্য শহরে ভ্রমণের মানে অর্থব্যয়। এই সব কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হলে হয় আমন্ত্রিত হতে হত নয় প্রবেশমূল্য দিতে হত। এই নতুন ব্যাপারটা স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে এক আন্দোলনের জন্ম হল যা আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের পথ বিশেষভাবে প্রস্তুত করল। কিন্তু সে কাহিনী বলার আগে আর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। এ প্রবণতা 1870 সালের আগেই দেখা যেতে শুরু করে।

পাঁচ

ভারতীয় ঐতিহ্যে নাটককে সাহিত্য (কাব্য) মনে করা হয়। সাহিত্যের অন্যান্য রূপ থেকে নাটকের পার্থক্য এই যে, নাটক হল দৃশ্যকাব্য। আমাদের আলংকারিকদের মতে সাহিত্যের কর্তব্য জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া; সাহিত্য তাদের বলবে "রামের মতো জীবন যাপন করা উচিত, রাবণের মতো নয়।" নাটক সাহিত্য ব'লে তার কাছ থেকেও ঐ একই শিক্ষা আমরা প্রত্যাশা করব। আদর্শ সব চরিত্র, মহৎ রাজা এবং পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের রূপায়ণে ভারতীয় নাটক শিক্ষাকে তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব'লে গ্রহণ করেছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' অনুসারে নাটকের দৃশ্যধর্মের জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হবে বিনোদনের মাধ্যমে। যেখানে বিনোদন প্রধান হয়ে

ওঠে অথবা শিক্ষাকে স্থানচ্যুত করে, সেখানে নাটককে নিম্নশ্রেণীর, এমন-কি ইতর মনে করা হয়। আমরা এখন দেখলাম একেবারে প্রাচীন কাল থেকে বৈষ্ণব যুগ পর্যন্ত নাটক কিভাবে তার লক্ষ্যসাধন ক'রে এসেছে। এ এক বিশেষ কৌতূহলের বিষয় যে, আমাদের জীবনের সব রকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত থিয়েটারের এই শিক্ষাদান ভূমিকা সমানে চলে এসেছে। সামাজিক পটভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয়েছে।

ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের জীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। আমরা দেখেছি নাটক কিভাবে এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। নতুন দৃষ্টির সজীবতায় নাটক সম্ভবত তার শিক্ষাদানের চিরাচরিত প্রধান কাজ থেকে সরে যাচ্ছিল। লোকে নতুন নাটক চাইছিল এবং নাট্যকারেরা তা সরবরাহ করতে উদ্‌গ্রীব হন। নতুন নাটকের অভাবে আগেকার যুগের সংস্কৃত নাটক তো অনুবাদ করা হয়ই, এমন-কি ইংরেজী নাটককে তার মূল রূপেই গ্রহণ করা হয় এবং ইংরেজীতে অথবা আঞ্চলিক ভাষায় অভিনয় করা হয়। দেখা যায় চিত্তবিনোদনই যেন তার প্রধান লক্ষ্য। নইলে এত গান নাচ থাকবে কেন অথবা এত মারামারি এবং রোমহর্ষক দৃশ্যই বা থাকবে কেন, যেমন ইংরেজী নাটকগুলিতে থাকে? শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার চেতনা নিয়ে নাট্যকারদের লিখতে হবে এবং সে-শিক্ষাকে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

প্রথম যে আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার সচেতনভাবে থিয়েটারকে এক নতুন লক্ষ্য দেন, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের হিন্দি নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। তিনি ঘোষণা করেন যে,

তাঁর ভাষায় সত্যিকার নাটক বলতে কিছু নেই, তাঁর মতে কাব্য, গান, নাচ, এমন-কি সংলাপও আপনা থেকে নাটক তৈরী করে না। কাহিনী নির্মাণ করার, চরিত্র পরিস্ফুট করার, তাদের মঞ্চে প্রবেশ করার ও মঞ্চ থেকে প্রস্থান করার একটা রীতিপদ্ধতি আছে এবং সে সম্বন্ধে সংস্কৃতে পরিষ্কারভাবে নিয়মকানুন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নাট্যকারকে এ-সমস্ত মেনে চলতে হবে। তা ছাড়া, একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকারকে লিখতে হবে। 'জৈসা কাম ঐসে পরিণাম' নামক ভারতেন্দুর একটি একাঙ্কিকার উপসংহারে গ্রন্থকারের অভিমত রূপায়িত হয়েছে। এক মাতালের পতিব্রতা স্ত্রী এবং এক বেশ্যার মধ্যে পার্থক্য কাহিনীতে দেখানো হয়। এই বেশ্যাটি বসন্ত নামক আর এক ব্যক্তির রক্ষিতা। বসন্ত যখন তার বাড়িতে যায় তখন মাতালটিকে সেখানে দেখে, ঐ বেশ্যা তাকে তার মা'র ছদ্মবেশে পালাতে সাহায্য করার জন্য বৃথাই চেষ্টা করে। বসন্ত টের পায় 'মা' আসলে একটি পুরুষ। সুতরাং সে দর্শকদের সম্বোধন ক'রে বলে : "সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, আপনারা সতর্ক হবেন, যাতে এমন জিনিষ আপনাদের ক্ষেত্রে না ঘটে।" এই বক্তব্য নিয়ে নাটক শেষ হয়।

ভারতেন্দুর মহত্ত্ব এই যে, তিনি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে থিয়েটারের একটা গতি নির্দেশ করেন। তিনি প্রায় কুড়িটি নাটক লেখেন, যাদের অধিকাংশই একাঙ্কিকা। তাঁর বহু নাটক হয় সংস্কৃত নয় বাংলা থেকে নেওয়া। 'চণ্ড-কৌশিক' 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়'—এই সংস্কৃত নাটকগুলি তিনি হিন্দিতে রূপান্তরিত করেন। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল সত্যনিষ্ঠ পুণ্য জীবনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা ; তৃতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের মুখোশে ঢাকা ভণ্ডামিকে সকলের সামনে খুলে দেখানো ; 'মুদ্রারাক্ষসে'র তাৎপর্য ছিল

প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িক, কেননা তা ছিল এক ভারতীয় রাজার দ্বারা এক বিদেশী বিজেতার পরাজয় ও বিতাড়নের কাহিনী।

ভারতেন্দু সংস্কৃত নাটকের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। তিনি যে সংস্কৃত নাট্যকলার বিধিবিধানের উপর এত জোর দিয়েছেন তার আসল উদ্দেশ্য ঐ-সব বিধিবিধানের পুনঃপ্রচলন নয়, আসল উদ্দেশ্য হল এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যে, নাটকের একটা নিজস্ব রীতিপদ্ধতি থাকা অত্যাবশ্যক। তিনি যা দেখেছিলেন এবং দেখছিলেন, তা নিশ্চয় তাঁকে মর্মাহত করেছিল। তাঁর আগেকার কয়েকটি নাটক সম্বন্ধে তিনি বলেন: "এগুলি নাটক নয়, এ তো সবই কাব্য; কোনো গদ্য এতে নেই।" তিনি নিজে কয়েকটি নাটকের আরম্ভ-দৃশ্যে সূত্রধারের ভূমিকা প্রবর্তন করেন, কিন্তু অন্য কয়েকটিতে তিনি চরিত্র দিয়েই সরাসরি নাটক আরম্ভ করেন। ইংরেজী নাটক পর্দা উপরে ওঠানো ও নীচে নামানোর যে প্রথা প্রবর্তন করেছিল, সেই ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে তিনি স্থান ও পরিবেশের পরিবর্তন অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্য রচনা করেন।

কিন্তু তিনি স্বয়ং থিয়েটারের মানুষ ছিলেন, এই ঘটনাটাই ছিল তাঁর মুখ্য কীর্তি। তিনি মুখে যা বলেন, কাজে তা করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর চারপাশে একদল উৎসাহী ব্যক্তিকে জড়ো ক'রে নাটক প্রযোজনা করেন। এই দলটি যে শিক্ষিতদের দল ছিল তা পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়। তাঁদের অনেকেই নাটক লেখেন এবং প্রযোজনা করেন। সম্ভবত, এটাই অপেশাদার দলের প্রথম দৃষ্টান্ত। ভারতেন্দু নিজে ঐতিহাসিক নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন, একাঙ্কিকা লিখেছিলেন এবং মনে হয় তিনি যেন এক নতুন আঙ্গিকের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তাঁর 'সত্য হরিশ্চন্দ্র'

অত্যন্ত সফল নাটক এবং আমরা দেখতে পাই অল্পদিনের মধ্যেই ঐ বিষয়বস্তুকে ভিত্তি ক'রে অন্য অনেক ভারতীয় ভাষায় নাটক লেখা হচ্ছে। থিয়েটারের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় এবং তার কারণ ছিল এই যে, ভারতেন্দু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সমস্ত সমসাময়িক জীবনকে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মঞ্চে নিয়ে আসেন। তখনও পর্যন্ত সমাজে নাট্যকার এবং অভিনেতাদের এত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ক'রে রাখা হত। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের ফলে তারা সম্মান (সাময়িক) লাভ করে। পথনির্দেশ ঠিকমতো দিতে পারলে জনসাধারণের সমাজ-জীবনে থিয়েটার এক প্রবল শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই কথাটা ভারতেন্দুর হিন্দী থিয়েটার সমস্ত চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কাছে পরিষ্কার ক'রে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, জনসাধারণ কিছুকাল তা দেখতে পায় নি, কারণ নবসৃষ্ট জনপ্রিয়তার তরঙ্গে ভর ক'রে আর-এক ধরনের থিয়েটার এসে গিয়েছিল যার চাকচিক্য তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

পেশাদার থিয়েটার

এক

বোম্বাই এক ব্যাবসা-কেন্দ্র, পার্সীরা প্রধানত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং পেশাদার-থিয়েটার এক ব্যবসায়ী উদ্যম। বোম্বাইয়ে পার্সীদের থিয়েটার-প্রীতির ফলেই যে পেশাদার ভারতীয় থিয়েটারের উদ্ভব হয়, এটা খুব যুক্তিসংগত ব্যাপার। তারা একমাত্র কারণ ছিল না, তারা ছিল বহু কারণ-পরম্পরার মধ্যে শেষ কারণ যার জন্য ভারতবর্ষে পেশাদার থিয়েটারের জন্ম হয়। আধুনিক মারাঠী থিয়েটারের জন্ম-বৃত্তান্তে আমরা দেখেছি কিভাবে সাংলিতে প্রথম নাট্যানুষ্ঠান বিষ্ণুদাস ভাবেকে আরও অনুষ্ঠান করতে ও একদল অভিনেতা রাখতে এবং পুণা বোম্বাইয়ের মতো শহরে গিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে উৎসাহিত করে। বোম্বাইতে তাঁকে এক নাট্যগৃহ ভাড়া করতে হয় এবং তিনি টাকা উপার্জন করেন। শোনা যায়, তাঁর প্রথম হিন্দী নাটক 'রাজা গোপীচাঁদ' এক রাত্রে তাঁকে 1800 টাকা দেয়। 1853 সালে তা ছিল এক সম্পদের সমান। ভালো আয়ের সম্ভাবনা স্বভাবতই আরও কয়েকজনকে উৎসাহিত করে, ফলে দশ বছরের মধ্যে মহারাষ্ট্রে গোটা বারো দলের উদ্ভব হয়। তখনও পর্যন্ত সেগুলি ব্যাবসাভিত্তিক থিয়েটার-কোম্পানি হিসেবে সংগঠিত হয় নি।

দলের নেতারা অথবা অভিনেতা-সদস্যেরা, কেউই নাট্যকর্মে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের কথা ভাবেন নি। সম্ভবত তাঁরা ছিলেন নিছক উৎসাহীদের দল, যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় নাট্যানুষ্ঠান করতেন এবং তাঁদের খরচ উঠে গেলেই খুশী হতেন।

যখন নাট্যশালা নির্মিত হতে থাকল এবং শহরে দর্শকের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন পরিস্থিতি বদলে গেল। কখনও কখনও অথবা ঘন ঘন অনুষ্ঠানের প্রশ্ন আর রইল না, প্রশ্ন দাঁড়াল নিয়মিত অনুষ্ঠানের। এই নিয়মিত অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত একদল অভিনেতার প্রয়োজন হল। বোম্বাইয়ের মতো শহরে ইংরেজ বাসিন্দারা মাঝে মাঝে তাদের নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত। এক নতুন ধরনের মঞ্চ, এক বক্রাকার সম্মুখ-মঞ্চ, একাধিক পর্দা, মঞ্চ-সজ্জা এবং মঞ্চে ব্যবহার্য জিনিষপত্র, এ-সবে শ্রোতৃমণ্ডলী ক্রমে অভ্যস্ত হচ্ছিল। এতে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ-উপভোগ বেড়ে গিয়েছিল। অর্থ-বিনিয়োগের একটা তাৎপর্যও এর ছিল। যদি দলকে অন্যান্য জায়গায় যেতে হয়, তা হলে তার নিজস্ব পর্দা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। এই দিকটার জন্যই ব্যবসায়িক দৃষ্টি প্রয়োজন হয়। যে পার্সী দলগুলি সেই 1850 সালেই জন্ম নিয়েছিল, সেগুলি তাড়াতাড়ি ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপান্তরিত হল।

প্রথম যুগে পার্সী দলগুলি উর্দু নাটক প্রযোজনা করত। এইসব নাটকের অধিকাংশই ছিল হয় 'ইন্দর সভা' ধরনের জমকালো অনুষ্ঠান নয় শেকস্‌পীয়ারের নাটকের অনুবাদ। এই অনুবাদ-নাটকগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বেশি আকৃষ্ট করত, কারণ তারা ছিল নতুন এবং চিরাচরিত পৌরাণিক নাটকের চেয়ে তাতে সক্রিয় ঘটনা বেশি ছিল। যে-সব নাটকে অনেক সক্রিয় ঘটনা থাকে, সে-সব নাটকের ভাষা

না বুঝলেও দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট থাকে; যে-সব নাটকে জমকালো দৃশ্যাবলী থাকে, সেগুলিও অনুরূপ সাড়া জাগায়। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে পার্সী কোম্পানিগুলি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, এবং যেখানে তারা যায় সেখানেই শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে এই ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে।

দুই

দৃষ্টান্তস্বরূপ, গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে কিছু পার্সী কোম্পানি দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করে। তারা ঐ অঞ্চল থেকে চলে যেতে না যেতেই অন্ধ্রে ও কর্ণাটকে অনুরূপ সব দলের উদ্ভব হয়। অন্ধ্রে তারা বেলারিতে গিয়েছিল এবং বেলারিতেই প্রথম কোম্পানি গঠিত হয়। কর্ণাটকে গাদাগ নামক এক জায়গায় 1877 খ্রীস্টাব্দে প্রথম পেশাদার দল গঠিত হয়। পার্সী কোম্পানি মহীশূরে গিয়েছিল, সেখানে মহারাজা স্বয়ং অনুষ্ঠান দেখে প্রভাবিত হন এবং তাঁর পার্শ্বচরদের একটি কোম্পানি গঠনে সাহায্য করেন। এটা লক্ষণীয় যে, প্রথম পর্বে শিক্ষিতরাই অগ্রণী হয়। বেলারিতে দুটি কোম্পানির উদ্ভব হয়: ধর্মবরম কৃষ্ণমাচার্যের সরস বিনোদিনী সভা এবং কোলাচলম শ্রীনিবাস রাও-এর সুমনোরমা সভা। কৃষ্ণমাচার্য এবং শ্রীনিবাস রাও উভয়েই ছিলেন গ্রন্থকার-অভিনেতা-প্রযোজক। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যে-ধরনের নাটক প্রযোজনা করা হয় তা ছিল পার্সী

থিয়েটারের নাটকের জাত থেকে আলাদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক বা ঐতিহ্যানুসারী ; যেমন, 'ভক্ত প্রহ্লাদ', 'শিলাদিত্য', ইত্যাদি। দৃশ্যের দিক থেকে যা ঘাটতি পড়ত, তার পূরণ হত সংগীত ও অভিনয়ের দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী কয়েক বছর এক-একজন অভিনেতাকে ঘিরেই থিয়েটার-কোম্পানি সংগঠিত হয়।

কর্ণাটকেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আরও পাঁচটি কোম্পানির উদ্ভব হয় : হালাসাগি নাটক কোম্পানি (1878), তন্তপুরস্থ নাটক মণ্ডলী (1880), শ্রীচামরাজেন্দ্র কর্ণাটক সভা (1882), মেট্রোপলিটান থিয়েট্রিকাল কোম্পানি (1882) এবং শ্রীগুব্বি চেন্নাবাসাওয়েশ্বর কৃপাপোষিত নাটক সঙ্ঘ (1884)। নামগুলি পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগেকার গাদাগ কোম্পানি এবং গুব্বি স্থানীয় বিগ্রহের নাম অনুসারে হয়। বাকী তিনটির মধ্যে একটি হয় মহারাজার নাম অনুসারে এবং অন্য দুটি যে শহরে গঠিত হয় তাদের নাম গ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে গুব্বি কোম্পানি এখনও টিঁকে আছে। প্রথম আমলে এই কোম্পানিগুলি পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করত। গান থাকত আরও বেশি এবং সংলাপ থাকত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সংগীত এবং অভিনয় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ ধরে রাখত।

পেশাদার থিয়েটারের এই হল অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোনো ব্যতিক্রম নেই। একটা পেশাদার কোম্পানির এক বা দুজন সুদক্ষ গায়ক ও অভিনেতা থাকত, তারাই ছিল শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রধান আকর্ষণ। কিছুকাল বাদে ঐ গায়ক ও অভিনেতা দল ছেড়ে গিয়ে নিজের কোম্পানি গঠন

করত। শুধু তাই নয়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ব্যক্তিটি যদি কোম্পানির মালিক হত, তা হলে সে তার চেয়ে ভালো অভিনেতাকে কোনো ভাবেই উৎসাহ দিত না। এ সত্ত্বেও পেশাদার কোম্পানিগুলি অনতিবিলম্বে অভিনয় ও গানের শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

নাট্যশালার অস্তিত্ব বা অভাব পেশাদার থিয়েটারের বিকাশকে প্রভাবিত করে। বোম্বাই ও কলকাতায় নাট্যশালা ছিল, সুতরাং পার্সী-ধরনের পেশাদার কোম্পানির খুব প্রয়োজন ছিল না। এবং যেখানেই নাট্যশালা ছিল, সেখানেই নাটকীয় দলের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্ভব ছিল। কলকাতায় তা ঘটে। এবং বোম্বাইতেও। অন্ধ্র ও কর্ণাটকের মতো কোনো পেশাদার দল বোম্বাইতে প্রায় গঠিতই হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলকাতার থিয়েটারগুলি ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতো পেশাদার অভিনেতাদের লালনাগার। গিরিশচন্দ্র ঘোষের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মোটা-মূটি পেশাদার অভিনেতাদেরই একটি দল ছিল।

তিন

মহারাষ্ট্র এবং বাংলায় ছাড়া (এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব), ভারতবর্ষের অন্য সর্বত্র পেশাদার থিয়েটার যেন অবধারিত-ভাবে একই পথে তার চরম বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে, 'পেশাদার' শব্দটি এ ক্ষেত্রে অপপ্রযুক্ত। যে ব্যুৎপত্তি

থেকে পেশার উদ্ভব, এখানে কেউ তা দাবি করতে পারত না। থিয়েটার সম্বন্ধে কারোরই, বিশেষ ক'রে মালিকের কোনো জ্ঞান বা সত্যিকার আগ্রহ ছিল না। সঠিকভাবে বলতে গেলে পেশাদার মঞ্চকে বলা উচিত ব্যবসায়িক মঞ্চ। ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরের অস্তিত্বের মধ্যে পঁচিশ বছরই এই মঞ্চ পৌরাণিক নাটকে আচ্ছন্ন ছিল। এইসব নাটকে চরিত্রেরা লোকমঞ্চের কুৎসিত অনুকরণে সাজপোষাক পরে আসত। প্রথম দিকে নাটকে গদ্য বিশেষ থাকত না। পরে গদ্য দেওয়া হত, কিন্তু দেবতাদের চরিত্রের উপযোগী করার জন্য তাতে এত সংস্কৃত শব্দ ঢোকানো হত যে অভিনেতারা অথবা শ্রোতা-দর্শকেরা তা বুঝত না। কারণে অকারণে নাচ ঢোকানো হত। মঞ্চ তিনটি স্থানের দৃশ্যে বিভক্ত করা হত: একটি রাস্তা, একটি গৃহের অভ্যন্তর এবং একটি উন্মুক্ত 'অরণ্য'। এই তিনটিকেই তিনটি গোটানো পর্দায় রূপায়িত করা হত। রাস্তার পর্দায় কোনো ইয়োরোপীয় রাজধানীর রাস্তার একটা অংশ দেখানো হত, তাতে টেলিগ্রাফের খুঁটি, তার, এইসব থাকত। 'গৃহের অভ্যন্তরে' দেখা যেত কোনো অভিজাত-গৃহের বা প্রাসাদের আড়ম্বরবহুল কক্ষ। তৃতীয় পর্দাটি কখনও গোটানো হত না, তাতে আঁকা থাকত গাছ-গাছালির এলোমেলো স্তূপ। এ ছাড়া, থাকত একটা সামনের পর্দা, তাতে সাধারণত দেখা যেত জ্বলজ্বলে রঙে এক বীভৎস পৌরাণিক চরিত্র যার নিচে বড় বড় অক্ষরে চিত্রকরের নাম লেখা থাকত। এই অবস্থা চলে বর্তমান শতকের একেবারে ত্রিশ দশক পর্যন্ত।

নাটকগুলি কোনো স্বীকৃত লেখকের রচনা এমন দাবি সচরাচর করা হত না। পুরানো নাটক, এমন-কি পূর্ববর্তী শতাব্দীর শেষভাগে লেখা নাটক পর্যন্ত বরাবর অভিনয় করা হত। যেহেতু প্রায় সব কোম্পানি

একই নাটক প্রযোজনা করত, সেইহেতু কোনো অভিনেতার পক্ষে এক কোম্পানি ছেড়ে অন্য কোম্পানিতে যোগ দিয়ে নিজের সুবিধা করে নেওয়া সহজ ছিল। শুধু ঐটাই মালিকের দুশ্চিন্তা ছিল না। গান এবং কাহিনী একই হওয়ায় প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র ছিল। প্রত্যেক কোম্পানি স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ গায়ককে পেত না। সুতরাং আকর্ষণ বাড়াবার জন্য মালিককে অন্যান্য উপায় ভাবতে হত। একটা উপায় ছিল প্রতিভাবান নাট্যকারদের দিয়ে আরও ভালো নাটক লেখানো কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা যায় নি। প্রথম কুড়ি-পঁচিশ বছর খুব সামান্য সংখ্যক উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ছিলেন, তার সহজ কারণ লেখকদের সম্বন্ধে অশিক্ষিত মালিকদের বিরূপ মনোভাব। শেষ পর্যন্ত যে-সব উপায় অবলম্বন করা হত, সেগুলি ছিল প্রকৃতপক্ষে নাটকের বহির্ভূত ব্যাপার। যেমন, হঠাৎ দৃশ্যের পরিবর্তন, যার বিজ্ঞাপন দেওয়া হত স্থানান্তর দৃশ্য বলে। বিজলি আলোর আবির্ভাব যখন হল, তখন বিজ্ঞাপনে ঐ আলোকে নতুন নাটকীয় প্রকরণ ব'লে ঘোষণা করা হত!

দেশের অধিকাংশ স্থানে ব্যবসায়িক থিয়েটারের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এই যে, পরিবর্তনশীল সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তা ছিল অজ্ঞ অথবা উদাসীন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন শহুরে শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্ভব হচ্ছিল; তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং বক্তব্যে ও প্রযোজনায় সম্পূর্ণ কৃত্রিম পৌরাণিক নাটকের কোনো আবেদন তাদের কাছে ছিল না। এই কোম্পানি-গুলিকে ক্রমেই বেশি করে গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলী পৌরাণিক নায়ক-নায়িকার ভাগ্য সম্বন্ধে আর আগ্রহান্বিত ছিল না, তারা শুধু চাইত

তাদের রুচি অনুযায়ী কিছু চিত্তবিনোদন। নাটকটা যাই হোক, কিছু যেত আসত না। এর জন্যই তামিল মঞ্চে আমরা যে-রেওয়াজ দেখি, তার উদ্ভব। সেখানে দৃশ্য যাই হোক বা প্রসঙ্গ যাই হোক, শ্রোতৃমণ্ডলী তাদের প্রিয় অভিনেতার কাছে তাদের পছন্দসই একটা গান গাইবার জন্য দাবি জানায় এবং অভিনেতাও বিনা দ্বিধায় তাদের অনুরোধ রক্ষা করে। এ দৃষ্টান্ত অবশ্য চরম। সাধারণত অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকে হাস্যরসাত্মক অংশ, যা বিষয়বস্তুর সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহীন। যদি মূল রচনায় এই রকম কোনো দৃশ্য না থাকে, তা হলে প্রযোজকই তা জুড়ে দেন। ব্যবসায়িক থিয়েটার যদিও ক্রমবর্ধমান এক গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলী সৃষ্টি করে, তবু উপকারটা সন্দেহজনক হয়েছিল। শ্রোতা-দর্শকের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, প্রযোজনার মান ততই নামতে লাগল।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। সে ক্ষেত্রে কোনো অসাধারণ প্রতিভা বা একাগ্র নিষ্ঠা বা ব্যবসায়িক সংগঠন-দক্ষতা ক্ষণস্থায়ীভাবে পুনরুজ্জীবনের আশার সৃষ্টি করে। এইভাবে ব্যবসায়িক মঞ্চ তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের সমগ্র কার্যকালের মধ্যে বরদাচার বা মহম্মদ পিয়ার বা পৃথ্বীরাজ বা গুব্বি কোম্পানির মতো অভিনেতা ও প্রতিষ্ঠান সৃজন করতে সমর্থ হয়। প্রথম দু'জনের ছিল অভিনয়ের প্রতিভা। চিরাচরিত প্রাচীন বা পৌরাণিক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনেও তাঁরা চরিত্রগুলিকে নতুন তাৎপর্য দিতেন এবং পৃথ্বীরাজ তো সমসাময়িক সমস্যার উপরে মর্মস্পর্শী নাটক গড়ে তুলতেন। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষেত্রেই একক অভিনেতাই মঞ্চে প্রাণ সঞ্চার করতেন। এমনও হত যখন ভালো নাটক বা প্রতিভাবান অভিনেতার অভাবে মঞ্চের চোখ-ভোলানো দিকটাই শ্রোতৃমণ্ডলীকে

আকর্ষণ করত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিষ হল এই যে, ব্যবসায়িক মঞ্চ তার ক্রমাবনতি সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রতিভাবান সব শিল্পী সৃজন ক'রে চলেছিল যতদিন না চলচ্চিত্র এসে সমস্ত প্রতিভাকে মঞ্চ থেকে টেনে নিয়ে গেল।

মহারাষ্ট্র এবং বাংলা ছাড়া আর সর্বত্রই বরাবর পার্সী থিয়েটারের চোখ-ধাঁধানো বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবসায়িক মঞ্চকে সরাসরি প্রভাবিত করছিল। মাঝে মাঝেই মহারাষ্ট্র ও বাংলার মঞ্চ তাদের সাফল্যের কারণে অন্যান্য অঞ্চলের থিয়েটারকে বিষয়বস্তু জোগাত। যেমন, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা এবং বঙ্গভঙ্গের মতো ঘটনা মারাঠী ও বাংলা মঞ্চে 'ঐতিহাসিক' নাটক নামে, এমন-কি রূপক তাৎপর্যসহ পৌরাণিক নাটক হিসেবে উপস্থিত করা হচ্ছিল। এগুলি পরোক্ষভাবে অন্যান্য অঞ্চলের মঞ্চের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ঐ দুই অঞ্চলে নতুন চেতনার যে তীব্রতা ছিল এবং যে ধরনের যোগ্য নেতৃত্ব ছিল, তা না থাকায় এই সব নাটক আগেকার কৃত্রিমতাপূর্ণ পৌরাণিক নাটকের চেয়ে উন্নততর কিছু হয় নি। কি নাট্যকার, কি অভিনেতা, কেউই কোনো সত্যকার আবেগ সঞ্চার করতে পারে নি। ঐ একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি ঘটল যখন এক সময় পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্য ব্যবসায়িক মঞ্চকে 'সামাজিক' ব'লে অভিহিত নাটক প্রযোজনা করতে বাধ্য করে। প্রায়শই সে-সব নাটকে সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক থাকত নামমাত্র। 'সত্য হরিশ্চন্দ্রে'র মতো নাটকে যে আদর্শ নায়ক, যে নির্ভেজাল দুর্বৃত্ত মঞ্চে বিচরণ করত, এখানেও তারাই দেখা যায়। নীতিকথা উপলব্ধি করবার জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে অতিনাটকীয়তা সহ্য করতে হত।

পূর্ব-বর্ণিত কারণে যদি মৌলিক রচনা আমরা না পেয়ে থাকি,

অনুবাদ এবং রূপান্তরও ভালো কিছু হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শেক্‌স্‌পীয়ারের কোনো নাটক হয়তো রূপান্তরিত করা হল এবং আমাদের সমাজের উপযোগী ক'রে চরিত্রদের নাম পর্যন্ত বদলে দেওয়া হল। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু যা বোঝা যায় না তা হল দ্রুতগতি ক্রিয়াধর্মী এইসব চরিত্র যখন তখন কেন তাদের ক্রিয়া বন্ধ ক'রে গান গেয়ে উঠবে। সম্ভবত শ্রোতৃমণ্ডলী সাংগীতিক বিনোদন ভালোবাসে এবং তাদের পক্ষে তা প্রয়োজন বলেই এ রকম করা হয়েছে। মনে হয় যেন সময়ের বিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের আধুনিক ব্যবসায়িক মঞ্চ আগেকার নৃত্য-নাট্যের প্রভাব ঝেড়ে ফেলতে পারে নি। নৃত্য-নাট্যের রূপটা সমসাময়িক জীবনের প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়। সেইসব প্রয়োজন অনেক দিন আগেই অদৃশ্য হয়েছিল। প্রাচীন যুগের মতো মহাকাব্যগুলিই আর জ্ঞানের একমাত্র উৎস ছিল না; আবৃত্তি শ্রোতাদের মনে ভাবসঞ্চারের একমাত্র মাধ্যম ছিল না এবং মুদ্রাও ব্যাখ্যার একমাত্র ভাষা ছিল না। তাদের উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজন অনেককাল আগে ফুরিয়ে যাওয়ার পরও যখন তাদের রেখে দেওয়া হয়, তখন তাদের থাকার অন্য কারণ দেখানো একান্ত আবশ্যক। প্রধান কারণ ছিল চিত্তবিনোদন। তার নিজের যুগে নৃত্য-নাট্য ছিল চিত্তবিনোদন এবং শিক্ষা উভয়েরই বাহন। আধুনিক ভারতে শিক্ষাদানের অন্য অথবা পরিবর্তিত উপায় প্রবর্তনের পর নৃত্য-নাট্য শুধু চিত্তবিনোদনই করতে পারত। আমাদের ব্যবসায়িক মঞ্চের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা করা কঠিন ছিল যে, আজকের দিনেও সমসাময়িক চিন্তা-ভাবনা ও আবেগকে প্রকাশ করবার উপযোগী ক'রে নৃত্য-নাট্যকে বিবর্তিত করা যায়। ব্যবসায়িক মনোভাব মঞ্চকে কোনোরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেতে দেয় নি।

পেশাদার মঞ্চের স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু ঘটে। এ কথা বলার অর্থ এইনয় যে, পেশাদার নাটক কোম্পানি এখন একেবারেই নেই বা তাদের আবার বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা হচ্ছে না। দক্ষিণ অঞ্চলে অন্ধ্র আশী-নব্বই বছর আগে পেশাদার মঞ্চের জন্ম দেয় ; সেই অন্ধ্রে এখন মাত্র কয়েকটি পেশাদার কোম্পানি আছে। একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা কখনও পেশাদার নাটক কোম্পানি সংগঠনে উৎসাহ দেয় নি মনে হয়। তার নিজস্ব নৃত্য-নাট্যের রূপগুলি পুরুষপরম্পরায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত ছিল। তামিলনাড়ুতে পেশাদার মঞ্চকে বরাবর অবজ্ঞার চোখে দেখা হত, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দক্ষিণে একমাত্র এই অঞ্চলেই আধুনিক নাটকের উদ্ভব হয় প্রধানত শৌখীন দলগুলির কর্মতৎপরতা থেকে। আগেই বলেছি কর্ণাটকে 1884 খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গুব্বি কোম্পানি এখনও ঐ নামে এবং একই ধাঁচে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যগুলির ক্ষেত্রে পেশাদার কোম্পানির ইতিহাসে সেদিনও পর্যন্ত ছিল জন্ম ও মৃত্যুর কাহিনী। আগেকার যুগের কয়েকটি অবশ্য ব্যতিক্রম ; সেগুলি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে তারপর বিনষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে তামিলনাড়ুর টি. কে. এস. ব্রাদার্স-এর মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। শুধু যে নতুন নাট্যকারদের খুঁজে বের করা হচ্ছে তাই নয়, সমসাময়িক অবস্থার উপযোগী বিষয়বস্তু এবং প্রযোজনা-পদ্ধতিও প্রবর্তন করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে, বাংলায় এবং দক্ষিণেও নতুন নাট্যতৎপরতার জোয়ার দেখা দিয়েছে। বোম্বাই, পুণা এবং নাগপুরে নতুন অন্তত এক ডজন থিয়েটার কোম্পানি সক্রিয় রয়েছে, উপরন্তু পুরোনো ললিতকলাদর্শ নাটকমণ্ডলী তো

আছেই। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি আছে যেখানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের 'রাত্রির' জন্য ভাড়া করা হয়, যেমন ঐ মহলে বলা হয়ে থাকে।

চার

মারাঠী পেশাদার মঞ্চ সম্বন্ধে যে আলাদা করে বলছি তার কারণ এই নয় যে, এখনও তা প্রতিপত্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কারণ হল এই যে, তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের অস্তিত্বে তা বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ কাজ করেছে। তা আবার প্রতিবেশী কর্ণাটক ও অন্ধ্র অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সে-প্রভাব প্রধানত সেই সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, যা মারাঠী মঞ্চ কর্ণাটকের 'দশাবতার' (যক্ষগান) থেকে গ্রহণ করেছিল। মহারাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিভা এবং সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তার মঞ্চে যে-সব বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিল, অন্যেরা তা নিতে পারে নি বা বুঝতে পারে নি, ফলে তাদের ক্রমাবনতি ঘটে এবং পরিশেষে তারা বিলুপ্ত হয়।

1843 খ্রীস্টাব্দে যখন প্রথম আধুনিক মারাঠী নাটক 'সীতাস্বয়ম্বর' সাংলিতে অভিনীত হয়, তারপর পঁচিশ বছরেরও অধিককাল নাটক সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। যে-অভিনেতারা বিভিন্ন দল গঠন করে, শুধু তারাই নয়, শিক্ষিত তরুণরা এবং অভিজ্ঞ প্রবীণরাও নাটক সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়। প্রথম দশ বছর

নাট্যানুষ্ঠানগুলি স্থূল হত। গান ও নাচের অবতারণা হত প্রাসঙ্গিক ব'লে নয়, চিত্তবিনোদক ব'লে। কাহিনী বলতে প্রায় কিছুই থাকত না, যদিও ক্রিয়া থাকত প্রচুর। স্বভাবতই শিক্ষিত শ্রেণীতে আধুনিক নাটকের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা আসায় তারা এই সব নাটকের বিষয়বস্তু ও রূপ কোনোটাতেই সন্তুষ্ট হয় নি। শিক্ষিত তরুণেরা ইংরেজী নাটক প'ড়ে জেনেছিল যে সত্যিকার নাটক গান ও নাচের সাহায্য ছাড়াই শ্রোতা-দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে। 1861 খ্রীস্টাব্দে জনৈক কীর্তনে লিখিত 'থোর্লে মাধবরাও পেশোয়ে' নামক এক নতুন নাটক দিয়ে একটা পরীক্ষা করা হয় (হয়তো পরিকল্পনা ক'রে অথবা সচেতনভাবে নয়)। সম্পূর্ণরূপে গদ্যে এই প্রথম নাটক। কাহিনী সমসাময়িক আগ্রহের বিষয়ই ছিল, কারণ মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিলুপ্ত গৌরবময় মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাস তা স্মরণে নিয়ে আসে। বস্তুত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন একই সঙ্গে চলে, ফলে রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ-সংস্কারক, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক সবাই সমসাময়িক প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য একটা গদ্য-ভাষা গ'ড়ে তোলেন। তখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গদ্য-নাটক লেখা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে সংস্কৃত ও ইংরেজী-নাটকের রূপান্তর নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে। ইংরেজী নাটক রূপান্তরের প্রয়াস প্রথমে হয়। গোবিন্দ বল্লাল দেবল, যিনি পরে আধুনিক মারাঠী থিয়েটারের অন্যতম প্রেরণাদাতা হন, তিনি শেক্স্পীয়ারের 'ওথেলো' রূপান্তরিত করেন এবং তার নাম দেন 'ঝঞ্ঝারাও'। 1879 সালে অন্য কয়েক-জনের সঙ্গে মিলে তিনি 'আর্যোদ্ধারক নাটক মণ্ডলী' নামে এক থিয়েটার কোম্পানি স্থাপন করেন এবং ঐ নাটকটি তখন অভিনীত

হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সাধারণভাবে রূপান্তরিত নাটক, বিশেষভাবে সংস্কৃত থেকে গৃহীত নাটক জনগণের মধ্যে বেশি লোককে আগ্রহান্বিত করতে পারে না। পুণা ও বোম্বাইয়ের মতো শহরের বাইরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও বেশি ছিল না; তা ছাড়া, আর্যোদ্ধারক দল পেশাদারী পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় নি। সুতরাং মারাঠী নাটকের যিনি জনক তাঁর ব্রতভার গ্রহণ করলেন আর এক মহারাষ্ট্রীয় যাঁর জন্ম হয়েছিল কর্ণাটকে। তাঁর পরিবার কর্ণাটকে বসবাস স্থাপন করেছিল। এ ঘটনাটা যে তাৎপর্যপূর্ণ তা আমরা এখনই দেখতে পাব।

এই ব্যক্তির নাম বলবন্ত পাণ্ডুরাং কিরলোস্কার, কিন্তু যে নামে তিনি বেশি পরিচিত, তা হল আন্নাসাহেব কিরলোস্কার। মঞ্চের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল। কর্ণাটকের সাংগীতিক অনুষ্ঠানগুলি তিনি দেখেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি এক মারাঠী নাট্য কোম্পানিতে যোগ দেন, এবং যে ধরনের নাটক তিনি জানতেন এবং দেখেছিলেন সেই ধরনের খান ছয়েক নাটক লেখেন। 1880 খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর নিজের কোম্পানি কিরলোস্কার নাটক মণ্ডলী গঠন করেন। ঐ কোম্পানির প্রথম নাট্যানুষ্ঠান হল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র স্বয়ং কিরলোস্কার-কৃত মারাঠী রূপান্তর। মারাঠী নাম ছিল শুধু 'শকুন্তলা' এবং অনুষ্ঠানের তারিখ হল 31 অক্টোবর, 1880।

কিরলোস্কার তাঁর রূপান্তরে 'দশাবতার' ছাঁচ সম্পূর্ণ বর্জন করেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ইতিপূর্বেই 1870 সালে জনৈক তুরামারি শেষগিরি রাও কর্তৃক কান্নাড়ায় অনূদিত হয়েছিল। তিনি এক নতুন আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মূল সংস্কৃত কলিগুলি অনুবাদ করার সঙ্গে পাদটীকায় সেগুলি কান্নাড়া গীতে রূপান্তরিত

ক'রে দিয়েছিলেন। সুরগুলি ছিল জনপ্রিয় গানের সুর, যার অধিকাংশ কর্ণাটক সংগীতধারা থেকে নেওয়া। কিরলোস্কার এই নতুন রীতির তাৎপর্য বুঝতে পেরে তাঁর 'শকুন্তলা'য় ঠিক ঠিক জায়গায় সহজ মারাঠীতে গীত সন্নিবিষ্ট করেন। তার ফলে গদ্য এবং সংগীতের এক সমন্বয় সৃষ্টি হয়। গদ্য নাটকীয় কাহিনীকে বহন ক'রে নিয়ে চলে এবং সংগীত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্ধন করে। এই ছাঁচ এক ঐতিহ্যের জন্ম দেয়, যা আজও মারাঠী মঞ্চে জনপ্রিয়। এই ধরনের নাটককে বলা হত সংগীত-নাটক। এই ছাঁচ প্রাচীন ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুর পক্ষে বেশ উপযোগী ছিল এবং সম্ভবত একটা আবহাওয়াও সৃষ্টি করত। সুতরাং প্রথম আমলে আমরা 'সৌভদ্র', 'মৃচ্ছকটিক', 'বিক্রমোর্বশীয়', 'শাপ-সম্ভ্রম', 'রামরাজ্য-বিয়োগ', প্রভৃতি নাটক সংগীত-নাটকের ছাঁচে রূপান্তরিত হতে দেখি।

সৌভাগ্যক্রমে মারাঠী মঞ্চ তার প্রথম কাল থেকেই ক্ষমতাবান গায়ক ও ক্ষমতাবান অভিনেতাদের আবিষ্কার করে এবং আবিষ্কার করে অল্প কিছু মহৎ প্রতিভাকে যাদের মধ্যে ঐ দুই শিল্পের মিলন ঘটেছিল। মারাঠী মঞ্চের প্রথম আমলের ইতিহাস হল গীতি-নাট্য, ক্ষমতাবান শিল্পী এবং ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার এক নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী। এক সময়ে তার উপর পূর্ণ আধিপত্য করেন দুই 'বিরাট' মানুষ। একজন হলেন নারায়ণরাও রাজহংস, যিনি বালগন্ধর্ব নামে সর্বজনবিদিত, অন্যজন হলেন কেশবরাও ভোঁসলে। বালগন্ধর্বের প্রথম শিক্ষা কিরলোস্কার নাটকমণ্ডলীতে, তবে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নিজের দল গঠন করেন, যার নাম গন্ধর্ব নাটক-মণ্ডলী। তাঁর এই সংগঠন ত্রিশ বছরেরও বেশি কাল মারাঠী

পেশাদার মঞ্চে রাজত্ব করে। কেশবরাও ভোঁসলেরও নিজের ছিল ললিত কলাদর্শ নাটকমণ্ডলী। মারাঠী মঞ্চের পক্ষে আর একটি শুভ ঘটনাও ঘটে ; তা হল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সক্রিয় সহযোগিতা। ঐ সব সাহিত্যিক হলেন খাদিলকর (লোকমান্য তিলকের শিষ্য), এন. সি. কেলকর (ঐ একই রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট সদস্য), রামগণেশ গদকরী (প্রতিভাধর কবি) এবং বি. ভি. ওয়ারেরকর, যিনি মামা ওয়ারেরকার নামে বেশি পরিচিত। খাদিলকরের নাটকে থাকত রাজনৈতিক ঝোঁক, গদকরীর নাটকে আবেগের প্রতি আবেদন এবং ওয়ারেরকরের নাটকে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে চেতনা। ওয়ারেরকরের নির্দেশনায় ললিত কলাদর্শ ক্রমে সামাজিক নাটকের অভিনয়ে ব্যাপৃত হয় এবং তার প্রযোজনা-পদ্ধতিকেও আধুনিক করে। গন্ধর্ব নাটকমণ্ডলী খাদিলকরের নাটক প্রযোজনাতেই প্রায় আত্মনিয়োগ করে, সে পৌরাণিক নাটকে চমকলাগানো দৃশ্যের প্রবর্তন করে। কিন্তু শুধু সংগীতই শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করত না। বালগন্ধর্ব একজন জন্ম-অভিনেতা ছিলেন। সুরাপান দোষ নিয়ে লেখা গদকরীর সামাজিক ট্র্যাজিডি ‘একচ পিয়ালা’য় তার পরিচয় তিনি দেন।

বস্তুত, অভিনয়ই মারাঠী পেশাদার মঞ্চের অগ্রগতিতে অনেকখানি সাহায্য করে। গণপতরাও যোশী, গণপতরাও বোডাস এবং (পরে) কেশবরাও দাতের মতো ব্যক্তিরা ছিলেন বিরাট অভিনেতা ; তাঁরা ভারতীয় বা বিদেশী যে-কোনো মঞ্চের মহত্তম অভিনেতাদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা গায়ক তো ছিলেনই না, পরন্তু প্রথম ও শেষজন সম্পূর্ণভাবে গদ্য-নাটকেই আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম যুগে শেক্স্‌পীয়ারের ‘হ্যামলেট’, ‘ওথেলো’ এবং ‘টেমিং অব দি শ্রু’-র

অনুবাদ এই গদ্য-নাটক জোগায়। বিদেশী নাটকের রূপান্তরে পারদর্শী ছিলেন জি. বি. দেবল; তাঁর 'ফাল্গুন রাও' (মলিয়েরের কমিডি) এবং 'মৃচ্ছকটিকে' (সংস্কৃত মূল থেকে) তার প্রমাণ তিনি দেন। 1881 খ্রীস্টাব্দেই গণপতরাও যোশীর নেতৃত্বে শাহুনগর-বাসী নাটক কোম্পানি গঠিত হয়েছিল; এই কোম্পানি গদ্য-নাটক নিয়েই সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত হয়। মহারাষ্ট্র নাটকমণ্ডলী নামক আর-একটি কোম্পানিও গদ্য-নাটকে আত্মনিয়োগ করে; কেশবরাও দাতে আত্মপ্রকাশ করেন এই কোম্পানি মারফত।

প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে প্রধান নাট্যদল-গুলি সময়ের সঙ্গে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। এই কারণে বর্তমান শতকের প্রথম দশ বছরে দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া মারাঠী মঞ্চে যথেষ্ট রকম প্রতিফলিত হয়। খাদিলকরই প্রথম ভারতীয় রাজ-নীতিকে মঞ্চে উপস্থিত করেন। তিনি সেই সময়কার অগ্রণী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের শিষ্য ছিলেন, এবং তিনি তাঁর কয়েকটি নাটকের মধ্যে দিয়ে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেন। খাদিলকর সংস্কৃত এবং শেক্স্পীরীয় নাটক অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক একটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডি, যার বিষয় হল বিজাপুর এবং বিজয়নগর এই দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা। এর পর তিনি আর-এক গৃহবিবাদের বিষয়ে লেখেন, সে বিবাদের পরিণতি এক পেশোয়ার আত্মহত্যায়। এই দুটি নাটক আত্মবিরোধের ট্র্যাজিডি রূপায়িত ক'রে স্পষ্টত ভারতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতীয়ের ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদনই জানায়। কিন্তু খাদিলকর এবং তাঁর মারফত মারাঠী মঞ্চ ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন 1907 সালে। পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর 'কীচক-

বধ' নাটকে তিনি দেখিয়েছিলেন দুর্বৃত্ত কীচক নায়িকার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করায় এক পৌরাণিক বীর (মহাভারতের) কীচককে বধ করে ; ঐ নাটকটি 1907-এ ভারত গভর্নমেণ্ট নিষিদ্ধ ক'রে দেয়। এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা 1904 সালে প্রথম যে পেশাদার কোম্পানি গঠন করেন, সেই মহারাষ্ট্র নাটকমণ্ডলীই এই ঐতিহাসিক নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে।

এই সব ঘটনার যোগাযোগের ফলে মহারাষ্ট্র উচ্চশিক্ষিত লেখকদের রচিত সুরেলা গীতি, অগ্নিগর্ভ ভাষণ এবং সতেজ সংলাপে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বিপুল উৎসাহে বিভিন্ন নাট্য কোম্পানি গঠিত হয়, আবার অত্যন্ত দ্রুত তারা বিলুপ্ত হয়। জনপ্রিয়তা অর্জন করা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি তাদের আগেকার সকল নাটকগুলির পুনরাবৃত্তি শ্রেয় মনে করে। জনপ্রিয় হওয়া মাত্রই অভিনেতারা কোম্পানির সঙ্গে বিবাদ ক'রে নিজেদের কোম্পানি গঠন করে এবং মাঝারি ক্ষমতার শিল্পীদের জড়ো করে। কোম্পানি নতুন হলে কি হবে, নাটক হত পুরোনো। এই সব কোম্পানি-প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতারা নিজেরাই হত কর্মাধ্যক্ষ, কোনো ব্যবসায়িক দক্ষতা না থাকায় তারা অল্পদিনের মধ্যেই আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াত। বস্তুত প্রথম মারাঠী সামাজিক নাটক জি. বি. দেবলের 'সংগীত শারদা' 1899 খ্রীস্টাব্দেই রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। মামা ওয়ারেরকর সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখছিলেন। কিন্তু পুরোনো সুর এবং পুরোনো প্রযোজনা-পদ্ধতি তাঁদের পক্ষে উপযোগী ছিল না, আর কোম্পানিগুলিও নতুন পদ্ধতি গ্রহণে রাজী ছিল না। একটি দুটি ব্যতিক্রম ছিল, যেমন ললিত কলাদর্শ কোম্পানি বা মহারাষ্ট্র নাটকমণ্ডলী।

পাঁচ

কলকাতায় বিশেষভাবে জনসাধারণের থিয়েটারের উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় পেশাদার মঞ্চ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে মহারাষ্ট্রে যে ধরনের গীতিনাট্য প্রচলিত হয়, সে ধরনের নাটক বাংলার পেশাদার মঞ্চকে অধিকার করেন নি। অন্যান্য অঞ্চলের অনেক আগে বৃটিশ প্রভাবে আসায় বাংলার পেশাদার মঞ্চ গদ্য-নাটক সৃষ্টি করে। সেই কালে বাংলা ছিল ভারত গভর্নমেণ্টের অধিষ্ঠান কেন্দ্র। সে ছিল সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মভূমি। ইংরেজী নাটক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এমন সব পুরাণ-কাহিনী নাট্যে রূপায়িত করা হয় যার তাৎপর্য নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যকে ব্যক্ত করতে সমর্থ।

মহারাষ্ট্রের মতো এখানেও পেশাদার থিয়েটার গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে আরম্ভ ক'রে শিশিরকুমার ভাদুড়ী পর্যন্ত বেশ কিছু বিরাট অভিনেতা সৃজন করে। মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক এবং নাট্যপ্রযোজনা এই সময়কার হলেও ভারতীয় থিয়েটারে এক নতুন প্রবণতার ঘোষণা স্বরূপ। আমরা পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

শহুরে থিয়েটার

এক

সাধারণের বিশ্বাস, ভারতীয় নাটকের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হল ভারতীয় ফিল্মের আবির্ভাব। কারণটা বেশ বিশ্বাসযোগ্যই শোনায়। নাট্যালয়গুলিকে সিনেমাগৃহে রূপান্তরিত করা, মঞ্চ-অভিনেতাদের মঞ্চ ছেড়ে ফিল্মে চলে যাওয়া এবং ফিল্মের স্ক্রিপট্ লিখতে নাট্যকারদের আকৃষ্ট হওয়া, এ-সব থেকে যেন এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সিনেমা নাটককে হটিয়ে দিতে কৃতকার্য হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক মূল্যায়ন হবে না যদি আমরা ভারতীয় থিয়েটারের ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করি। আমরা দেখেছি, 1930 সালের মধ্যেই বর্তমান পেশাদার মঞ্চের অবনতি শুরু হয়ে গিয়েছিল, যার কারণ তার নিজেরই সৃষ্ট। থিয়েটার তার নিজের ইচ্ছাতেই এক গহ্বরের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ; বড়জোর স্বীকার করা যেতে পারে যে, ফিল্ম তাকে করুণা ক'রে একটা ধাক্কা দেয়। প্রথম যুগে লোকে কৌতূহলের সামগ্রী হিসেবে সবাক্ চিত্রকে অভ্যর্থনা করে। তা হলেও এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে বহু বৎসর ধ'রে থিয়েটারে অভ্যস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল কিনা কিংবা শ্রোতৃমণ্ডলীই ছিল সম্পূর্ণ নতুন। থিয়েটার যদি তার

আগেকার সজীবতা বজায় রাখত, তা হলে সে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করানো নাট্যশালাতেও শ্রোতা-দর্শককে আকর্ষণ করতে পারত। ঐ সময়ের মঞ্চ-অভিনেতারা যদি ক্ষমতাবান হতেন এবং যদি তাঁদের যোগ্যতার জন্য জনপ্রিয় হতেন, তা হলে নাট্যানুষ্ঠানকে ফিল্ম হটিয়ে দিতে পারত না। নতুন নতুন নাটক যদি রচিত হত, তা হলেও থিয়েটার ফিল্মের সঙ্গে সফলভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারত। মহারাষ্ট্রে 1933 সালে পি. কে. আত্রে যখন তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মৌলিক কমিডি 'সাষ্টাঙ্গ নমস্কার' লেখেন, তখনই এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

আসল কারণটা অন্যত্র। নতুন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, এমন-কি প্রথম আমল থেকেই, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হচ্ছিল। ভারতীয় থিয়েটারের উপর ইংরেজীর কী বৈপ্লবিক প্রভাব পড়েছিল তা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি। থিয়েটার সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণাটাই বদ্‌লে যাচ্ছিল। শিক্ষিত ভারতীয় তরুণদের অনেকেই ইংরেজী নাটকের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের স্কুলে ও কলেজে ইংরেজী নাটক অধ্যয়ন করে। সেভাবে তারা নিজেদের সংস্কৃত নাটকও অধ্যয়ন করে নি। এইসঙ্গেই আবার 1857-র যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইংলণ্ড থেকে আমদানী সব-কিছুর প্রতি বিরূপতা ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল এবং দেশের ঐতিহ্যের প্রতি এক নবজাগ্রত সম্মানবোধ লালিত হচ্ছিল। আমরা এ কথা বলছি না যে এ সব জিনিষ সচেতন স্তরে ঘটছিল। শিল্প ও সাহিত্য উদ্গত হয় আরও গভীর এক স্তর থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরে শুধু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক নয়, কালিদাস, ভবভূতি, হর্ষ ও ভট্টনারায়ণের ('বেণীসংহার') নাটকও অনূদিত হয়। আমরা যা আন্দাজ করছি তাতে এই অদ্ভুত সহাবস্থানের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যা অন্যান্য

ব্যাখ্যার চেয়ে যুক্তিসংগত। বাংলা, মারাঠী কান্নাড়া ও তামিল ভাষা থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হচ্ছিল। রাজনৈতিক নেতারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে একটি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন: "আমরা কোটি.কোটি ভারতীয়। ইংরেজরা মুষ্টিমেয়। তবু তারা আমাদের উপর আধিপত্য করছে। কেন?" উত্তর কখনো কখনো নেতারাই জোগাতেন। একটি উত্তর হল: আমাদের সামাজিক জীবনই এর কারণ। আমরা আমাদের রীতিনীতি ও কুসংস্কারের দাস। আমাদের গোঁড়ামি, আমাদের বিবাহ-প্রথা, আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা এবং এই রকম অনেক জিনিষই আমাদের আধুনিক জীবনে ন্যায্যতাহীন, অসিদ্ধ। বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজ এবং বোম্বাইতে প্রার্থনা-সমাজের মতো সমাজ-সংস্কার আন্দোলন অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে অনেককে এক গভীর অসন্তোষের আবর্ত ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলেছিল। শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠছিল। আমরা দেখেছি, মারাঠীতে প্রথম সামাজিক নাটক 'সংগীত শারদা' রচিত হয় 1899 খ্রীস্টাব্দে। কান্নাড়া ভাষায় তখন অল্প কয়েকটি পেশাদার কোম্পানি ছিল যারা পৌরাণিক নাটক অভিনয় করত, তাতে সবই থাকত গানে, গদ্য সামান্যই থাকত। এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, কারোয়ারের এক ভদ্রলোক, যিনি বোম্বাইতে একটা প্রেস চালাতেন এবং একটা কান্নাড়া পত্রিকা বের করতেন তিনি 1887 খ্রীস্টাব্দে একটি সামাজিক নাটক লেখেন এবং সেটি যে তিনি সম্পূর্ণই গদ্যে লেখেন তাই নয়, লেখেন ঐ অঞ্চলের উপভাষায়। দেবলের 'শারদা'র বারো বছর আগে এটা ঘটে। তিনি নিশ্চয় জানতেন যে, ঐ নাটক

অভিনীত হবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। তবুও লেখক শ্রীভেঙ্কটরামণ শাস্ত্রী তাঁর অঞ্চলে ধনী বৃদ্ধদের বালিকা বধূ ক্রয়ের যে প্রথা প্রচলিত ছিল তাকে বিদ্রূপ ক'রে ঐ প্রহসন লেখেন। 'প্রকাশের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠছিল' বলতে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি।

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বাইরে নবশিক্ষিতেরা পেশাদার মঞ্চে যে ধরনের নাট্যানুষ্ঠান দেখত, সে সম্বন্ধে তাদের উচ্চ-ধারণা হত না। বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে অন্যান্য অনেক কারণ একযোগে পেশাদার থিয়েটারকে জীবিত ও বর্ধিষ্ণু রেখেছিল ; অনেক পরে যখন ঐ সব কারণ অন্তর্হিত হয়, তখন মোহভঙ্গ হয়। কিন্তু, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্ণাটকে শিক্ষিত তরুণদের নাট্যদল গঠনের প্রথম চেষ্টা আমরা দেখতে পাই 1905 সালে। তার এক বছর আগে অনুরূপ ধারায় মহারাষ্ট্র নাটকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি তারা কিভাবে সঙ্গে সঙ্গে খাদিলকরের রাজনৈতিক নাটকগুলি প্রযোজনার কাজ হাতে নেয়। কিন্তু ধারওয়ারের ভারত-কালোত্তেজক সংগীত সমাজের কোনো খাদিলকর বা দেবল ছিল না। সুতরাং তারা তুরমারির 'শকুন্তলা' প্রযোজনার সিদ্ধান্ত করে। এ-নাটকটি ছিল 'ভাবানুবাদ' হিসাবে অনবদ্য। এর সহজ গদ্য এবং গান পেশাদার কোম্পানিগুলির দ্বারা তৎকালে অভিনীত নাটক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 1909 সালে বাঙ্গালোরে অ্যামেচার ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন নামক এক সংগঠনের স্থাপনা। কিন্তু এটা পরের কথা। এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তা হল এই যে, পেশাদার থিয়েটার তার আদিকাল থেকে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে ব্যর্থ হয়, তার ফলে এক উপযুক্ত থিয়েটারের জন্য সন্ধান চলতে থাকে।

দুই

এই সন্ধান এখনও চলছে। এ সন্ধানের প্রকৃতি কী তা বুঝবার প্রকৃষ্টতম পন্থা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলি অধ্যয়ন করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় এক অলৌকিক ঘটনা। এক অভিজাত কবি ও শিল্পী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ্, রাজনীতিক, ছোটগল্প লেখক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবি হন। কিন্তু মূলত তিনি ছিলেন অন্তরে অন্তরে কবি। 1881 খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রথম নাটক 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনার আগেই তিনি তাঁর সময়কার বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন অভিনেতা ও নাট্যকার, এবং 1877 সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতাও অন্য অনেকের মতো পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটকের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ প্রচার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক থেকেই দেখা যায় তিনি তাঁর সমকালীন থিয়েটারের দ্বারা শুধু প্রভাবিত নন, তিনি সে থিয়েটার সম্বন্ধে অসন্তুষ্টও। ইংরেজী নাটকের আদর্শে রচিত ঐসব নাটক ছিল অতিনাটকীয় কার্যকলাপ ও দীর্ঘ ভাষণে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত-ভাবে অনুভব করেন যে, কালিদাসের মতো কবিদের রচিত প্রাচীন

সংস্কৃত নাটক তার চেয়ে ভালো। সেগুলি বহির্জগতের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপৃত নয়, ভিতরের মানুষই তাদের বিষয়। তাদের কাব্য-গুণ উৎকৃষ্টতর নাটক সৃষ্টির সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের প্রায় সমস্ত নাটক গীতিকাব্যধর্মী এবং ক্রিয়ায় মন্থরগতি। তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকে এক রাজা আছেন যিনি তাঁর মাথার চুলে পাক ধরেছে দেখে ইহলোক ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। জীবন সম্বন্ধে অথবা রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর আর আগ্রহ নেই। তিনি বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাতে চান না, তিনি বলেন: "কী হবে···? যমের পত্রই যেন সরালুম, কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না।" তিনি শুধু পণ্ডিতকে (শ্রুতিভূষণ) এবং পণ্ডিতের বৈরাগ্যবারিধি দেখতে চান। রাজা তাঁর সম্বন্ধে এবং শান্তি ও সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সংসার ত্যাগ করে তাঁর অরণ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করেন; তার উত্তরে শ্রুতি-ভূষণ বলেন: "এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য।" রাজার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়, তখন এসে প্রবেশ করেন কবি। রাজা সখেদে তাঁর পাকা চুলের উল্লেখ করেন। কবি বলেন: কিন্তু ও তো আসন্ন সমাপ্তির লক্ষণ নয়। আপনি "কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপর আবার নূতন রঙ লাগবে।" কিন্তু রাজা বিচলিত। তিনি বৈরাগ্য-বারিধি সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত।

> "ওহে কবিশেখর আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না।··· একটা যা-হয়-কিছু করো।···হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভাণ, কিংবা—"

"তৈরি আছে, কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।"

"যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব ?"

"না, মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।"

"তবে ?"

"...আমার এসব জিনিস...বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।"

"বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই ?"

"কিচ্ছু না।"

"তবে তোমার ও রচনাটা বলছে কী ?"

"ও বলছে, 'আমি আছি'। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায়, জল-স্থল-আকাশ তাকে চারিদিক থেকে ব'লে উঠেছে— 'আমি আছি'— তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে— 'আমি আছি'। আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।"

"তার বেশি আর কিচ্ছু না ?"

"কিচ্ছু না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই 'আমি-আছি'র জয়, জয় এই আনন্দময় 'আমি-আছি'র জয়।"

"ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।"

"সে কথা সত্য মহারাজ। আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না···"

"তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়···"

"ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।"

আমরা বোধ হয় এমন লোক নই যাদের "চুলে পাক ধরেছে।" পাকা চুল যার প্রতীক সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য আমাদের নেই। সেই কারণেই আমরা নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে এবং তাঁর গুণ গ্রহণ করতে অদ্যাবধি অপারগ। ছোট ও বড়, হাস্যচপল ও গম্ভীর, কাব্য ও গদ্য, সব মিলিয়ে তাঁর লেখা ত্রিশটির বেশি নাটকে একটি বিষয়ই প্রবহমান : মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে চিরন্তন সংঘাত। এ নাটকের আবেদন হৃদয়াবেগের কাছে, উত্তেজনার কাছে নয়, কারণ কবি মানুষের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। গদ্যই হোক, আর কাব্যই হোক, লিরিক সুর তাতে আছেই এবং এ নাটক যেহেতু সর্বজনীন সেই হেতু বিষয় রূপকাত্মক বা প্রতীকী। প্রকৃতি মানুষকে হৃদয় দিয়েছে। আর দিয়েছে বিচারবুদ্ধি, যা মনুষ্য-রচিত শাস্ত্র অনুসারে ন্যায় ও অন্যায় নির্ণয় করতে চেষ্টা করে। জয়সিংহ যেমন 'বিসর্জন' নাটকে বলে, হৃদয়ের বিধি শাস্ত্রবিধি নয়। এই নাটকে ব্রাহ্মণ রঘুপতি শাস্ত্রবিধির পক্ষে আর রাজা গোবিন্দমাণিক্য হৃদয়ের বিধির পক্ষে। রাজা ঘোষণা করেন যে, মন্দিরে আর রক্তপাত হবে না। কিন্তু কালীমাতা রক্ততৃষাতুরা, এবং রক্তপাত শাস্ত্রবিধি-সম্মত। সেনাপতি নয়নরায় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন : "যুগে যুগে যে পেয়েছে শতসহস্রের/ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ/তোমার কি আছে অধিকার?" রানী রাজাকে বলেন : "মন্দিরের/বাহিরে তোমার রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা/

নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।" রাজা ঘোষণা করেন : "ধর্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার/…দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে/রাজা বিপ্র সকলেরই আছে অধিকার।" কিন্তু ব্রাহ্মণ রঘুপতি লড়াই করতে ছাড়েন না। অবশেষে তিনি পরাজিত হন রাজার কাছে নয়, পরাজিত হন নিজের হৃদয়ের কাছে যখন তিনি দেখতে পান তাঁর প্রিয় শিষ্য জয়সিংহ তার আপন রক্ত দেবীকে উৎসর্গ ক'রে মৃত্যু-বরণ করেছে। রঘুপতি 'প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া' চিৎকার ক'রে বলেন :

"ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে !…
দেখো, দেখো, কি করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির ! তোরই কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে !
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা হা !
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া !
মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ।
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর ! দে ফিরায়ে !
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী !…
কার কাছে কাঁদিতেছি !
তবে দূর, দূর, দূর, দূর ক'রে দাও
হৃদয়দলনী পাষাণীরে ! লঘু হোক

জগতের বক্ষ।" (দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা নিক্ষেপ)

(রাণী গুণবতীর প্রবেশ)

গুণবতী : "জয় জয় মহাদেবী।
দেবী কই ?"

রঘুপতি : "দেবী নাই।...
কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।"

প্রতীকী নাটকগুলির মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী ও নাটকীয় হল 'রক্তকরবী' (1926)। এই নাটকে যান্ত্রিক যুগের এক রাজা রয়েছেন, যিনি নিজেই তাঁর নিজের সংগঠনে বন্দী। তিনি মানুষই ন'ন প্রায়, কারণ একেবারে শেষ পর্যন্ত তিনি সকলের দৃষ্টির আড়ালে শুধু এক কণ্ঠস্বর মাত্র। তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থিত রঞ্জন এবং নন্দিনী। রঞ্জন প্রেম এবং সৌন্দর্যের প্রতীক, নন্দিনী জীবনের আনন্দের। রঞ্জন মঞ্চে আসে না, মঞ্চে আসে শেষকালে তার মৃতদেহ যখন কণ্ঠস্বর অবশেষে দ্বার খুলে বেরিয়ে আসে রাজা রূপে। কণ্ঠস্বরের এই স্থির বিশ্বাস ছিল যে, সে যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন নন্দিনী ভয় পাবে। নন্দিনী জবাব দেয় :

"আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।"

—"ঘৃণা কর ? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।"

—"পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার-উদ্‌ঘাটন) ওকি ! ওই কে প'ড়ে ! রঞ্জনের মতো দেখছি যেন !"

—"কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।"

—"হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।"

—"ও কেন বললে না ওর নাম? কেন এমন স্পর্ধা ক'রে এল?"

—"জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন?"

—"ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না।— ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।"

—"রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জানো, ওকে জাগিয়ে দাও।"

—"আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের নাটকগুলি প্রযোজনা করেন এবং তাতে অভিনয় করেন। আমরা দেখতে পাই, পর্দার কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর কিংবা বাইরের কোনো সরঞ্জামের। তাঁর কাছে অভিনয় নানান্ অঙ্গভঙ্গী ও নড়াচড়ার দ্বারা ব্যক্ত কোনো অনুকরণ নয়। তা হল অভিব্যক্তির শিল্প, অনুকরণের নয়। যে-কোনো নিরিখেই বিচার করা হোক, তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে নিশ্চয় উল্লেখ্য 'মুক্তধারা', 'নটীর পূজা' এবং 'তাসের দেশ'।

এটা স্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথ সেই ধরনের নাটক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন যা নাটকের মূল উদ্দেশ্যের উপযোগী। তাঁর কাব্য-নাটকগুলি ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্যগত রূপকে মনে করিয়ে দেয়। তাঁর প্রতীকী নাটকগুলি তৎকালে প্রচলিত শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের

অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর কোনো নির্দেশ নেই, কারণ সত্যকার নাটক রচনার কাব্যে নিহিত। যেহেতু তিনি অর্থের অভিব্যক্তির উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন, সেই-হেতু নৃত্য-নাট্য নিয়েও তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কিন্তু এই কারণেই আবার অভিনেতা এবং শ্রোতৃমণ্ডলী উভয়েই সেগুলিকে দুরূহ মনে করত। যাই হোক, তা ছিল পেশাদার থিয়েটারের সামনে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ব।

বাস্তবতার প্রথম উপাদান প্রবর্তন করেন বিংশদশকে শিশির-কুমার ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের যোগ্যভাবে সহায়তা করেন দুইজন প্রতিভা-ময়ী অভিনেত্রী : প্রভা দেবী এবং কঙ্কাবতী। শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনয়ের ঐতিহ্যকে আরও অগ্রসর ক'রে নিয়ে যান এবং অনু-কৃতি-কলায় (ন্যাচারালিজ্‌ম্) অধঃপতন থেকে তাকে বাঁচান। শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর ছিল শক্তিশালী এবং বৈচিত্র্যময় এবং তাঁর মুখে আবেগের যে খেলা তিনি ফোটাতেন তা মহৎ শিল্পীর কাজ। নায়কের ভূমিকায় তিনি প্রকাশ-ক্ষমতার শিখরে পৌঁছতে পারতেন, আবার নিজেকে তুচ্ছ ক'রে ফেলতে পারতেন, ধোঁয়ার মতো উদ্‌বায়ী হয়ে অলক্ষ্যে নেপথ্যে অদৃশ্য হতে পারতেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপর অর্ধশতাব্দীকাল আধিপত্য করেন, তিনি অভিনয়শিল্পকে এক নতুন তুঙ্গবিন্দুতে নিয়ে যান। আনুষ্ঠানিক বাগ্মিতাময় অভিনয়কে আধুনিক বাস্তবানুগ অভিনয়ে রূপান্তরের কাজে তাঁর অবদান অন্য সকলের চেয়ে বেশি।

তিন

আগে বলেছি যে পেশাদার থিয়েটারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং প্রতিবাদ প্রথমে দেখা দেয় দক্ষিণে। সেখানে পেশাদার থিয়েটার সময়ের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক্, সময়কে মানতেই অস্বীকার করে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ছিল আরও উচ্চস্তরে, কার্যকর অমঙ্গলের বিরুদ্ধে শাশ্বত মঙ্গলের প্রতিবাদ। তবে আদর্শের ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করবার ধৈর্য সংখ্যাল্প শিক্ষিতদের ছিল না। তারা আশু ভবিষ্যতেই প্রতিকার চায়। নবজাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা তাদের অতীত সম্বন্ধে একটা গর্ব দিয়েছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সংস্পর্শ অন্ধ স্তুতির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দক্ষিণে প্রথম প্রায় সমস্ত ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের রূপান্তর করা হয়। যে-সব লোক পেশাদার থিয়েটার চালাত, তারা ছিল অশিক্ষিত। শিক্ষিতেরাই এইসব অনুবাদের প্রযোজনায় আগ্রহান্বিত হয়। তাদের কারো কারো কলেজে ছাত্রাবস্থা থেকেই মঞ্চ-অভিজ্ঞতা ছিল। নাট্যানুষ্ঠানের আধুনিক রীতি ব'লে যা তারা মনে করত, তা তারা শিখেছিল। কিন্তু তারা তখনও ঠিক থিয়েটার আন্দোলন সম্বন্ধে ভাবে নি। তাদের প্রয়াস ছিল একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে, অশিক্ষিতদের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারের

বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া। তামিলনাড়ুতে পেশাদার থিয়েটারের প্রতি অবজ্ঞা এত তীব্র ছিল যে, ঐ নামে পরিচিত হ'তে পারে এমন কিছু কখনও ছিল ব'লে প্রায় স্বীকারই করা হয় না। শুনতে পাই আধুনিক তামিল থিয়েটারের আরম্ভ 1904 সালে যখন সম্বন্ধ মুদালিয়রের নেতৃত্বে সুগুণ বিলাস সভা নামে একটি শখের সংস্থা স্থাপিত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তিরা তার সদস্য হয়। চার বছর পরে অ্যামেচার ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন ক'রে বাঙ্গালোর ঐ পথ অনুসরণ করে। তার ত্রিশ বছরের সক্রিয় জীবনে এই সংস্থা শিক্ষিতদের মধ্য থেকে নতুন নাট্যকার, ক্ষমতা-বান অভিনেতা এবং বিদগ্ধ সমালোচকের আবির্ভাব সম্ভব করে। সবচেয়ে পুরোনো সমিতিগুলির অন্যতম এই সমিতি সম্পূর্ণরূপে থিয়েটার-বিষয়ক একটি মাসিক পত্র বহু বৎসর চালায়। পত্রিকার নামটি ছিল যথাযোগ্য : 'রঙ্গভূমি'।

1920 সালের কাছাকাছি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যার জন্য শখের প্রচেষ্টা এক নতুন মোড় নেয়। উচ্চ সংস্কৃতিবান সংস্কৃতজ্ঞ পরিবারের শিক্ষিত আধুনিক এক যুবক ইংলণ্ডে উচ্চ শিক্ষা সমাপনের পর ফিরে এসে কান্নাড়া ভাষায় একটি নাটক লেখেন। তিনি অ্যামেচার ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। যুবকের নাম টি. পি. কৈলাসম এবং তাঁর নাটকের নাম 'তোল্লু গাত্তি' (ফাঁপা ও শক্ত)। প্রকৃতপক্ষে, 'তোল্লু গাত্তি' যথার্থ নাটকই নয়। তাতে তিনটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্য ছিল যার সঙ্গে একটি প্রস্তাবনা এবং একটি উপসংহার যুক্ত। পেশাদার মঞ্চের কয়েকটি উপাদান এ নাটকে ছিল, যেমন, এক আদর্শ নায়ক এবং এক পাকা দুর্বৃত্ত। কিন্তু শ্রোতা-দর্শকদের লক্ষ্যে এসব বিশেষ আসত না, কারণ

একেবারে প্রথম থেকেই প্রথাবহির্ভূত সব বৈশিষ্ট্য তাদের মনোযোগ প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। নাটকটি আরম্ভ করার জন্য কোনো সূত্রধার নেই, কোনো দেবতার কাছে প্রার্থনা নেই এবং কোনো গান নেই। যবনিকা যখন ওঠে (যবনিকারও কোনো প্রয়োজন নেই), তখন স্বয়ং গ্রন্থকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহীশূর মহারাজার ভ্রাতা যুবরাজের সম্মানে একটি কবিতা সুর ক'রে বলেন। তারপর তিনি একটি ভাঙা আয়না বের ক'রে তার মধ্যে তাকিয়ে তাঁর নিজেরই সম্মানে (আয়নায় যেমন প্রতিবিম্বিত) ঐ কবিতারই পরবর্তী অংশ বলে চলেন। এবং যখন তিনি তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী দেখে যে, সে-ভাষা তাদের নিজেদেরই দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা, কথ্য বাক্যের সঙ্গে ইংরেজীর মিশ্রণ। একজন 'অধ্যক্ষ' (প্রযোজক-পরিচালক) বন্ধু আছেন যাঁর সঙ্গে গ্রন্থকার নাটকটি নিয়ে আলোচনা করেন। গ্রন্থকার বলেন: "প্রথমেই বলতে হয়, এটা মোটেই নাটক নয়; এ এক বক্তৃতামালা; কিন্তু আমি আমার বক্তৃতার কথা যখন ঘোষণা করেছিলাম, তখন কেউ তা শুনতে আসে নি, সুতরাং এখন আমি তাকে নাটক ব'লে ঘোষণা করছি।" গ্রন্থকারের শ্লেষের লক্ষ্য কী তা আমরা জানি। পেশাদার মঞ্চের নাটকগুলিতে থাকত সতীত্ব, সত্যবাদিতা ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা, প্রায় প্রবন্ধ।

তিনটি দৃশ্যের কাহিনী দুই ভাই মধু ও পুত্তুকে নিয়ে। মধু লেখাপড়ায় কিছুই করতে পারে নি, কিন্তু তার অন্য সব গুণ আছে যা যুবকদের থাকা উচিত। পুত্তু লেখাপড়ায় খুবই ভালো করেছে এবং সে পরিবারের সমস্ত লোকদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। বাবা পুত্তুকে পুরস্কার দেন এবং মধুকে দেন শাস্তি। মা শয্যাশায়ী

শেষ দৃশ্যে, বাড়িতে আগুন লাগে। পুত্তু তখন নির্বিকার ভাবে পালায়, কিন্তু মধু নিজে মরবার ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের বাঁচায়। একেবারে শেষে একজন প্রতিবেশী বাবাকে বলে: "মশায়, এখন দেখছেন পার্থক্যটা কি (দুই ছেলের মধ্যে)? পরীক্ষায় কেউ পাস করল কি ফেল করল তাতে কী আসে যায়? যা ফাঁপা তা ফাঁপাই থাকবে এবং যা শক্ত তা শক্তই থাকবে।" এর পর এক উপসংহার আছে যাতে গ্রন্থকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার সমস্ত ত্রুটি ও অসুবিধা বর্ণনা করেন।

আগেই বলেছি পঞ্চাশ বছর পরে ওটিকে মহৎ নাটক ব'লে স্বীকার না করলে তা যুক্তিসংগতই হবে। গ্রন্থকারের নিজেরও সে সম্বন্ধে কোনো মোহ ছিল না। কিন্তু ওটি প্রথম নাটক যাতে চরিত্রেরা শুধু যে সাধারণ লোক ছিল তাই নয়, তারা মঞ্চে কথা বলে মঞ্চের বাইরে কথা বলার মতো। এবং সে সময় মধ্যবিত্তের মনে যে-ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল তাই ছিল নাটকের বিষয়। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় এক সাধারণের পাঠাগার, পরের দুটি দৃশ্যে বাড়ির দুটি পৃথক ঘর। দ্বিতীয় দৃশ্য যখন আরম্ভ হয়, তখন মঞ্চের এই বর্ণনা দেন: "হিরিয়ান্নায্যের (পিতার) বাড়ি; সামনের একটি ঘরে হিরিয়ান্নায্যের অসুস্থ পত্নী (নাম ভাগীরথাম্মা) বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। তার কাছে এক দোলনায় তার সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি ঘুমোচ্ছে। পুত্তু এক টেবিলের সামনে ব'সে আছে, টেবিলের উপর এলোমেলো বইয়ের স্তূপ। মধুর টেবিলও সেখানে রয়েছে, তার উপর রয়েছে বল আর ডাণ্ডু।" দৃশ্যটি যে-কোনো সংলাপের মতোই মুখর। আমরা জানতে পারি যে, পুত্তু পড়ুয়া ছেলে এবং মধুর আগ্রহ বাইরের খেলাধুলোয়। এই প্রথম আমরা এক নাটক

পাই যাতে নিষ্প্রাণ বস্তুরাও কিছু বলে। তারা অন্য চরিত্রদের থেকে পৃথক নয়। এ মঞ্চ শুধু চোখ ভরায় না, চোখে জিজ্ঞাসা ফোটায় এবং চোখকে দিয়ে উপলব্ধি করায়। পরিশেষে বলা যায়, এই প্রথম নাটক যা সামান্য পরিশ্রমে এবং অত্যন্ত কম খরচে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়।

সামাজিক শ্লেষ বরাবরই দক্ষিণে পেশাদার ও শৌখীন থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এমন-কি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তেলুগুতে গুরজাদ আপ্পারাও (যাঁর নাটক 'কন্যাশুল্কম' প্রায় ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে) প্রমুখ লেখকেরা শক্তিশালী সামাজিক শ্লেষ রচনা করেন। প্রথম জনপ্রিয় তামিল সামাজিক নাটক, কাশী বিশ্বনাথ মুদালিয়ারের 'দম্বকারী বিলাসম' ঐ একই সময়ে লেখা হয়। কিন্তু শুধু এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেই এই নাটকগুলি একটা বিশেষ শ্রেণী হিসেবে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে। এ নাটকগুলি গদ্যে লিখিত, গানের উপলক্ষ এতে কম, নৃত্যের তো একেবারেই নেই ; সুতরাং পেশাদারি থিয়েটার এগুলি পরিহার করত। সাধারণত স্কুল ও কলেজে এগুলি মঞ্চস্থ হত বিশেষত এই কারণে যে, এগুলিতে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং মঞ্চ-সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল না। কোনো বিশেষ মঞ্চেরও দরকার হত না। যে-কোনোরকম মঞ্চ হলেই চলত।

এই সব কলেজ-অনুষ্ঠানই শখের থিয়েটারের গোড়া পত্তন করে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে সেই সময়ে নাটক রচনায় এক রকম পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়। বিশেষত, প্রায় সমস্ত ভাষাতেই শেক্স্পীয়ার এবং অন্যান্য ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর প্রকাশিত হচ্ছিল। শিক্ষিত তরুণেরা এগুলির কোনো কোনোটি

তাদের কলেজ জীবনে ইংরেজীতে অভিনয় ক'রে থাকবে। তাদের নিজেদের ভাষায় সেগুলির পুনরভিনয় করার লোভ স্বাভাবিক ছিল। তারা জনসাধারণকে দেখাবে কী উপাদানে আধুনিক ও উৎকৃষ্টতর নাটক তৈরি হওয়া উচিত।

এইভাবে, যেখানেই নতুন নাট্যকার ও নতুন নাটক দেখা দিয়েছে, সেখানেই শিক্ষিত তরুণেরা একটা দল গঠন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দল এমন এক নাট্যকারের রচনা নিয়ে ব্যাপৃত হয়েছে যিনি আর লোকসমক্ষে নেই। 1909 সালে ভারতেন্দু নাটকমণ্ডলী নামে একটি দল বারাণসীতে সংগঠিত হয়। বিশেষ ভাবে ভারতেন্দুর নাটকগুলি ছাড়াও অন্যান্য নাট্যকারদের রচনা প্রযোজনা করা তার উদ্দেশ্য ছিল। কুড়ি বছর পরে, সঠিকভাবে বলতে গেলে 1927 সালে, কর্ণাটকে প্রতিভাবান লেখক বাসুদেবাচার্য কেরুরের স্মৃতিতে বাসুদেব বিনোদিনী সভা নামক একটি দল বগল-কোটে সংগঠিত হয়। কেরুর শেক্স্পীয়ারের নাটকগুলি রূপান্তরিত করেন ; তিনি চরিত্রগুলির ভারতীয় নামকরণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় আবহাওয়ার উপযোগী ক'রে নাটকগুলিতে অদলবদল করেন। তাঁর এই রূপান্তর অতীব নিপুণ। গোল্ডস্মিথের 'শী স্টুপ্স্ টু কংকার'-কে যেভাবে তিনি তাঁর ভাষায় প্রকাশ করেন, তা রূপান্তরের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। গোল্ডস্মিথের মূল রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হলেও কেউ তাঁর প্রভাব আঁচ করতে পারবে না। উপরি-উক্ত শখের সমিতি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সব উৎকৃষ্ট রচনা থেকে কান্নাড়া মঞ্চ বঞ্চিত ছিল।

ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটককে লালন করেছে মন্দির ও প্রাসাদ, মধ্যযুগীয় নাটক, লোকনাটক ও পেশাদার নাটককে লালন করেছে সর্বসাধারণের

থিয়েটার এবং আধুনিক শখের নাটককে লালন করেছে কলেজ থিয়েটার। এই তিনটি ঘটনাই ঘটে সর্ব-ভারতীয় স্তরে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাঞ্জাবীর উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে পার্সী থিয়েটারই ছিল পাঞ্জাবীর আদর্শ এবং তাইতেই সে সন্তুষ্ট ছিল। আমরা শুনি, জনৈক ইংরেজী অধ্যাপকের পত্নী শ্রীমতী নোরা রিচার্ডসের চেষ্টার ফলে 1913 সালে পাঞ্জাবী আধুনিক মঞ্চের জন্ম হয়। প্রথম নাটকগুলিতে অধিকাংশ বিষয় ছিল 'সামাজিক'। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চেতনা ছিল তার কারণ। আর একটি আংশিক কারণ ছিল এই যে, চাকুরিতে নিযুক্ত লেখকদের পক্ষে তা ছিল নিরাপদ বিষয়। স্ত্রীশিক্ষার মতো বিষয় যেমন জনপ্রিয় ছিল কলেজের বিতর্ক-সভায়, তেমনই শখের রঙ্গমঞ্চে।

নতুন লেখক-শ্রেণী এবং নতুন ধরনের নাটক মঞ্চ সম্বন্ধেই শিক্ষিতদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়। এ যেন না মনে করা হয় যে, শখের থিয়েটার সমাজ-চিন্তায় কোনো বিপ্লব সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সেই প্রথম আমলে এই সব 'সামাজিক' নাটক সমস্যা-নাটক ছিল না, ভারতীয় থিয়েটারী ঐতিহ্যে তারা ছিল 'সমাধান'-নাটক। কোনো গ্রন্থকার তাঁর নাটকে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলতেন স্ত্রীশিক্ষা ক্ষতিকর অথবা মঙ্গলজনক। তিনি সমাধানটা কদাচিৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর হাতে ছেড়ে দিতেন। অন্য কয়েকটি দিক থেকেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। নাটক যে শুধু পৌরাণিক বীর ও রাজারাজড়ার বিষয় নিয়েই হওয়া নিষ্প্রয়োজন, নাটক মানেই যে নাচগান-সম্বলিত দৃশ্য-পরম্পরা নয়, সংলাপ নাটকের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদি নাও হয় তবু তা যে একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ এবং পরিশেষে নাটককে যে সাহিত্যিক রচনা হতে হবে, এই ব্যাপারগুলি বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া

হয়। এ যাবৎ অধিকাংশ মঞ্চস্থ নাটক মুদ্রিত পুস্তকরূপে পাওয়া যেত না, কিন্তু এক নতুন যুগ শুরু হল যখন নাটক রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকল। এ যাবৎ শুধু বাংলায় এবং মারাঠীতে নাটক পৌরাণিক হলেও, লিখে ছাপানো হ'ত, অন্যান্য ভাষায় হ'ত ক্বচিৎ কখনও।

কিন্তু শখের থিয়েটারের জন্মই লিখিত নাটকের যুগের সূত্রপাত করে।

চার

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক আরম্ভ হয় এক বিরাট ঘটনা নিয়ে, যা অনতিবিলম্বে ভারতীয় জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে। 1920 সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু ক'রে দেন। বয়কটের এক রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি জনসাধারণকে দেন এক নির্ভীক মনোভাব এবং আত্মবিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বোধ এবং এক জাতিত্বের আদর্শ। তা ছিল যতখানি রাজনৈতিক আন্দোলন, ততখানি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লব। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী অংশকে গান্ধীবাদের এই প্রথম তরঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে থাকুন বা নাই থাকুন, প্রত্যেক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এক বৈপ্লবিক মনোভাবে উদ্দীপিত হন।

ভারতীয় থিয়েটারের উপর এই ঘটনার অভিঘাত সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয় নি। মহারাষ্ট্রে তখন পেশাদার থিয়েটার ছিল গৌরবের শিখরে। সেখানে থিয়েটার ইতিহাসের বড় ঘটনা 1921-এর 8 জুলাই বোম্বাইতে খাদিলকরের গীতিনাট্য 'মনপমান'-এর অনুষ্ঠান। এতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন বাল গন্ধর্ব এবং নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পেশাদার থিয়েটারের আর এক জ্যোতিষ্ক, কেশবরাও ভোঁসলে। শুধু যে গ্রন্থকার এবং দুইজন অভিনেতা জনপ্রিয় ছিলেন তাই নয়। পরন্তু যে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঐ অনুষ্ঠান করা হয় সেই অর্থভাণ্ডারের নামকরণ মহৎ নেতা লোকমান্য তিলকের নামে করা হয়। তাকে বলা হয় তিলক স্বরাজ ফাণ্ড, মহাত্মা গান্ধী তার উদ্‌বোধন করেন।

কিন্তু গান্ধী আন্দোলনের সঙ্গে পেশাদার থিয়েটারের সেই শেষ সংযোগ। যে নির্মম অত্যাচার শীঘ্রই শুরু হল, তাতে পেশাদার থিয়েটার ভয় পেয়ে গেল পাছে বিদেশী শাসকশ্রেণী তার প্রতি রুষ্ট হয়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার ক'রে নতুন নাটক লেখার ও অভিনয় করার দু-একটা চেষ্টা বিভিন্ন জায়গায় বুদ্ধিজীবী দল করে। সেগুলি দমন ক'রে দেওয়া হয়। বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা নতুন ক'রে লিখে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা হয়।

আমাদের শাসকদের লিখিত ইতিহাসে যে-সব ভারতীয় ছিলেন দুর্জন, নতুন নাটকে তাঁরা হলেন বীর নায়ক।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মনোভাব বর্ণনা ক'রে মারাঠী ইতিহাস থেকে বিভিন্ন ঘটনাকে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু যত নাটক অভিনীত হয় তার চেরে বেশি লেখা হয়। ঐসব পাঠ্যপুস্তক এবং নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়।

যে শখের থিয়েটার প্রধানত ছিল শিক্ষিতদের সৃষ্টি, তাকেও ভুগতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্যান্য অঞ্চলের মতো অন্ধ্রেও দেশের মেজাজের উপযোগী ঐতিহাসিক নাটক পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ছাত্রেরা দল সংগঠন করে। কিন্তু এইসব প্রয়াস গভর্ণমেণ্ট চূর্ণ ক'রে দেয়।

শোনা যায়, অনেক তরুণ নাট্য-তৎপরতায় ব্যর্থমনোরথ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান বাঞ্ছনীয় মনে করে।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন নাট্যকারদের অনুপ্রাণিত করে এবং আমরা দেখতে পাই এই যুগে প্রধানত শখের থিয়েটারের উপযোগী বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়। এখানে হিন্দী কবি ও নাট্যকার জয়শঙ্কর প্রসাদের উল্লেখ নিশ্চয় করা উচিত। তিনি এই সময় ঐতিহাসিক নাটক লেখেন। প্রসাদ ছিলেন প্রধানত কবি। বাইরের জগতে কার্যকলাপের আকারে মনের যে অন্তর্লীন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ পায় তার চেয়ে মনের অন্তর্লীন ক্রিয়া সম্বন্ধেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপন করবার জন্য তাঁর বিষয়গুলি নির্বাচন করেন। দেশাত্মবোধ ছাড়াও এক আদর্শানুরাগের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন।

নাটকে যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তাঁর সময়কার পেশাদার থিয়েটার পছন্দ করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর চরিত্রগুলি প্রচলিত ছাঁচ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রকৃতপক্ষে, পেশাদার মঞ্চের নাটকে চরিত্র-চিত্রণ ব'লে কিছু প্রায় ছিলই না। সব চরিত্রই লেখকের মুখপাত্র হ'ত এবং সংলাপের মধ্যেও লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিত, ঐ বক্তৃতাগুলিও হ'ত আবার বিবরণমূলক

অথবা অতিনাটকীয় অথবা উপদেশাত্মক। আমরা কখনই চরিত্রগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারতাম না, কারণ তাদের কৃত্রিম কথার জন্য একটা দূরত্ব থেকেই যেত।

এই প্রথম আমরা দেখলাম এক নাট্যকারকে যিনি তাঁর চরিত্রগুলিকে তাদের এক স্বকীয়তায় মণ্ডিত করলেন। তারা তাদের মনের ক্রিয়া আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করে। দ্বিতীয়ত, যে সংঘাত নাটকের এক বিশেষ গুণ তা প্রসাদের নাটকগুলিতে দেখা যায়। সংঘাত বলতে দেবতা ও দানবের মধ্যে অথবা আদর্শ নায়ক ও নির্ভেজাল দুর্জনের মধ্যে কোনো হিংস্র সংঘর্ষ বোঝাবে এমন কোনো কথা নেই। একই মানুষের মধ্যেও সংঘাত থাকতে পারে, যেমন তার দেশাত্মবোধ ও তার কর্তব্যবোধের মধ্যে। সংঘাত বলতে একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের সংঘর্ষ বোঝাবে এমন কথাও নেই। যখন দুই সংস্কৃতি পরস্পরের সম্মুখীন হয়, যেমন চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে গ্রীক ও হিন্দু সংস্কৃতি, তখনও সংঘাত দেখা দিতে পারে। প্রসাদের কবিসত্তা তাঁর মধ্যের নাট্যকারকে সাহায্য করে এবং আমরা তাঁর লেখনী থেকে এমন এক ধরনের নাটক পাই যা এক নতুন থিয়েটারের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু সময় অনুকূল ছিল না। একমাত্র বুদ্ধিজীবীরাই এই সব নাটককে কাজে লাগাতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা তৎকালীন সক্রিয় রাজনীতির ধূলি ও উত্তাপে বেশি আকৃষ্ট হন। তা সত্ত্বেও নতুন থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রসাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না।

পাঁচ

1930 সালের মধ্যে শৌখীন থিয়েটারের লক্ষণগুলি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পায়। গভর্নমেণ্টের নিপীড়ন রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমন ক'রে থাকতে পারে বা না ক'রে থাকতে পারে, কিন্তু তা 1920 সালে যে নতুন মনোভাব জাগ্রত হয় তাকে তা দাবিয়ে দিতে পারে নি। দশ বছরের মধ্যে ভারতের সর্বত্র সাহিত্যের এক উৎসার ঘটে। যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, নাট্যকারেরা আবিষ্কার করেন একাঙ্কিকা। তার প্রয়োগগত দিক ছাড়াও তার সংক্ষিপ্ত রূপই কলেজ থিয়েটারকে উৎসাহিত করে। 1930 ও 1939-এর মধ্যে একাঙ্কিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। সেগুলিতে অনুপ্রাণিত করবার মতো গুণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের ফলে সেগুলি কলেজ থিয়েটারকে ব্যাপৃত রাখতে পারত। যে কাশ্মীর এ-কাহিনীতে প্রায় আসেই না, সেখানেও শুনি 1938 সালে এস. পি. কলেজ অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব 'কাশ্মীরী নাটক পুনরুজ্জীবিত করার জন্য' উদ্যোগী হয়। শোনা যায়, পাঞ্জাবীতে 1935 ও 1947-এর মধ্যে রচিত নাটকের শতকরা 70 ভাগ ছিল একাঙ্কিকা।

1920 থেকে 1930 পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে শৌখীন থিয়েটারের উদ্যমহীনতা এবং পেশাদার থিয়েটারের ভাঙন যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল, তা এখন এক নতুন প্রজন্মের তরুণেরা পূর্ণ করতে থাকে।

তারা থিয়েটারে আগ্রহী তো ছিলই, উপরন্তু ভারতবর্ষের বাইরের থিয়েটার সম্বন্ধে তাদের পরিচয় ও অভিজ্ঞতা ছিল। নতুন নাট্য-কারদের এবং নতুন প্রযোজনাকে উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে অন্ধ্র 1928 সালে এক নাট্যকলা পরিষদ সংগঠিত করেছিল। এই অন্ধ্রেই বেলারির টি. রাঘব শেক্স্পীয়ার-নাটকের এক বিরাট অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 1930 সালে অন্ধ্রে শৌখীন থিয়েটারের ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি হয় যখন তিনি রাজামান্নারের নাটক 'থাপ্পে-বারিদি' (কার দোষ) প্রযোজনা করেন। এ-নাটক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, এর প্রযোজনা-পদ্ধতিও নতুন। মহারাষ্ট্রে 1932 সালে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের এক উৎসাহী দল নাট্য মন্বন্তর লিমিডেট নামে এক নতুন সংস্থা গঠন করেন; তাঁদের প্রথম প্রযোজনা 'অঞ্চলঞ্চি শালা', এটি এক নরউইজান নাটকের রূপান্তর। "তাদের সংগঠিত ও সক্রিয় প্রতিবাদ ছিল অভিনয়ের গতানুগতিক ধাঁচের বিরুদ্ধে, নাটুকেপনার বিরুদ্ধে, গলাবাজির বিরুদ্ধে, বিকৃতিসর্বস্ব স্বগতোক্তির বিরুদ্ধে, যে আঁকা কাপড়ের পর্দা দৃশ্যের শেষে গোটানো এবং খোলা হ'ত তার বিরুদ্ধে, অতিরঞ্জন এবং আতিশয্যের বিরুদ্ধে, সংলাপের মধ্যে নির্বিচারে গান গাওয়ার বিরুদ্ধে, তারকাপ্রথার বিরুদ্ধে, বিশেষ বিশেষ অভিনেতাকে মনে রেখে নাটক লেখার বিরুদ্ধে, এবং স্ত্রীভূমিকায় পুরুষের অবতীর্ণ হওয়ার জঘন্য রেওয়াজের বিরুদ্ধে।"—('দি মারাঠী থিয়েটার', পৃ 51)

এ হল একই সঙ্গে পেশাদার থিয়েটারের মৃত্যু ঘোষণা এবং শৌখীন থিয়েটারের মঙ্গলাচরণ।

এই প্রচেষ্টা তার অত্যুৎসাহের জন্যই বেশিদিন বাঁচতে পারে নি। কিন্তু তার উদ্গাতাদের মধ্যে ছিলেন নতুন নাট্যকার অনন্ত

কানেকার, নতুন প্রযোজক-পরিচালক কে. নারায়ণ কালে এবং প্রতিভাশালী অভিনেতা কেশবরাও দাতে প্রমুখ ব্যক্তিরা। উপরে উল্লিখিত তেলুগু নাটকটিতে মেয়েরাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করে। শখের থিয়েটার এইভাবে সংগঠিত হবার পথে অগ্রসর হয়।

এই যুগে কর্ণাটকে বেশ কয়েকজন নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব হয়। কে. ভি. পুত্তাপ্পার মতো তরুণ কবিরা, বি. এম. শ্রীকান্তা-ইয়ার মতো প্রবীণ বিদ্বজ্জনেরা কাব্য-নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকান্তাইয়া গ্রীক ট্র্যাজিডির আদর্শে প্রাচীন কান্নাড়ায় লেখেন 'অশ্বত্থামান'। এসব নাটক কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়। মস্তি ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার এবং সি. কে. রামাইয়ার মতো প্রতিষ্ঠিত গল্প-লেখকেরা নতুন সামাজিক নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। ইবসেনের নাটকগুলি অনূদিত হয়। বাঙ্গালোরের এ. ডি. এ. এসব নাটক অভিনয় করে। বেলারির টি. রাঘব (যিনি কান্নাড়াও জানতেন) এবং কৈলাসম ও অন্যেরা এই সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সব নতুন নাটক নিয়ে বাসুদেব বিনোদিনী সভাও ব্যাপৃত হয়। 1933 সালে কান্নাড়া অ্যামেচার্স নামে এক শখের দল স্থাপিত হয়; নতুন নাট্যকার শ্রীরঙ্গ (ছদ্মনাম) এবং তাঁর বন্ধুরা এটি স্থাপন করেন। এই প্রথম একটি অঙ্কের মধ্যে কোনো দৃশ্য-বিভাগ ছাড়াই সামাজিক সমস্যা বিষয়ক নাটক রচিত হয় এবং পর্দার ব্যবহার ছাড়াই প্রযোজিত হয়। কুড়ি বছর ধ'রে এই দলটি সক্রিয় ছিল। তারা ধারওয়ারে একাধিকবার তো বটেই, কর্ণাটকের বারোটির বেশি শহরে এবং বোম্বাই, পুণা ও হায়দ্রাবাদেও কুড়িটিরও বেশি মৌলিক নাটক অভিনয় করে। নতুন নাটক রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শখের দল গঠিত হয় এবং একাঙ্কিকা

রচিত হওয়ায় স্কুল ও কলেজের থিয়েটার সক্রিয় থাকে। নতুন তৎপরতা যে-সব অঞ্চলে শুরু হয়, সর্বত্রই সংবাদপত্রে এবং কলেজী পত্র-পত্রিকায় এক সমালোচনাও প্রকাশ হতে শুরু করে।

হিন্দীতেও এই সময়টা ছিল একাঙ্কিকার যুগ। উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক, রামকুমার বর্মা, উদয়শঙ্কর ভট প্রমুখ নাট্যকারেরা এবং অন্য অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে, কিন্তু প্রধানত সামাজিক বিষয়ে একাঙ্কিকা লেখেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব লেখকের মনোযোগ পড়ে সামাজিক বিষয়ের উপর। গান্ধীজীর লবণ-সত্যাগ্রহ ভারতীয় নারীদের বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগদানে অনুপ্রাণিত করেছিল; হরিজনদের প্রশ্নে তাঁর অনন্য-সাধারণ আমৃত্যু অনশন সুপ্রাচীন জাতিভেদ-ব্যবস্থার ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছিল। নারীদের সমস্যা, হরিজনদের সমস্যা এবং অনুরূপ সব সামাজিক সমস্যা নাট্যকারদের মন বিচলিত করে। একাঙ্কিকা শুধু এক শক্তিশালী মাধ্যমই ছিল না, তা এক রমণীয় ও সহজসাধ্য মাধ্যমও ছিল। তখনকার পত্রিকাগুলি একাঙ্কিকা প্রকাশকে জনপ্রিয়তার এক উত্তম বিজ্ঞাপন ব'লে বুঝতে পারে। এবং এইসব একাঙ্কিকা শুধু নতুন নাট্যকার নয়, নতুন অভিনয়-কুশলীরও আত্মপ্রকাশ সম্ভব করে। পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট মিনিটের মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করার জন্য এক শ্রেষ্ঠতর অভিনয়-ক্ষমতার প্রয়োজন হ'ত। একাঙ্কিকাগুলি নাট্যদলকে নাটক-প্রযোজনার এক প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করতেও সাহায্য করে। সে বাধা হল নাট্যশালার সমস্যা। 1930 ও 1940-এর মধ্যে দেশের বহু অংশে বেশ-কিছু নাট্যশালা সিনেমাগৃহে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু

সামাজিক একাঙ্কিকা যে-কোনো সাধারণের ব্যবহার্য কক্ষে, এমন-কি কোনো ক্লাস ঘরেও অভিনীত হতে পারত।

ঐসব একাঙ্কিকা থেকে উদ্ভূত এক গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি আজ ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের দূরত্বে সহজে আমাদের নজরে আসে। কিন্তু এটা সম্ভব যে, লেখকেরা সেই স্রোতে নিজেরা ছিলেন ব'লে তা অনুভব করতে পারেন নি। আদিকাল থেকে মহাকাব্য এবং পুরাণ ছিল বিভিন্ন ভাষায় নাটকের সাধারণ উৎস। হাজার হাজার বছর পরে আর এক সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় থিয়েটার এক আদর্শ পেল প্রধানত শেক্‌স্‌পীয়ার ও অন্য কারো কারো ইংরেজী নাটকে, কখনও কখনও অন্য ইয়োরোপীয় ভাষাতেও, তবে ইংরেজী ভাষার মারফত। প্রত্যেক ভারতীয় ভাষাই ঐসব থেকে গ্রহণ করে। এর কিছু পরে ভারতীয় ইতিহাসই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নাটকের বিষয় জোগায়। তবে ঐ রকম সাধারণ উৎস থেকে ঐক্যবোধের চাইতে এক ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্কের বোধ সঞ্চার বেশি সম্ভব ছিল। কিন্তু ত্রিশের দশকে যা ঘটছিল তা এক সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। আগেকার দিনে নাট্যকারেরা যে-সব বিষয় নিয়ে লিখতেন, তা তাঁরা জানতেন বই পড়ে। সে-সব বিষয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, প্রধানত তাঁরা সে-সব বিষয় ব্যবহার করতেন তাঁদের নিজেদের মতামত সুবিধামতো প্রচারের জন্য। কিন্তু এখন অস্পৃশ্যতা, বেশ্যাবৃত্তি, অসবর্ণ বিবাহ, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার নিয়ে লিখতে গিয়ে তাঁরা লিখছিলেন এমন সব বিষয়ে যা তাঁদের চারদিকে সমসাময়িক সমাজে ঘটছিল। এবং তাঁরা জ্ঞাতসারে উপলব্ধি না করেও ভারতীয় জাতির মুলগত ঐক্যের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। যদি প্রকাশের বাহ্যমাধ্যম ভাষাকে

ভুলে যাওয়া যেত, তা হলে দেখা যেত চরিত্রগুলি এমন বিষয়ে কথা বলছে যা সমকালীন অন্য যে-কোনো ভারতীয়ের পক্ষে পরিচিত। আগেকার দশকে প্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে এবং যোগেশ চৌধুরী রচিত 'সীতা'র মতো বাংলা নাটকগুলিতে নাট্যকারেরা চরিত্রগুলিকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন সুপ্রাচীন অতীতের মানুষ হিসেবে নয়, জীবন্ত মানুষ হিসেবে, এবং সেইভাবেই ঐ-সব চরিত্রের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তবুও এ সত্য থেকেই গিয়েছিল যে, ঐ চরিত্রেরা এক সুদূর অতীতের বাসিন্দা এবং আমাদের থেকে সুদূর। কিন্তু এখন যে-সব সামাজিক একাঙ্কিকা লেখা হতে লাগল, তা ভারতের যে-কোনো অঞ্চলে যে-কোনো ভাষাতেই লেখা হোক, তা সমস্ত দেশের লোকের অনুভব ও বাস্তব অভিজ্ঞতার এলাকার মধ্যে পড়ে। আধুনিক ভারতীয় নাটক যে এক ও অদ্বিতীয়, তার প্রমাণ থাকলেও তখনও তা স্বীকৃতি পায় নি। সে স্বীকৃতি হুড়মুড় ক'রে আমাদের উপর এসে পড়ল আর-এক পৃথিবী-কাঁপানো ঘটনার পরিণামে।

ছয়

সাধারণভাবে 1930-এর পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় ; তার ফলে এক 'প্রগতিশীল' প্রবণতা অথবা যাকে বলা হয় বামপন্থী মনোভাব— আত্মপ্রকাশ করে। এই

'প্রগতিশীলতা'র ধারণা সাহিত্যেও চড়াও হয় এবং দেশের সর্বত্র 'প্রগতিশীল' কবিতা, গল্প ও নাটকের এক বন্যা শুরু হয়। ঘৃণার আধুনিকতম লক্ষ্য হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় একনায়ক-তন্ত্র, ইতালীতে যার রূপ ফাশিজম্ এবং হিটলার-জার্মানীতে নাৎসীজম্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে লেখকেরা এক নিখিল ভারত প্রগতিবাদী ভারতীয় লেখক সম্মেলনে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত হন। এই আন্দোলনের নেতারা সাহিত্যের উপর জোর দেন, না, 'প্রগতিবাদের' উপর, তা নির্ধারণ করা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং রাশিয়া ও নাৎসী জার্মানী চুক্তি করল, তখন এক বিভেদ দেখা দিল। অনেক তরুণ লেখক জাতীয়তাবাদী ছিলেন এই অর্থে যে, তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ ছিলেন। একনায়কতন্ত্র একজন ব্যক্তিরই হোক বা একটা ব্যবস্থারই হোক, তার পক্ষে যাওয়া তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ নয়। অতঃপর যা অনিবার্য ছিল তাই ঘটল : হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করল। তখন প্রগতিবাদীরা রাতারাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুদ্ধ মিত্রপক্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। প্রায় কৌতুকবহ এক ঘটনা তখন দেখা গেল। দেখা গেল, উক্ত সাম্রাজ্যবাদের বহু প্রাক্তন 'প্রগতিশীল' শত্রু জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন আর হাজার হাজার জাতীয়তাবাদীরা জেলের মধ্যেই থেকে যাচ্ছেন। এখন চেনা গেল কারা প্রকৃতই প্রগতিশীল। হিটলার-বিরোধী সমস্ত শক্তিকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের চেষ্টায় প্রগতিবাদীরা এক থিয়েটার ফ্রন্টও গঠন করেন। ইণ্ডিয়ান পীপল্স্ থিয়েটার নামে এক সমিতি গঠিত হল।

এ কথা সত্য যে, সক্রিয় এক শক্তি হিসেবে আই. পি. টি. যুদ্ধ

শেষ হওয়ার পর বেশি দিন টিঁকে থাকে নি। তবু ভারতবর্ষে আধুনিক থিয়েটার আন্দোলনে তার দান তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান। খাজা আহমদ আব্বাস এবং মন্মথ রায়ের মতো লেখক তার অন্তর্গত এবং তা শম্ভু মিত্রের মতো অভিনেতা-প্রযোজককে সুযোগ ও উৎসাহ জোগায়। ভারতের সর্বত্র তা নতুন নতুন নাট্যকার, অভিনেতা ও বিষয়বস্তুকে সামনে নিয়ে আসে এবং এক সক্রিয় থিয়েটার গড়ে তোলে। জন্মের পর প্রথম কিছুকাল আই. পি. টি. জনসাধারণের মধ্যে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জাগাতে পারে নি। 1942 সালে গান্ধীজীর আরব্ধ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং গভর্নমেণ্টের নির্মম পীড়ন জনসাধারণের মধ্যে এক কঠিন নির্বিকার মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু 1943-এ বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর কাহিনী হঠাৎ ঐ মেজাজকে বদ্‌লে দেয়। যে-সব নাটক অতঃপর অভিনীত হয়, তাতে ভারতীয় জনসাধারণ কিছু সান্ত্বনা পায়। যে ট্র্যাজিডি ঐ-সব নাটকে তার সমস্ত ভয়াবহতা-সহ চিত্রিত করা হয় তা মানুষের তৈরি এবং মানুষের পক্ষেই এড়ানো সম্ভব ছিল। আই. পি. টি.-ই ঐ-সব অনুষ্ঠান সংগঠিত করে এবং শিল্পীদল বাংলার গ্রামে গ্রামে অভিনয় ক'রে ঘুরে বেড়ায়, তারা প্রযোজনা করে একাঙ্কিকা, পূর্ণ দৈর্ঘ্যের নাটক এবং নৃত্যনাট্য। থিয়েটার যে আবার শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ লাভ করল শুধু তাই নয়, শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মানও অর্জন করল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সে-আকর্ষণ স্বভাবতই ক্ষীণ হয়ে গেল। কিন্তু আই. পি. টি. যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় থিয়েটারের প্রথম আধুনিক সংগঠন, এই বাস্তব সত্যটা রয়ে গেল। এখন থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যকার এবং থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট লোকদের পক্ষে সম্ভব হল

একই মঞ্চে মিলিত হওয়া, মতামত বিনিময় করা এবং জনসাধারণের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে থিয়েটারের সব দিক নিয়ে আলোচনা করা।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির তীব্রতা কমে আসায় অন্য যে-সব থিয়েটার-উৎসাহী জেলে আটক ছিলেন তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা জানতেন থিয়েটার-জগতে কী ঘটছে। থিয়েটারকে ভালোবাসতেন ব'লে তাঁরা এমন এক পরিস্থিতির নীরব দর্শক থাকতে পারলেন না যে-পরিস্থিতিতে থিয়েটারের সামনে কোনো মতবাদের যন্ত্রে পরিণত হবার বিপদ দেখা দেয়। রাজনৈতিক মতবাদ তো আরও বিপজ্জনক। জেলে থাকতেই তাঁদের কয়েকজন তাঁদের কর্মপন্থা স্থির করেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরাও এক সর্ব-ভারতীয় থিয়েটার সংস্থা গঠন করেন। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম হয়। এটা নিশ্চয়ই এক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ছিল, কেননা প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন 'সমাজতন্ত্রী'—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এক বামপন্থী অংশ। কিন্তু নাম থেকে যেমন বোঝা যায়, তাঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। এবং এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, আই. এন. টি.-র প্রথম প্রযোজনা হল জওহরলাল নেহরুর গ্রন্থ 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'কে ভিত্তি ক'রে এক নৃত্যনাট্য।

আই. এন. টি.-ও ছিল এক সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শহরে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তার শাখা স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান সমস্ত ভাষায় নাটক প্রযোজনা করে। বোম্বাইয়ের মতো বহুভাষিক শহরে তারা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষায় নয়, সংখ্যালঘুদের ভাষাতেও নাটক প্রযোজনা করে। শখের থিয়েটারকে যে সংগঠিত করা উচিত, এটা প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃত হয়। সমস্ত স্থানেই আই. এন. টি.-র শাখা তো স্থাপন করা হয়ই, উপরন্তু আঞ্চলিক শখের থিয়েটারকেও

সংগঠিত করা হয়। অন্ধ্রে তেলুগু লিট্‌ল্‌ থিয়েটার এবং অন্ধ্র থিয়েটারস্‌ ফেডারেশন, গুজরাটে কলাকেন্দ্র, রঙ্গভূমি, নটমণ্ডল প্রভৃতি, বোম্বাইতে মুম্বাই সাহিত্য সঙ্ঘ থিয়েটার-অনুরাগীদের উৎসাহের সাক্ষ্য। আগ্রহ ও কর্মতৎপরতা পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় পেশাদার থিয়েটারে নতুন ক'রে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা ও উৎসাহ পায়। পৃথ্বীরাজ কাপুরের পৃথ্বী থিয়েটার্‌স্‌ এবং মাদ্রাজে সেবাসঙ্ঘ তার দৃষ্টান্ত।

আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে, সংগঠিত অপেশাদার তৎপরতা এবং পেশাদার থিয়েটারে নবযৌবন সঞ্চারের চেষ্টা এমন-এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যে পরিস্থিতিতে যুক্তিসংগতভাবে আশা করা গেল যে এক নতুন থিয়েটারের অভ্যুদয় হবে যেখানে শখের অভিনেতা আধা-পেশাদার অভিনেতায় পরিণত হতে পারবে এবং পেশাদার অভিনেতা জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনে থিয়েটারের স্থান সম্বন্ধে শখের অভিনেতার সচেতনতা নিয়ে অভিনয় করতে পারবে।

এই আশা নিয়ে এখন স্বাধীন ভারতে থিয়েটারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

স্বাধীন ভারতবর্ষের থিয়েটার

এক

নাটক, অভিনয় এবং প্রযোজনা, এই হল থিয়েটারের তিন উপাদান। আমরা দেখেছি, আধুনিক পেশাদার থিয়েটারে খুব অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া নাটক-রচনা এমন ছিল যে তা ছাপানোরও যোগ্য হত না। অথচ ক্ষমতাবান অভিনেতাদের যোগ্যতা মোটের উপর বেশ উঁচুদরের ছিল। আধুনিক শখের থিয়েটার যে রূপ পরিগ্রহ করল এবং শিকড় গাড়ল তার প্রধান কারণ এই যে, এক নতুন শ্রেণীর নাট্যকারেরা প্রথমে ভালো নাটক লিখলেন ; অভিনয় ও প্রযোজনার মান মোটের উপর ছিল মাঝারি। পেশাদার থিয়েটার প্রযোজনার মান উন্নয়নের জন্য যে খাপছাড়া চেষ্টা করত তা ছিল সাধারণ নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম মাত্র। প্রথমে এ চেষ্টা হয় মহারাষ্ট্রে, তারপর হিন্দীতে পৃথ্বী থিয়েটার্‌সের দ্বারা। আগের পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে, মহারাষ্ট্রে নাট্য মন্বন্তর শখের মঞ্চের জন্য ভেবে চিন্তে একটা চেষ্টা করে। কিন্তু থিয়েটার জগতের বাইরের পরিস্থিতি অপেশাদার শিল্পীদের তাদের লক্ষ্য অনুসরণে প্রতিহত করে। আই. পি. টি. এবং আই. এন. টি. সংগঠিত হওয়ার পর প্রযোজনার মান উন্নয়নই হয় শখের থিয়েটারের প্রথম

কর্তব্যকর্ম। আমরা পূর্বসিদ্ধান্ত করছি না। স্বাধীনতা-উত্তর শখের থিয়েটারের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ ক'রে আমরা ইতিহাসের সেই অদ্ভুত কর্মকৌশলের কথাই বলতে চাইছি, যা ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তির জন্য অবলম্বন করে। পেশাদার থিয়েটারের আমলে নাট্যকারদের বলা হত বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় অভিনেতাদের কথা মনে রেখে নাটক লিখতে। সেই যুগ থেকে আমরা এসে পৌঁচেছি এমন এক অধ্যায়ে যেখানে তাদের বলা হয় বিশেষ বিশেষ প্রযোজকের কথা মনে রেখে নাটক লিখতে। এ-সব থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, স্বাধীন ভারত তার থিয়েটারের জন্য প্রতিভাবান প্রযোজকদের ক্রমশ খুঁজে পাচ্ছে।

তবে এই অবস্থায় আমরা পৌঁছতে পারার আগে অনেক জিনিষ ঘটার প্রয়োজন ছিল এবং সেগুলি ঘটে। সেগুলি প্রায় সমস্তই থিয়েটারের সংগঠন সম্পর্কিত। কারো মতে মস্কো আর্ট থিয়েটারের সাদৃশ্যে আই. পি. টি. তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এও সমান সম্ভব যে, যুদ্ধের সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন প্রভৃতি দেশে নতুন থিয়েটার আন্দোলনের সংস্পর্শে আসার ফলেই আমাদের থিয়েটার সংগঠনের আগ্রহ উদ্দীপিত হয়। আই. পি. টি. অথবা আই. এন. টি.-র মতো কোনো কেন্দ্রীয় সমিতি একবার প্রতিষ্ঠিত হলে এরকম আগ্রহ কার্যে রূপান্তরিত করা সহজ নয়। আই. পি. টি.-র ক্ষেত্রে যেমন ছিল, থিয়েটারকে যদি শুধু বার্তা প্রচার নয়, দর্শকের মনে আস্থা উৎপাদন ক'রতে হয় (এমন-কি, দর্শককে স্বমতে আনতে হয়), তা হলে প্রযোজনা-পদ্ধতির তাৎপর্য অভিনয় ও নাটকের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য থিয়েটারের সংস্পর্শ এবং আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় উন্নত প্রযোজনা

পদ্ধতির গুরুত্ব ছাড়াও তার আবশ্যকতা স্বীকার করতে আমাদের উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল এবং এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলকাতার শম্ভু মিত্র এবং বোম্বাইয়ের সত্যদেব দুবে এই দিকে সংগঠিতভাবে চেষ্টা করেন। সত্যদেব দুবে ছিলেন আলকাজি-প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার ইউনিটের লোক। আলকাজির নির্দেশনায় ইউনিট গ্রীক নাটক, শেক্স্পীয়ারের নাটক এবং ইয়োরোপের কোনো কোনো 'আভাঁ-গার্দ্' নাট্যকারদের নাটক প্রধানত ইংরেজীতে প্রযোজনা করছিলেন। কিন্তু দুবে-কর্তৃক মৌলিক হিন্দী নাটক 'অন্ধ যুগ'-এর প্রথম প্রযোজনাকে এক নবযুগ-সূচক ঘটনা বলে মনে করা যায়। কলকাতায় শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করেন যা মঞ্চস্থ করা কঠিন ব'লে সাধারণত মনেও করা হত এবং কার্যত দেখাও যেত। তাঁর প্রযোজনা এবং অভিনয় একটা বিশেষ ভাষ্য দেয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করে।

এগুলি হল নতুন থিয়েটার সংগঠনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগত প্রচেষ্টাও শীঘ্র হয়। সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের সমান অংশীদার স্বাধীন ভারত ঐ বিশ্ব-সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখার সদস্য হয়। আই. এন. টি.-র স্থাপয়িত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এখন ভারতীয় থিয়েটারকে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন। সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড্ থিয়েটার সেণ্টারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দুই

স্বাধীনতার পর ভারত গভর্নমেণ্ট হয় ভারতীয় গভর্নমেণ্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণের শিল্প ও সাহিত্য সাহায্য এবং উৎসাহের জন্য গভর্নমেণ্টের দিকে তাকায়। গভর্নমেণ্টও, কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উভয়ত্রই সোৎসাহে সাড়া দেন। সাহিত্য, চারুকলা এবং অনুষ্ঠান-কলার দায়িত্ব যথাক্রমে নবগঠিত সাহিত্য অকাদেমী, ললিতকলা অকাদেমী এবং সংগীত নাটক অকাদেমীর উপর ন্যস্ত হয়। সাধারণত লক্ষ্য হিসেবে যা ঠিক করা হয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলিও তাই ঠিক করেন, যথা--অতীতকে অধ্যয়ন করা, বর্তমানকে সাহায্য করা এবং ভবিষ্যৎকে উৎসাহিত করা। গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে অনুষ্ঠানকলা আর এক অনিশ্চিত আশীর্বাদ লাভ করে। স্বভাবতই গভর্নমেণ্টের কাছে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যোজনাই অন্য সব-কিছুর আগে। যে দেশে শতকরা 70 থেকে 80 জন এখনও নিরক্ষর সে দেশে যোজনাকে সর্বসাধারণের গোচরে আনার এক কার্যকর উপায় হল অনুষ্ঠান-কলা, এ কথা প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী যোজনা অবধারণ করে। ঠিক হয়, অর্থ-পুরস্কার দিয়ে লেখকদের উৎসাহিত করা হবে এবং আর্থিক সাহায্য দিয়ে অনুষ্ঠানগুলিকে দাঁড় করানো হবে। ঐ-সব প্রচেষ্টার গুণ বা দোষ নিয়ে বিচার করার সময় এখনও আসে নি, কিন্তু এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অকাদেমীগুলির জন্য গভর্নমেণ্ট যত টাকা খরচ

করেন, তার চেয়ে ক্রমেই বেশি টাকা প্রচারের উপায় হিসাবে প্রতি বছর এই সব শিল্পকলার জন্য খরচ করেন। অকাদেমীগুলি নতুন প্রতিভাকে উৎসাহ দেওয়ার চেয়ে গুণ স্বীকার করেই বেশি সন্তুষ্ট থাকে, আর প্রচার-বিভাগগুলি গুণ স্বীকারের বদলে প্রচারের উদ্দেশ্যের উপযোগী "শিল্পকলাকে" উৎসাহ দিয়ে বেশি সন্তুষ্ট হয়। তবুও কিছু এমন লক্ষণ আছে, যা ভারতীয় থিয়েটারের এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সূচিত করে।

দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এই প্রতিষ্ঠানে থিয়েটারের সমস্ত দিক সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতের সমস্ত অঞ্চলের ছাত্রেরা সেখানে ভরতি হতে পারে। গুণানুসারে তাদের ভরতি করা হয়। ভরতি হওয়ার পর এই ছাত্রেরা গভর্নমেণ্ট এবং অকাদেমীগুলির কাছ থেকে বৃত্তি পায়। ই. আলকাজির নির্দেশনায় এই স্কুল প্রধানত হিন্দীতে বিদেশী ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি প্রযোজনা করে। তারা মারাঠী, কান্নাড়া, বাংলা ইত্যাদি ভাষা থেকেও নাটক প্রযোজনা করেছে। স্কুলের দল ভারতবর্ষের গোটা ছয়েক শহরও পরিদর্শন করেছে। এ কথা সত্য যে, সমস্ত নাট্যানুষ্ঠান হিন্দীতে হয় ব'লে অ-হিন্দী অঞ্চল থেকে আগত ছাত্রেরা পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে না এবং প্রশিক্ষিত ছাত্রদের সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না এবং প্রচার-দলগুলির জন্য যা করা হয়, স্কুল-দলের জন্য তা করা হয় না। দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার কাজের জন্য তাঁদের কোনো অর্থ দেওয়া হয় না। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ ও আমেদাবাদের মতো শহরে বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠান আছে যারা নাট্য-শিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়; সংগীত নাটক অকাদেমী তাদের অর্থ মঞ্জুরী দিয়ে

সাহায্য করে। উপরন্তু কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় (বরোদা, কলকাতা, মহীশূর, পাঞ্জাব) নাট্যবিভাগ প্রবর্তন করেছে। তা ছাড়াও আছে আদিয়ারের কলাক্ষেত্র এবং আমেদাবাদের দর্পণের মতো প্রতিষ্ঠান, যেখানে নৃত্যে এবং নৃত্যনাট্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের বিষয়ে নতুন মনোভাব ও ব্যবস্থার এগুলি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত। দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিরা সক্রিয় রয়েছেন। যেখানে স্থানীয় অকাদেমীগুলি লোকনাট্য সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা করে এবং উৎসাহ দেয়, সেখানেও সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে (যেমন রাজস্থানে)। করণীয় কাজের পরিমাণ এত বেশি যে, থিয়েটারে আগ্রহীরা এই প্রথম অসন্তুষ্ট বোধ করছেন এই ভেবে যে, আরও অনেক বেশি কাজ করা দরকার অথচ তা করা হচ্ছে না বা করা যাচ্ছে না।

সংগীত নাটক অকাদেমী ও ভারতীয় নাট্য সঙ্ঘ এবং উভয়ের প্রাদেশিক শাখাগুলি অন্যভাবেও কর্মতৎপর। এই কর্মতৎপরতার দ্বারা আঞ্চলিক থিয়েটার কর্মীরা ও নাট্যকারেরাই যে শুধু একত্রিত হন তাই নয়, সেমিনার, সম্মেলন, উৎসব ইত্যাদির মারফত ভারতীয় থিয়েটারও পৃথিবীর উন্নত অন্যান্য থিয়েটারের সংস্পর্শে আসে। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার মতোই বোম্বাইয়ের থিয়েটার ইউনিট, কলকাতার হিন্দী নাট্য পরিষদ, আই. এন. টি. এবং অন্যান্য স্বেচ্ছা সংগঠনও এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নাটক উপস্থিত ক'রে থাকে এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাষায় নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করে। নাট্য-তৎপরতা সম্বন্ধে যে-আগ্রহ জেগেছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে থিয়েটার-বিষয়ক কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে (যেমন হিন্দী 'নটরঙ্গ')। থিয়েটারের অগ্রগতির পক্ষে নাট্যসমালোচনা

প্রয়োজন ; সেই সমালোচনাও পুষ্ট হচ্ছে। এটা সত্য যে, কোনো নতুন তৎপরতার জন্য পাশ্চাত্যের দিকে তাকানোর যে-দীর্ঘদিনের অভ্যাস ভারতীয়দের মজ্জাগত, তার ফলে আমাদের সমালোচনা নিজস্ব একটা মান তৈরি করতে পারে নি এবং প্রায়ই দেখা যায় ভারতীয় নাটকের গুণ বিচারের জন্য প্রথমে কোনো বিদেশী নাটকের সঙ্গে তার তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রাপ্তবয়স্কদের উপর নির্ভর করা এবং অনুকরণ ক'রে বেড়ে ওঠা স্বাভাবিক।

ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল অতীত ঘটনাবলী— তাতে সমসাময়িক ঘটনার তেমন স্থান নেই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা যখন লিখছি, তখন আমাদের প্রধান সান্ত্বনা এই যে, আমরা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে ইতিহাসের উপকরণ জোগাচ্ছি। কিন্তু ভারতবর্ষ পনেরোটি ভাষার দেশ, এবং তার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন ; স্বাধীনতার যুগে সেই ভারতবর্ষের থিয়েটার-জগতের সমসাময়িক ঘটনা সংখ্যায় এত বেশি যে বর্তমান গ্রন্থে তাদের সমস্ত লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সাধারণ প্রবণতার দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে।

তিন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় থিয়েটারের দিকে এক নজর তাকালে দুটো প্রধান প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়, দুটোই ঐতিহাসিক অগ্রগতির পক্ষে স্বাভাবিক। বহু শতাব্দী ধ'রে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকদের

পদানত ছিল। ভারতীয়েরা যে পরাধীন, এ কথা তাদের আগেকার আক্রমণকারীদের চেয়ে ইংরেজরাই বেশি টের পাইয়ে দেয়। এর ছুটো কারণ ছিল। একটা হল আত্ম-শ্রেষ্ঠতার জগৎ যার মধ্যে ইংরেজরা নিজেদের পৃথক ক'রে রাখত ; অন্যটা হল ইংরেজ-কর্তৃক ভারতীয়দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বিজেতারা তাদের শ্রেষ্ঠতা জাহির করছে, পরিস্থিতিটা নিছক এমন ছিল না। অনেক শিক্ষিত ভারতীয় নিজেরাই বিশ্বাস করত যে ইংরেজদের তুলনায় তারা নিকৃষ্ট। গান্ধীজীর শিক্ষাই ভারতীয়দের মনে আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনে এবং এই আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। আমরা যে আদৌ নিকৃষ্ট নই বস্তুত তাদের সমকক্ষ আমরা এটা দেখাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম। একদিকে আমরা ফিরে গেলাম আমাদের ঐতিহ্যের কাছে এবং অন্যদিকে গেলাম যাকে মনে করা হয় থিয়েটারে আধুনিক প্রবণতা তার কাছে।

ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের গর্ব লোকনাট্য এবং অন্যান্য প্রচলিত রূপ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করল। কর্ণাটকের উপকূল অঞ্চলের লোকনাট্যরূপ 'যক্ষগান' গত তুই শতাব্দীকাল কর্ণাটকের সমতলভূমি পর্যন্তও যায় নি। কিন্তু গত একদশকে তা সমগ্র ভারতবর্ষ তো ভ্রমণ করেছেই, উপরন্তু নিখিল ভারত সেমিনারগুলিতে অধ্যয়ন ও আগ্রহের এক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হিন্দী লোকনাট্যরূপ 'রামলীলা' এখন শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও জনপ্রিয়। ভারতীয় 'নাট্যশাস্ত্র' কী বলে তা জানবার জন্য এখন আমরা উদ্‌গ্রীব, যদিও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা গত এক শতাব্দী ধ'রে তা অধ্যয়ন ক'রে আসছেন। আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, আমাদের ঐতিহ্যে নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য

যথেষ্ট বিকাশলাভ করেছিল, সুতরাং আমরা বিশেষ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ এবং উৎসাহ দিচ্ছি। শ্রীমতী রুক্মিণী আরুণ্ডেলের কলাক্ষেত্র, শ্রীমতী মৃণালিনী সারাভাইয়ের দর্পণ, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার এবং অনুরূপ অন্য সব প্রতিষ্ঠান প্রধানত নৃত্যনাট্য এবং ব্যালে নিয়ে ব্যাপৃত। আমরা বৈতালিকদের কাজকে চমৎকার অপেরায় রূপান্তরিত করেছি (যথা, 'হীর রন্‌ঝা')। কালিদাসের 'শকুন্তলা' বা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' অথবা শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটক মূল সংস্কৃতে প্রযোজনা করা হয়। অন্য কোনো সংস্কৃত নাটক আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে মঞ্চস্থ করা হয়। প্রায়ই এই রকম প্রচেষ্টাকে 'প্রকল্প' বা 'পরীক্ষণ' ব'লে স্বীকার ক'রে গভর্নমেণ্ট এবং অকাদেমীগুলি আর্থিক সাহায্য দেয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে লোকনাট্য গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরে বেশি সক্রিয়। বিভিন্ন লোকনাট্য-শিল্প অধ্যয়ন ও সে সম্বন্ধে গবেষণা বিভিন্ন নৃত্য-নাটক অকাদেমীর লক্ষ্য। প্রত্যেক বছর সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের সময় বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে প্রত্যেক রাজ্যের লোকনৃত্য দেখানো হয়। রাজ্য গভর্নমেণ্টগুলির সহ-যোগিতায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এক পরিকল্পনা রূপায়িত করেন, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক রাজ্যের সাংস্কৃতিক দলের অন্য রাজ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এমন-কি বিজ্ঞাপন নাটকেরও এক বার্ষিক উৎসব সংগঠন করেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গভর্নমেণ্টের সংগীত ও নাটক বিভাগ। এইসব কার্যক্রমের গুণে যা ঘাটতি থাকে তা প্রায়ই পূরণ হয় হৃদয়াবেগ দ্বারা, কখনও কখনও অভিপ্রায় দ্বারা। কিন্তু এইসব তৎপরতার পিছনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রয়েছে এই কথা প্রমাণ করার ইচ্ছা যে আমরা আদিকাল থেকে কখনও

কোনো পাশ্চাত্য জাতির চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলাম না এবং এখনও নই। আমাদের এই ইচ্ছাকে যখন আমরা ছাড়িয়ে উঠব, তখন নিশ্চয়ই এইসব কার্যসূচীর প্রয়োজনীয়তাকে আরও ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো যাবে।

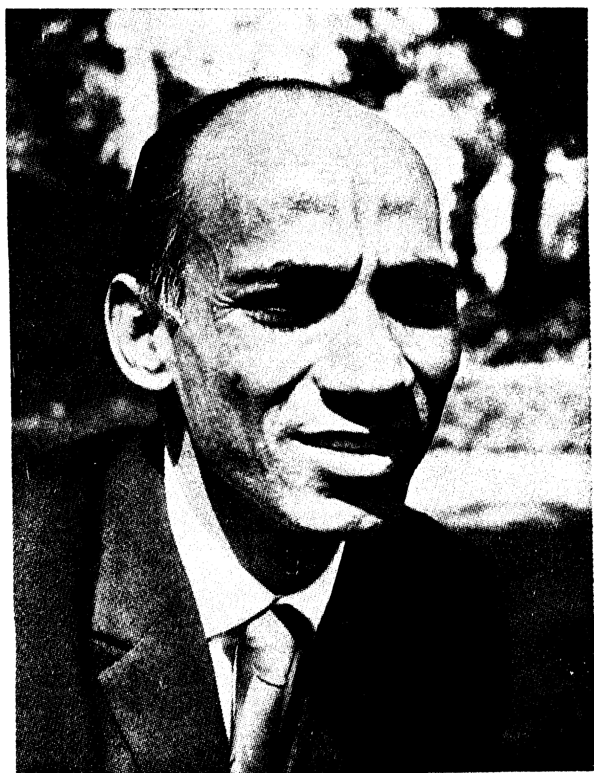
আমাদের থিয়েটার উন্নত জাতির যে-কোনো আধুনিক থিয়েটারের সমকক্ষ, এ-কথা প্রমাণ করবার ঐ একই প্রবণতা আরও কিছু তৎপরতার মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের নাট্যসমালোচনায় এটা আরও স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নাট্যকারদের চেয়ে আমাদের নাট্যসমালোচকেরা বেশি আধুনিক। অবশ্য, নাট্য-সমালোচনা এক শহুরে সামগ্রী ; অতএব তা আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে ইংরেজীতেই বেশি লেখা হয়। প্রাচীনই হোক অথবা আধুনিক, গ্রাম্যই হোক অথবা শহুরে, যে-কোনো ভারতীয় নাটকের মূল্য নিরূপণ করা হয় পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচনার আধুনিকতম বুক্‌নিতে, প্রায়ই আধুনিক বিদেশী নাটকের তুলনা সামনে রেখে। 'ওয়েটিং ফর গোড়ো' বা 'রাইনোসেরস' বা 'বার্থডে পার্টি' ইত্যাদি নাটক কোনো ভারতীয় অভিনেতা দল শুধু যে ইংরেজীতে প্রযোজনা করেন তা নয়, প্রায়ই ঐসব নাটক আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তার চেয়েও বেশি করা হয় তাদের অনুকরণ। দিল্লী বা বোম্বাই বা মাদ্রাজের শ্রোতৃমণ্ডলী সফররত বিদেশী দলের দ্বারাও ঐ সব নাটকের প্রযোজনা দেখেছে ; স্বভাবতই এই অভিজ্ঞতা আমাদের নিজেদের দলগুলিকে উৎসাহিত ক'রে থাকে। উৎকৃষ্টতর জিনিষের প্রভাব একটা প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং প্রায়ই তা উপকারক হয়, কিন্তু অনুকরণ কখনও কখনও ক্ষতিকর হয়। জনসাধারণের জীবনের মধ্যে যদি শিকড় গাড়ে, তবে যে-কোনো থিয়েটার প্রাণশক্তি পায়। এইসব



২১—'বিচ্ছু'-র একটি দৃশ্য। দুই কৃপণ টাকা নিয়ে তর্ক করছে (মোলিয়েরের নাটক উর্দুরূপান্তরে ই. আলকাজি কর্তৃক পরিচালিত)।



চিত্র ২২—আগাহাশার কাশ্মীরী রচিত উর্দু নাটক 'রুস্তম-ও-সোহ্‌রাব'-এ দুই সৈনিক। (হাবি
তনবীর কর্তৃক পরিচালিত)।





তৎপরতার মধ্য দিয়ে আমরা যা করছি তার ফলে নিজস্বতা বিলুপ্ত হচ্ছে, না বাইরের জিনিষ সফলভাবে দেশজ হচ্ছে, না এক বর্ণসংকরের সৃষ্টি হচ্ছে, সে-কথা এখনই বলা সম্ভব নয়। কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ এই প্রবণতা আমাদের শখের থিয়েটারে পরিবর্তন আনতে পারে, তার ফল ভালোই হোক বা মন্দ।

1949 সালে অভিনেতা-পরিচালক শম্ভু মিত্র এবং আর কয়েকজন মিলে আধা-পেশাদার দল 'বহুরূপী' গঠন করেন। এ ছিল শখের দল এবং ক্ষয়িষ্ণু পেশাদার মঞ্চের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। দশ বছরের মধ্যে এই দল চোদ্দটি নাটক মঞ্চস্থ করে, তিনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং কয়েকটি ইবসেন, আন্তন চেখভ এবং ইউজিন ও'নীলের নাটকের দক্ষ রূপান্তর। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এই দলের দুটি অসাধারণ প্রযোজনা। আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সতেজ দল হচ্ছে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ। 1947 সালে ইংরেজী থিয়েটার হিসেবে এটি গঠিত হয়, কিন্তু 1953 সালে বাংলা থিয়েটারে পরিবর্তিত হয়। এই থিয়েটার দলের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'নীচের মহল'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'রক্তকরবী'র অপূর্ব ভাব-সুষমা এবং হৃদয়স্পর্শী আবেদন শম্ভু মিত্র সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত করেন। নাটকের সংলাপকে মানুষের স্বাভাবিক বাচনের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় এবং আমরা যে-সব লোককে বাস্তব জীবনে জানি, চরিত্রগুলি তাদের মতো জীবনধারণ করে, কথা বলে এবং চলাফেরা করে। এইভাবে নাট্যকার এবং দর্শকের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া হয় এবং উভয়কে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসা হয়।

উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র দু'জনেই এইভাবে বাংলা থিয়েটারকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য অন্য নাট্যকারদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম করা যায় : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং মহেন্দ্র গুপ্ত। এঁরা সকলেই পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বাংলায় থিয়েটার-আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা সত্যসত্যই সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি রয়েছে 'ডাকঘর', 'রাজা' এবং 'নটীর পূজা'। তারা অমরত্ব লাভ করেছে, কেননা মানুষের আত্মার কাছে তাদের আবেদন চিরন্তন। তরুণ রায়, বাদল সরকার এবং উৎপল দত্তের মতো ব্যক্তিরাও আছেন যাঁরা বাংলা থিয়েটারে নবজীবন সঞ্চার করেছেন।

চার

তবে আর-একটি প্রবণতা আছে যা নিশ্চয়ই জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনে আমাদের থিয়েটারকে তার ন্যায্যস্থান ফিরিয়ে দেবে। আমরা ইতিপূর্বেই ভারতীয় শখের থিয়েটারের উল্লেখ করেছি। তার যে অধ্যায়ের কথা আমরা বলেছি সেখানে উৎসাহ যতটা ছিল ক্ষমতা ততটা ছিল না, বাস্তব রূপায়ণ ছিল অনেক পিছনে। সম্প্রতি আমরা এক নতুন প্রবণতা দেখছি তা হল এই যে, কোনো কোনো শখের

দল সচেতনভাবে আধা-পেশাদার দলে পরিণতি লাভ করছে। তারা যে তাদের কর্মতৎপরতার ব্যবসায়িক দিকটা সচেতনভাবে উপেক্ষা করছে, এটা এক আশাপ্রদ লক্ষণ। কলকাতার মতো জায়গায় এটা সম্ভব হয়েছে, কেননা আধুনিক থিয়েটারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই সেখানে থিয়েটার দেখার জন্য প্রস্তুত এক শ্রোতৃমণ্ডলী রয়েছে। শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তর মতো প্রযোজক-পরিচালকদের নিজস্ব দল আছে এবং তাঁরা আরও ভালো থিয়েটারের জন্য সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করছেন। কোনো নাট্যকারের একটা লক্ষ্য বা ভবিষ্যৎ-দর্শন আছে ; নাটকের অভিনয়ের অর্থ হওয়া উচিত সেই লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করা বা সেই ভবিষ্যৎ-দৃশ্যকে চিত্রিত করা।

দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আধা-পেশাদার দলের বিকাশ সাধনে উদ্যোগী। দিশান্তর নামক দলটি যে-সব তরুণদের নিয়ে গঠিত তারা ন্যাশনাল স্কুলে প্রশিক্ষণ লাভ করে। দিল্লীতে আর কয়েকটি দল আছে যারা কর্মনীতি হিসেবে এক পরিকল্পিত সূচী অনুযায়ী বছরে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে। বোম্বাইতেও মুম্বাই মারাঠী সাহিত্যসঙ্গ (নাটক শাখা), থিয়েটার ইউনিট এবং অন্য কয়েকটি সংগঠন প্রত্যেক বছর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এমন-কি বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বাইরেও আমরা তাই দেখতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বাধীনতার দুই বছরের মধ্যে দিল্লীতে পাঞ্জাবী থিয়েটার স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের উদ্যোগে দিল্লীতে নিয়মিতভাবে প্রযোজিত হয়, বিশেষত একাঙ্কিকা, কেননা এই নাট্যরূপটিকে দুগ্‌গাল, খোসলা এবং অন্যান্য পাঞ্জাবী নাট্যকার সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে কয়েকটি শখের দল আছে যারা একটা পরিকল্পিত বার্ষিক

সূচী অনুসারে কর্মতৎপর। বার্ষিক একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী বাইরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবার মতো অবস্থায় যদি তারা একবার পৌঁছয়, তা হলে বলা যাবে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিয়মমাফিক উপসংহারের সময় যেমন আশাবাদ প্রকাশ করা হয়, এ নিছক সেই রকম আশাবাদের প্রকাশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে কতকগুলি প্রবণতা ও ঘটনা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এই মত যুক্তিসংগত মনে হবে। প্রথম যার আবির্ভাব, সেই আধুনিক বাংলা থিয়েটার আধুনিক ধারা অনুসরণ ক'রে এতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে যে, শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের দলের মতো কয়েকটি শখের দল ইতিমধ্যেই পুরো না হোক আধা পেশাদার অবস্থায় পেঁাছে গেছে। মহারাষ্ট্রে একটা নতুন ও আধুনিক পেশাদার থিয়েটার প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বাংলায় শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের মতো নাট্যপ্রযোজকদের শুধু যে ফিল্মে তাঁদের ক্ষমতা এখনও নিযুক্ত করতে হয় তাই নয়, ক্ষমতাবান প্রযোজকরা নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে ফিল্মজগতে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাবান তরুণ নাট্যকারেরা ও প্রযোজকেরা থিয়েটার-দ্বারাই আকৃষ্ট হন এবং থিয়েটার নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন। এর কারণ এই যে বহু হিন্দী ফিল্ম সহজে মারাঠী শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করতে পারে এবং ঐ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পি. এল. দেশপাণ্ডে, স্বর্গীয় পি. কে. আত্রে, বসন্ত কানিটকর এবং অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক দীর্ঘ দিন চলে। মাসের পর মাস ধ'রে কয়েকশত অনুষ্ঠান পর্যন্ত হয়। এইসব নাটক যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রোতা-দর্শক আকর্ষণ করছে, তার জন্য বহু পেশাদার অভিনেতা নতুন থিয়ে-

টারে চলে আসছেন, কারণ পুরোনো পেশাদার থিয়েটার আজ বিলীয়মান। এক নতুন পেশাদার থিয়েটার মারাঠীতে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় থিয়েটার ইতিমধ্যেই তার শিকড় গেড়ে ফেলেছে বলা যায়।

শখের দলগুলির কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও নতুন নাট্যকারদের সংখ্যা খুশী হবার মতো নয়। যেহেতু নাটক ও নাট্যকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে, সেই হেতু একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। আগেকার ব্যবসায়িক মঞ্চের ক্ষেত্রে যেমন ছিল, দেখা যায় শখের মঞ্চেও সেইরকম নাটক প্রায়ই লেখা হয় দলের প্রধান ব্যক্তির দ্বারা অথবা তাঁরই জন্য। প্রায়ই দেখা গেছে অর্থ-পুরস্কারও 'ভালো' নাটকের জন্ম দিতে পারে নি। সম্ভবত, আমরা এখনও এমন এক অধ্যায়ে রয়েছি যে 'ভালো' নাটকের ধারণাটাই পুষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, অন্য এক মত হল এই যে, উপন্যাস ও ছোট গল্পের সাফল্য যেমন তাড়াতাড়ি আসে, এবং লেখক খ্যাতি বা অর্থ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পান, নাটকে তা হয় না। সেইজন্য তুলনায় তরুণ নাট্যকারদের সংখ্যা খুব কম। এ কথাও মনে করা হয় যে, ক্ষমতাবান নাট্যকারেরা ফিল্মশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু আমাদের ফিল্মের কাহিনী ও সংলাপের সাধারণ যে মান দেখা যায় তার দ্বারা এ ধারণা সমর্থিত হয় না। আসল কারণ মনে হয় প্রগাঢ় ও পূর্ণভাবে জীবন যাপনের অভিজ্ঞতার জন্য আকাঙ্ক্ষার অভাব। সমাজ এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। পুরোনো রীতি চলে যাচ্ছে, কিন্তু নতুন রীতি এসে এখনও তার জায়গা নেয় নি। এরকম সমাজে নাট্যকারকে হতে হবে এমন এক ব্যক্তি যিনি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, চিন্তা করতে

পারেন এবং ভবিষ্যতের রূপ কল্পনা করতে পারেন। নাটক লেখেন প্রধানত শিক্ষিত ভারতীয়েরা। তাঁরা ইংরেজী পড়েন, ইংরেজীতে ভাবেন, ইংরেজীতে আলোচনা ও সমালোচনা করেন; যে মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ভাষায় লিখতে উদ্যোগী হন, তাঁরা দেখেন হয় তাঁদের অনুবাদ করতে হবে, নয় তাঁদের মনোভাব অন্যের বোধ-গম্য করতে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে। আধুনিক ইংরেজী নাটকের সরাসরি অনুবাদ কেন যে প্রায়ই বেশি বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়, তার একটা কারণ এই। আমাদের তরুণ নাট্যকারেরা এই রকম অনুবাদ-চর্চার মধ্য দিয়ে হয়তো অচিরেই তাদের নিজ ভাষাতে এক উপযুক্ত শৈলী গড়ে তুলতে পারবেন।

পাঁচ

তবে এ কথা যেন না মনে করা হয় যে আমি বলছি ভারতীয় ভাষাগুলিতে কোনো মৌলিক আধুনিক নাটক নেই। প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ভাষাতেই অন্তত কয়েকটি এমন নাটক আছে। কিন্তু শখের থিয়েটারগুলির কর্মতৎপরতা এবং দেশের বিরাটত্বের সঙ্গে তুলনা করলে এই সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তবুও, তা এখন সর্ব-ভারতীয় স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ। এমন সব নাটক আছে, যা নিজেদের অঞ্চলের মঞ্চে তো বটেই, অন্যান্য ভাষার অঞ্চলের মঞ্চেও স্থান লাভ করেছে। এক ভাষার নাটক যখন

অন্যান্য ভাষার নাট্যানুরাগীদের কাছে সমানভাবে পরিচিত হয়, তখন সেটাকে ভারতীয় থিয়েটারের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের এক লক্ষণ বলে মনে করতে হবে। এইসব নাটক যে সর্বভারতীয় মঞ্চে স্থান পায়, বেশির ভাগ সময় অনুষ্ঠানের সংখ্যার বহুলতা তার কারণ নয়, তার কারণ নাট্যসমালোচকদের সাধুবাদ। এই ধরনের নাটক সংখ্যায় কত, তাতে কিছু আসে যায় না; তাদের অস্তিত্বটাই এক উৎসাহপ্রদ শুভলক্ষণ। এইসব নাটকের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তু অবলোকনের এক নতুন আধুনিক ভঙ্গী; নর-নারীর কার্যের পিছনে কী আছে তাই আবিষ্কার ক'রে তাদের বোঝবার আগ্রহ; এবং আমরা যে নর-নারীদের জানি তাদের অনুধাবন ক'রে মানুষকে চেনা এবং বোঝা। আমাদের মহার্ঘ্য পুরাণ এবং আমাদের দীর্ঘ ইতিহাস এখন আর নাটকের বিষয়বস্তুর উৎস ততটা নয়— কিন্তু প্রতীক ও আঙ্গিক সেখান থেকে নেওয়ার এক নূতন প্রবণতা দেখা যায়। হিন্দীতে উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক্‌, ধরমবীর ভারতী, মোহন রাকেশ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ লাল; মারাঠীতে পি. এল. দেশপাণ্ডে, বসন্ত কানিটকর এবং বিজয় তেন্দুলকর; এবং শ্রীরঙ্গ (কান্নাড়া) ও বাদল সরকার (বাংলা) প্রমুখ নাট্যকারদের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। এঁদের নাম করা হল যেহেতু এঁরা প্রধানত নাটকরচনায় ব্যাপৃত। অন্যেরাও আছেন যাঁরা কখনও-সখনও অথবা ব্যতিক্রম হিসাবে মৌলিক নাটক লিখেছেন।

মহারাষ্ট্রের নাট্যকাররাও বাংলার নাট্যকারদের মতো পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এমন সব নাটক লেখেন যা সরাসরি জনসাধারণের মনে সাড়া জাগায়। 'কীচকবধ' এবং 'ভৌবন্দকি' খাদিলকরের দুটি বিখ্যাত নাটক। দুটি নাটকই প্রতীকী এবং

তাদের ভিতরকার উদ্দেশ্য সহজেই শ্রোতৃমণ্ডলীর বোধগম্য হয়। সে উদ্দেশ্য হল জাতির সুপ্ত দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করা এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তাকে সংগ্রামে নিয়োজিত করা। অন্য নাটকটি পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষের অমঙ্গল চিত্রণ ক'রে দেখায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠারা তার জন্য কিভাবে তাদের সাম্রাজ্য হারায়। প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের উগ্রচণ্ডা নায়িকা হল আনন্দীবাঈ। সে নিষ্ঠুর এবং উচ্চাভিলাষী। শাসক পেশোয়ার প্রধান উপদেষ্টা রাঘোবাদাদার পত্নী হিসেবে সে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য কাউকেই অথবা কিছুই উৎসর্গ করতে পিছপাও নয়।

আর একজন প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন রামগণেশ গদকারী (1885-1919)। তিনি ছয়টি নাটক লেখেন। তিনি বিষয়বস্তুরূপে সামাজিক পাপ ও অন্যায়কে বেছে নেন এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। কয়েকটি নাটকে তিনি মহৎ সৃষ্টির পরিচয় দেন, এমন-কি গভীর মানবিক আবেগ ও ভাবনার বাস্তব চিত্রণে তিনি কখনও কখনও শেক্‌স্‌পীয়ারের সমকক্ষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক বোধ হয় 'একাচ প্যালা।' এটি এক মদ্যপের জীবন নিয়ে লেখা। কি ক'রে সরু ও সিধে পথে থাকতে হয়, এই নাটকে সে সম্বন্ধে উপদেশের সঙ্গে আছে সুমধুর গান এবং আবেগপূর্ণ ভাষণ। সূক্ষ্ম শ্লেষ এবং মার্জিত রঙ্গরসিকতা এই নাটকের জনপ্রিয়তা অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

কুড়ির দশকে বি. ভি. ওরফে মামা বারেরকার তাঁর নাটক মারফত চিরাচরিত চড়াসুরের নাটকে একটা বাস্তবতা ও ভারসাম্য প্রবর্তন করেন। তাঁর 'সাত্তেচে গুলাম' (ক্ষমতার ক্রীতদাস)-এ একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাণী ছিল। 'সোন্যাচা কালাস' (সোনার

চূড়া)-এ তিনি কারখানার শ্রমিকদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ আনেন। তাঁর 'ভূমিকন্যা সীতা'র বিষয়বস্তুর জন্য রামায়ণের সাহায্য নিয়েছেন। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সীতার বিদ্রোহ এবং সেজন্য রাজ-প্রাসাদ থেকে তাঁর বহিষ্কার শ্রোতৃমণ্ডলীকে আত্মসম্মানবোধে এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতায় উদ্দীপিত করে। নাটকটির সংলাপ অত্যন্ত সজীব এবং নাটকটি খুবই শক্তিশালী।

কুড়ির দশকে অন্তত ত্রিশটি পেশাদার কোম্পানি মহারাষ্ট্রে নাট্যানুষ্ঠান করত। তাদের প্রত্যেকটির জন পঞ্চাশেক সদস্য ছিল। ত্রিশের দশকে সবাক চিত্রের আবির্ভাবে তারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা এক সাধারণ লক্ষণ, দেশের প্রত্যেক আঞ্চলিক থিয়েটারের ক্ষেত্রেই তাই ঘটে। ফিল্ম কোম্পানি-গুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিয়ে নেয় এবং মারাঠী থিয়েটার চরম দুর্দশায় পড়ে।

ত্রিশের দশকের শেষ দিকে থিয়েটারের এক পুনরুজ্জীবন হয়। ভালেরাও নামে এক উদ্যোগী যুবক মুম্বাই মারাঠী সাহিত্য সঙ্ঘ স্থাপন করেন। যে-সব পেশাদার অভিনেতা অবসর নিয়েছিল অথবা দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং কষ্টকর জীবন যাপন করছিল, তিনি তাদের একত্রিত ক'রে মারাঠী নাটকের এক উৎসব সংগঠন করেন। এই উৎসব মারাঠী থিয়েটারে নব জীবন সঞ্চার করে। বালগন্ধর্ব ছিলেন কুড়ির দশকের এক প্রতিভাবান অভিনেতা, যিনি নারী-ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করতেন এবং গান গাইতেন বুলবুলের মতো। সেই বালগন্ধর্ব আবার মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে শ্রোতা-দর্শকদের বিপুল আনন্দ দেন।

বর্তমানে অনেক পেশাদার ও আধা-পেশাদার দল মারাঠী নাটকের বার্ষিক উৎসবে অংশ গ্রহণ করে এবং প্রতিরাত্রে সাত হাজার উদ্‌গ্রীব দর্শক সেই অনুষ্ঠান দেখে। সঙ্ঘ এখন এক মুক্তাঙ্গন থিয়েটার নির্মাণ করেছে এবং এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সঙ্ঘের এক নাটক বিভাগ আছে যা বেশ কয়েকজন ক্ষমতাবান তরুণ নাট্যকারকে সামনে নিয়ে এসেছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন পি. এল. দেশপাণ্ডে। মহারাষ্ট্রের সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ত-কবির জীবন নিয়ে লেখা 'তুকারাম' তাঁর প্রথম নাটক। হিন্দু সমাজে নিহিত অসাম্য সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সামাজিক চেতনা এই জীবন-চিত্রণে প্রকট। তবে গোগোলের 'ইন্‌স্পেক্‌টর জেনারেল'-এর যে মারাঠী রূপান্তর তিনি করেন, সেটাই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত করে এবং তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি তাঁকে এনে দেয়। তাঁর কৃত রূপান্তরগুলির মধ্যে আর-একটি প্রায়ই অভিনীত হয়। সেটি হল 'ব্যারেটস্‌ অব উইমপোল স্ট্রীট' মারাঠীতে যার নাম হয়েছে 'সুন্দর মী হোনার'। তাঁর মৌলিক নাটক 'তুঝে আহে তুঝ্যা পাশি' সাহিত্যক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং বহুদিন ধরে অভিনীত হওয়ার রেকর্ড স্থাপন করে। নাটক-রচনা ক্রমশই বেশি ক'রে উপদেশাত্মক প্রবণতা দেখাচ্ছিল ; দেশপাণ্ডে সেই রচনা-শিল্পে এক বুদ্ধিগত তীক্ষ্ণতা নিয়ে আসেন। এক মানুষের নাটক 'বটাট্যাচি চ'ল'-এর আবেদন জনসাধারণের কাছে ব্যাপক ও গভীর।

দেশপাণ্ডের পূর্বগামী পি. কে. আত্রে যে-সব নাটক লেখেন তাতে তিনি মহারাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশকে প্রতিফলিত করেন। তাঁর বাক্‌চাতুর্য ছিল তরোয়ালের মতো তীক্ষ্ণ এবং কোনো

অন্যায়ের সন্ধান পেলে তিনি তাকে রেহাই দিতেন না। এক সময়ে নাট্য-রচনায় তিনি ছিলেন শীর্ষে এবং মানুষের বিশেষত সমাজের উচ্চস্তরের লোকেদের ছলনা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর সরাসরি আক্রমণের জন্য একবার তাঁকে আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'র সঙ্গে তুলনা করা হয়। হৈচৈ-করা কমিডিগুলিতেই আজ মারাঠী অভিনয়ের প্রকৃত নিজস্বতা দেখতে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক মারাঠী থিয়েটারে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে, 'এমন একটি রচনা হল বিজয় তেন্দুলকরের নতুন নাটক 'শান্তাতা! কোর্ট চালু আহে' (চুপ! আদালত চলছে)। নাটকটি তার হিন্দী অনুবাদে সাফল্যের সঙ্গে দিল্লীতে অভিনীত হয়েছে। হিন্দীতে তার নাম 'খামোশ! আদালত জারি হ্যায়'। এতে দেখানো হয়েছে কিভাবে আমাদের কাল্পনিক দুনিয়াতেও আমরা অজ্ঞাতসারে রূঢ় ক্রুর বাস্তবকে এনে ফেলি, যা আমাদের মনঃপূত বা হিতপ্রদ নয়।

ছয়

1955 সালে 'অন্ধা যুগ' নামে হিন্দীতে এক কাব্য-নাটক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ধরমবীর ভারতী তাঁর নাটকের মুখবন্ধে লেখেন যে, তিনি মিথ্যাচার, নিষ্ফলতা, রক্তপাত, কদর্যতা, অন্ধতা প্রভৃতির মধ্যে সত্য ও সৌন্দর্যকে দেখাতে চান, অথবা যা বলা আরও ঠিক, আবিষ্কার করতে চান। এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ

এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবী উভয়ত্রই যে অবস্থা দেখা দিয়েছিল তারই অভিঘাত এই নাটক সৃষ্টির মূলে। তাঁর নাটকের বিষয় হিসেবে নাট্যকার মহাভারত-কথিত আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি নির্বাচন করেন। বর্ণনার মহাকাব্যিক ভঙ্গিতে নাটকের আরম্ভ : "যুদ্ধশেষে অন্ধকার যুগ পৃথিবীর উপর নেমে আসছে" যখন সমস্ত মূল্য ওলটপালট হয়ে গেছে, যখন ভালোমন্দের তফাত করা কঠিন। সমস্ত নাটকে সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। মহাকাব্যের সময়কার "অন্ধ ব্যক্তিদের" কাহিনী সমসাময়িক শ্রোতাদের জীবনযাত্রার পথে আলোকপাত করে। কাব্য-শৈলী, বিবরণ-অংশ, আবৃত্তিমূলক প্রসঙ্গ এবং কিছু নৃত্য-অনুক্রম নাটকটিকে এক অপূর্ব গুণে মণ্ডিত করেছে। শুধু হিন্দী নাটকের পক্ষে নয়, ভারতীয় নাটকের পক্ষেই এ ছিল এক নতুন জিনিষ। সুতরাং এটা আশ্চর্যের নয় যে, নাটকটি প্রকাশের পাঁচ বছর পরে
সত্যদেব দুবে তার প্রথম প্রযোজনার চেষ্টা করেন। আলকাজি এবং তাঁর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার ছাত্রেরা দিল্লীতে পুরোনো কেল্লার পটভূমিতে নাটকটির যে মুক্তাঙ্গন-প্রযোজনা করেন, ভারতীয় থিয়েটারে তা এক নতুন যুগের সূচনা করে।

আর-একটি হিন্দী নাটক লেখা হয় তিন বছর পরে (1958), কিন্তু প্রযোজিত হয় 'অন্ধা যুগে'র আগে, সেটি হল মোহন রাকেশের 'আষাঢ় কা একদিন'। এ হল কবি কালিদাসের কাহিনী, কিন্তু নাটকের বিষয় কালিদাসের কবি হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার আগের ঘটনা। মল্লিকা নামে একটি গ্রাম্য মেয়ে তাকে ভালোবাসে এবং সেও মেয়েটিকে ভালোবাসে। কিন্তু কালক্রমে এই দুই প্রেমের ধারা দুই পৃথক পথ ধরে। মল্লিকা কালিদাসকে অনুপ্রাণিত করে এবং ক্রমেই

বেশি ক'রে তার কাব্যদেবীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করে। কালিদাস ও মল্লিকার কাহিনী পরিণত হয় এক বিশ্বজনীন বিরোধের নাটকে। সে বিরোধ প্রেম এবং শিল্পের মধ্যে, সহজাত বোধ এবং পরিবেশের মধ্যে। এ কাহিনী যতখানি সর্বজনীন, ততখানি সমকালীন।

এই দুই বিষয়ের উৎসের পার্থক্য সত্ত্বেও দুইটি নাটকের মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে। কোনো কোনো জায়গায় 'অন্ধা যুগ' সমসাময়িক বস্তু ও ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন— পরমাণু বোমা ('ব্রহ্মাস্ত্র') অথবা ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাতের পর ভারত ভাগ। সেই-রকম, মোহন রাকেশের নাটকে কর্তৃপক্ষ এবং শিল্পীদের মধ্যে সম্পর্ক (শিল্পের 'পৃষ্ঠপোষকতা' করার জন্য আমাদের গভর্নমেণ্টের চেষ্টা) অথবা ঐতিহ্য (ভাবাবেগ) এবং বর্তমানের (প্রগতি) মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের সচেতন করে তোলা হয়। সমসাময়িক অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হবার প্রবণতা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় নাটকের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ভারতীয় নাট্যকার আর কথক হিসেবে থাকতে ইচ্ছুক ন'ন, ভাষ্যকার হিসেবেও নয়। বুঝতে, মিথ্যার পিছনকার সত্যে পৌঁছতে, কদর্যতার নিচে সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে তিনি বদ্ধপরিকর।

তাঁর স্পষ্টবাদিতা, অকপটতা এবং সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার সূক্ষ্ম বিচার কর্তৃপক্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে তাঁকে প্রণোদিত করেছে। তা সত্ত্বেও মোহন রাকেশ রাজ্য গভর্নমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের উচ্চতম পুরস্কার লাভ করেছেন। সূক্ষ্মদর্শী সাহসী সমালোচক এবং সফল নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠার এ এক পরিমাপ। চোখকে যা আনন্দ দেয় অথবা কানকে তৃপ্ত করে, এমন জিনিষ দেখাবার জায়গা যদি থিয়েটার আর না হয়, না হোক।

মোহন রাকেশের অধুনাতম নাটকগুলির অন্যতম হল 'আধে-আধুরে' যা সম্প্রতি দিল্লীতে প্রযোজিত হয়েছে। একজন স্ত্রীলোক যখন বিফলমনোরথ ও অসন্তুষ্ট হয় তখন সে কতখানি অমঙ্গল ঘটাতে পারে তা তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকা, ক্রোধ, দুঃখ ও শোকাবহ পরিণতিসহ এই নাটকে দেখানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র হল সাবিত্রী। সে আধাবয়সী এবং ক্ষুব্ধা এক চাকুরে মহিলা। সে সারাজীবন পুরুষের মধ্যে চরম উৎকর্ষ খুঁজেছে। যে তার পরিবারের অবলম্বন, সে নিজেকে এবং পরিবারকে অত্যাচার ও অপমানের লক্ষ্য বানায়। সে-ই তার অদৃষ্ট, সে-ই তার অদ্ভুত অনুসন্ধান। পরিশেষে তার পারিবারিক আত্মোৎসর্গের ভান এবং অন্যায়-সহা নিরীহ ভাবের মুখোস খুলে দেয় জুনেজা, যাকে সে বছর কুড়ি আগে পুরুষোচিত চরম উৎকর্ষের প্রতিমূর্তি হিসেবে একান্তভাবে চেয়েছিল। শেষে যখন যবনিকা নামে, তখন দেখা যায় এই স্ত্রীলোকের পতন ঘটেছে তার নিজস্ব নরকের গহ্বরে।

প্রায় ঐ একই সময়ে (1958-59) কান্নাড়া ভাষায় শ্রীরঙ্গের এক নাটক প্রকাশিত হয়। আক্ষরিক অনুবাদে তার নাম 'আলো-অন্ধকার'। এ নাটকে আছেন একজন নাট্যকার, পেশাদার নাট্য-দলের একজন মালিক এবং তাঁর একজন ম্যানেজার। মালিক ও ম্যানেজার নাট্যকারকে একটি নাটক লিখতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তা করতে ক্রমাগত অস্বীকার করেন। এক বাঙালী নাট্যকার, বাদল সরকারও নাট্যকারের এই সমস্যাকে এক নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ একজন নাট্যকার তাঁর চার পাশের জীবন থেকে উপযুক্ত বিষয় আহরণের জন্য দারুণ চেষ্টা করেন। একজন সাধারণ মানুষের জীবন হল বাঁধাধরা একঘেয়েমি। সে

তার অবস্থার অসহায় শিকার ছাড়া কিছু নয়। নাটকটি দুইস্তরে অগ্রসর হয় : বর্তমানের বিরস বাঁধাধরা ছক এবং কল্পনার সক্রিয় পৃথিবী। কল্পনার জগৎ যখন ধ'সে পড়ে, যা অপরিহার্য, তখন নাট্যকারের (নাটকের) মোহভঙ্গ হয়।

পরিশেষে, 'সুনো জন্মেজয়' নাটকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরঙ্গ-লিখিত কান্নাড়া নাটক 'কেলু জন্মেজয়'-এর এটি হিন্দী অনুবাদ। মূল রচনাটি প্রকাশিত হয় সালে। কিন্তু তা খ্যাতি লাভ করে সালে যখন ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার ছাত্রেরা তার হিন্দী রূপান্তরটি প্রযোজনা করে। নাটকটি তখন তার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু উভয় কারণেই সমালোচকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এতে আছে নাটকের মধ্যে নাটক। একদিকে রয়েছে দুটি চরিত্র, সূত্রধার এবং বক্তা এবং অন্যদিকে তাদেরই 'সৃষ্ট' চারটি অন্য চরিত্র। এ চারটি চরিত্র হল এক বৃদ্ধ, এক তরুণ, এক তরুণী এবং এক সাধারণ মানুষ, যেমন সূত্রধার তাদের 'সৃষ্টি' করে। কিন্তু ঐ চারজনই বক্তা দ্বারা 'সৃষ্ট' হয়ে হয় এক অফিসের এক বড়কর্তা, এক কেরানী, এক মেয়ে টাইপিস্ট এবং এক চাপরাশী। সূত্রধার এক সুপ্রাচীন চরিত্র, সে ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকে অভিনেয় প্রসঙ্গের সূত্রপাত করে ; প্রস্তাবনা শেষ হয়ে গেলে আর তাকে মঞ্চে দেখা যায় না। 'সুনো জন্মেজয়'-এর সূত্রধার সব সময়ে মঞ্চের উপর থাকে, নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। নাটক আরম্ভ হওয়ার পর বক্তা মঞ্চে আসে এবং নাটক শেষ হওয়ার আগে মঞ্চ ত্যাগ করে। একদিক থেকে, এই নাটকে পাই এক নতুন ত্রিভুজ, নাট্যকার, বক্তা ও সাধারণ মানুষের ত্রিভুজ। নাটকের চারটি চরিত্রকে তিন স্তরে

দেখানো হয়েছে : (1) সময়ের অনুষঙ্গে, (2) পরস্পরের অনুষঙ্গে এবং (3) প্রত্যক্ষ পরিবেশের অনুষঙ্গে। সময়ের অনুষঙ্গে তারা প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়, পরস্পরের অনুষঙ্গে তারা উঁচু এবং নীচু এবং তাদের পরিবেশের অনুষঙ্গে তারা ভালো অথবা মন্দ। কিন্তু উঁচু এবং নীচু, ভালো এবং মন্দ, জীবন এবং মৃত্যু, এ-সব অর্থহীন অভিধা। যখন কোনো আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করে, তখন মৃত্যুর কি অর্থ হয়? যখন কেউ বেঁচে থাকে না, তখন কেউ মরেও যায় না। যুক্তির দিক থেকে এটা সত্য। কিন্তু, সূত্রধার বলে, বেঁচে থাকার সংকল্পই জীবনকে অমর করে। এবং আশ্চর্যের কথা, নাটকটি এক আশাবাদী সুরে সমাপ্ত হয়।

সাত

উপরের নাটকগুলি উল্লেখ করা হল আধুনিক ভারতীয় নাট্যকারদের কোনো কোনো প্রবণতার দৃষ্টান্ত হিসেবে। শ্রেষ্ঠ রচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে অথবা আধুনিক ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্যচিহ্ন হিসেবে নয়। শ্রেণী হিসেবে বর্তমান ভারতীয় নাট্যকারেরা এখনও ইয়োরোপীয় নাটকের প্রভাবাধীন রয়েছেন। এ কথা সত্য যে, এর ফলে আমরা কিছু সুদক্ষ ও সতেজ নাট্য-রূপান্তর পেয়েছি, যেমন—বেকেটের বা ইয়োনেস্কোর বা পিণ্টারের। কিন্তু এগুলি অথবা উপরে উল্লেখিত নাটকগুলি সাধারণ ভারতীয় শ্রোতৃমণ্ডলী পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এ-সব

নাটকের প্রায় সবগুলিই যে দিল্লী বা বোম্বাই বা কলকাতার মতো স্থানে প্রযোজিত হয়েছে, এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নাট্যকারদের সংখ্যা যদি অল্প হয়, প্রযোজকদের সংখ্যা আরও অল্প। একদিকে প্রযোজনার ব্যয় এবং অন্যদিকে জীবিকার জন্য শখের অভিনেতাদের অফিসে বা কারখানায় কাজ করা, এই দুই কারণে বার বার অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু অভিনেতাদের এক নতুন পেশাদার শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে, যদিও বর্তমান অবস্থা নতুন ও তরুণ নাট্যকারদের উৎসাহিত করবার মতন নয়। বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং এখন দিল্লী ছাড়া অন্য কোথাও নতুন নাটক উৎসাহ পায়ই না বলা চলে। 'তুগলক' নামক একটি নাটক তরুণ নাট্যকার গিরিশ করনাড় লেখেন মূলত কান্নাড়া ভাষায়। সেটি ইংরেজী ভাষায় বোম্বাইতে এবং হিন্দী ভাষায় দিল্লীতে প্রযোজিত হয়েছে এবং সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। কিন্তু কান্নাড়া মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করার জন্য নাটকটিকে আরও অপেক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তরুণ নাট্যকারদের কী দশা, এ তার এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। ক্ষমতা আছে, প্রচুর পরিমাণেই আছে। দিল্লী মঞ্চ যে-কোনো ভারতীয় ভাষায় যা উৎকৃষ্ট তা গ্রহণ করে, মনে হয় আমাদের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি এতেই রয়েছে। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও যদি থিয়েটারকে এক ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় এবং যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে ভারতীয় থিয়েটার নিশ্চয়ই আবার কালিদাস ও ভবভূতির যুগের গৌরব ফিরে পাবে। উপরে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, আমাদের নাট্যকারেরা এক সাধারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধে চেতনা নিয়েই লিখছেন এবং তাঁরা তাঁদের দেশবাসীদের এক উন্নততর জীবন কল্পনার

দৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে অনুপ্রাণিত। তাঁদের নাটকেই তা পরিস্ফুট।

ভারতীয় থিয়েটার শুধু বাংলা, মারাঠী, হিন্দী বা কান্নাড়া মঞ্চ এবং নাট্যকারেরা ন'ন। শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান নমুনার অনুকরণ ক'রে 'আভাঁ গারদ্' পরীক্ষা-নিরীক্ষাও নয়। আজকের ভারতীয় থিয়েটারের কোনো বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না যদি না সারা ভারতবর্ষে আমাদের দর্শক, অভিনেতা এবং লেখকদের মধ্যে নতুন নাট্যচেতনাকে বিবেচনা করা হয়। সমস্ত ভাষাগত অঞ্চলে এই আন্দোলনের একটা মোট পরিচয় এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ সম্বন্ধে আগেই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তাদের উল্লেখ বাদ দেওয়া হল।

ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে সংঘাত, চারুকলা এবং অনুষ্ঠান-কলার সমস্ত দিক প্রভাবিত করছে, নাট্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি, কারণ নাট্য এক সম্মিলিত কলা। ভারতের পূর্ব অংশে আসামে একদিকে কাব্যে পৌরাণিক নাটক নতুনভাবে লেখা হচ্ছে ; যেমন—ঊষা ও অনিরুদ্ধর কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত নাটকটি যাতে বকুল সাইকিয়া অত্যন্ত নিপুণ অভিনয় করেন। অন্যদিকে যে নতুন বাস্তববাদ চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা এবং ভূপেন হাজারিকা নিয়ে আসেন তা ইতিহাসকে নতুনভাবে রূপায়িত করে এবং 'পিজালি ফুকন'-এর মতো জাতীয়তাবাদী নাটক আমাদের দেয়। মনোবিকলনমূলক একাঙ্কিকা বা সমস্যা-নাটকও লেখার চেষ্টা হয়েছে, তবে তাতে তেমন সাফল্য কিছু দেখা যায় নি। শ্রোতৃমণ্ডলী লোক-ধাঁচের নাটকে স্বাভাবিকভাবে বেশি সাড়া দেয়। ওড়িয়াতেও ঐ একই ধরনের বিভক্ত আনুগত্য দেখা যায়। সেখানে রাধাকৃষ্ণ ও 'গীতগোবিন্দ'-

এর বিষয়কে ভিত্তি ক'রে কান্থচরণ পাটনায়ক ওড়িশি-নৃত্য মিশ্রিত নাটক তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেন। যদিও পঞ্চাশের দশকে 'ভাত' প্রভৃতি নাটক সমাজ-চেতনা, এমন-কি শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার করে, তবু পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিদ্রূপ করার কিছু নিপুণ চেষ্টা হয়, যেমন নির্বাচন-সম্পর্কিত নাটকটিতে, যা দ্বিতীয় নিখিল ভারত নাট্যোৎসবে দিল্লীতে দেখানো হয়। অসমীয়া এবং ওড়িয়া উভয় নাটক-রচনাই বাংলার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। তাতে তো হিটলার, লেনিন, এমন-কি মাও সম্বন্ধে নতুন ধরনের যাত্রার পালা রচিত হচ্ছে।

দক্ষিণে নতুন আদর্শগত বিরোধ প্রচারের জন্য থিয়েটারের প্রাচীন লোক-রূপ কাজে লাগানো হচ্ছে। নির্বাচনের সময় কুচৈল-বৃত্তমের ভিত্তিতে রচিত কথাকলি ব্যবহার করা হয় ; তাতে কৃষ্ণকে দেখানো হয় এক নতুন ক্ষমতা-মত্ত মন্ত্রীরূপে এবং সুদামকে এক দরিদ্র শিক্ষক-রূপে, যে শৈশবে কৃষ্ণের সহপাঠী ছিল। পি. কেশবদেব ঐ একই কৌশল অবলম্বন ক'রে থোপ্পাল ভাসির নাটকের জবাব দেন। তাঁর নাটকের নাম 'ওরা কিভাবে আমাকে কমিউনিস্ট করে'। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত এইরকম নাটক-রচনা ছাড়াও চিন্তাশীল নাটক ও নাট্যসমালোচনা আছে, যা এস. গুপ্তন নায়ার বলেন কেরালার থিয়েটার খ্রীস্টান, মুসলমান এবং নাস্তিক হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজন্মের বিরোধ এবং গভীরতর সামাজিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। তামিলনাড়ুতে চো অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি নাটককে এই রকম প্রহসন ও রাজনৈতিক ভাষ্যের মিলিতরূপে ব্যবহার করেছেন। নারলা ও আত্রেয় তেলুগুতে তাই করেন এবং কান্নাড়ায় করেন শ্রীরঙ্গ, লঙ্কেশ এবং ক্রুদ্ধ তরুণ লেখকদল। গুজরাটী

এবং সিন্ধী সামাজিক নাটকেও এই প্রবণতা দেখা যায়; একটি সাম্প্রতিক নাটকের বিষয় ছিল কংগ্রেসের মধ্যে অধুনাতম বিভেদ এবং সন্দেহজনক দলত্যাগীদের ভোট পাকড়ানোর কৌশল। মারাঠীতে মাধবরাও যোশী থেকে আত্রে পর্যন্ত সামাজিক শ্লেষের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল, নতুন 'ওয়গ'-এর লেখকেরা তা আবার অনুসরণ করছেন, যেমন 'ইচ্ছা মাঝি পুরি করা'-তে। এমন-কি, এর উত্তরও রচনা ক'রে মঞ্চস্থ করা হয়েছে : 'ইচ্ছা তুঝি পুরি করীন'। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে পশ্চাৎ-দৃশ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং দক্ষ অভিনেতারা সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ তৈরি ক'রে সেগুলি সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক ও কৌতুককর মন্তব্য জুড়ে দেন। 'হোহোলিকা'র মতো গুজরাটী ভবাইতে যেমন করা হয়েছিল এবং অভিনেতা নরসিংহ মূর্তি কান্নাড়ায় জনপ্রিয়ভাবে যেমন করছেন। লোকনাট্যের স্থূল রসিকতা এবং অসংযত বাচনকে অনেক নাট্যকার এইরকম কমিডির পক্ষে উপযোগী বলে গ্রহণ করেন। অনেক নাটকের বিষয় সামাজিক পাপ ও অন্যায় এবং তাদের লক্ষ্য হল ভণ্ডামির ফোলানো সব বুদ্‌বুদকে ফাটিয়ে দেওয়া।

উত্তরে কাশ্মীরে ও পাঞ্জাবে এক সজীব নাট্য আন্দোলন বেড়ে উঠেছে, যদিও হিন্দীভাষী অঞ্চলে ততটা নয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য চিত্রিত ক'রে কাশ্মীরীতে 'যম্বরবামবাজ্জাল'-এর মতো গীতিনাট্য অথবা পাঞ্জাবীতে শীলা বৎস-রচিত 'হীর-রান্‌ঝা' লোকরূপ ব্যবহারের প্রবণতার দৃষ্টান্ত। জে. সি. মাথুর হিন্দীতে তাঁর 'কুনওয়ার সিং'-এ পুতুলনাচের প্রয়োগ করেন। হাথরাসের ব্রজকলা কেন্দ্র কর্তৃক পরিবর্তিত বিখ্যাত নৌটাঙ্কি 'অমর সিং রাঠোড়' অথবা পুতুল-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র রামায়ণকে বিবৃত করার জন্য দেবীলাল

সমরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের আগ্রহজনক নাট্য-ঘটনা। ইন্দোরে ও গোয়ালিয়রে মারাঠীভাষী অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনেক হিন্দী নাটক অভিনয় করেছেন; বাবা দিকার 'কেরানী' দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। উজ্জয়িনীতে প্রতি বছর কালিদাস উৎসবে সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করা হয়; এটি কম কৃতিত্ব নয়। উর্দুতে নাট্যতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য। বিশেষত শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকা'র উপর ভিত্তি ক'রে নৌটাঙ্কি ছাঁচে হাবিব তানবীর-কর্তৃক রচিত এবং বেগম কুদসিয়া জৈদির হিন্দুস্থানী থিয়েটার -কর্তৃক প্রযোজিত 'মিট্টি কি গাড়ি' তো পেশাদার থিয়েটার পুনরুজ্জীবিত করার এক স্মরণীয় প্রচেষ্টা, যেমন স্মরণীয় বার্নার্ড শ'র 'পিগম্যালিয়ন'-এর উপর ভিত্তি ক'রে রচিত 'আজর কা খোয়াব'। নাজিরের জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত তানবীরের সাম্প্রতিক 'আগ্রা বাজার' অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়। একদিকে লোকনাট্যরূপে ও মূল উৎসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা এবং অন্যদিকে পেশাদারীর সাধারণ জোয়ার ও যাবতীয় প্রয়োগপদ্ধতির উৎকর্ষ, আমাদের দেশে নাট্যতৎপরতার এই লক্ষণগুলি ছাড়াও আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকও দেখা যাচ্ছে। তা হল অনুবাদ। ইতিপূর্বে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার অনূদিত নাটক এবং সফোক্লিস ও শেক্‌স্‌পীয়ার, বেকেট ও ব্রেখ্‌ট, চেখভ ও কাম্যুর হিন্দুস্থানী রূপান্তর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এত কিছু করা হচ্ছে: মারাঠীতে টেনেসী-উইলিয়ামসের 'গ্লাস মেনাজেরি' মঞ্চস্থ করা হয় এবং বাংলায় ইব্‌সেনের এক রূপান্তর প্রচুর মনোযোগ আকর্ষণ করে। গ্যেটে এবং শেলীর কাব্যনাট্যের অনুবাদ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও টলস্টয়ের সামাজিক নাটকের অনুবাদ, আর্নস্ট টোলারের 'ম্যাসেস

অ্যাণ্ড মেন' এবং পিরান্দেল্লোর 'সিক্স ক্যারেক্টার্স্ ইন সার্চ অব এ প্লেরাইট'-এর অনুবাদ কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রে পেশাদার থিয়েটার পুনরুজ্জীবনের এক নতুন তরঙ্গ প্রবল হয়ে উঠেছে। শখের থিয়েটার উঠে যাচ্ছে। দিন দিন লোকে উপলব্ধি করছে যে, নাটককে যদি বেঁচে থাকতে হয় তা হলে নিছক শখ বা অবসর-বিনোদনের বুদ্ধিগত সামগ্রী হিসেবে থাকলে হবে না। তাকে কিছু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর, কিছু পরিচালক ও প্রযোজকের এবং কিছু লেখকেরও সব সময়ের কাজ হতে হবে। এটা অন্যান্য শিল্প-বিজ্ঞান-বিষয়ক ব্যাপারেরই মতো। একজন শখের ডাক্তার অথবা একজন শখের ইঞ্জিনীয়ারের যেমন কোনো মূল্য নেই, থিয়েটারেও তেমন শখের মনোবৃত্তিটা অকেজো। নাটক এমন-এক শিল্পরূপ যার মধ্যে ব্যক্তিগত সৃজন-প্রতিভা এবং সামাজিক সাড়া মিলিত হয় বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন ক'রে। সুতরাং শখের স্তরে তুষ্ট থাকার মনোভাব যত তাড়াতাড়ি বর্জন করা যায়, তার সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপক উন্নতি এবং অগ্রগতির পক্ষে ততই মঙ্গল। পেশাদার দক্ষতার মানে সব সময় ব্যাবসাদারী নয় বা সস্তা বা ইতর রুচি তৃপ্ত করা নয়। নাটক ও থিয়েটার অত্যন্ত গুরুত্বমণ্ডিত সত্যকার শিল্প হতে পারে এবং সেইসঙ্গে একটা পেশা বা বৃত্তি হতে পারে, যেমন পৃথিবীর কয়েকটি দেশে হয়েছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যে থিয়েটারেরও উচিত নিখুঁত হওয়া এবং শখের শিল্পী বলতে সাফল্য-অসাফল্যের যে অনিশ্চিত খেলা বোঝায় তা ছেড়ে দেওয়া।